দ্বিতীয় পরিমার্জিত [redacted] ঃ
২রা অক্টোবর, ১৯৬০

ছয় টাকা

ঃ লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

স্বরলিপি
পাকা ধানের গান
মালশ্রী
নতুন কিছু নয়
সৃজন
পদ্মা-মেঘনা (যন্ত্রস্থ)

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ, ১৭২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী
স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত।

পর্বত কাহাকে বলে। টুকুর উত্তর জিভের ডগায়—চার দিকে জল মধ্যে স্থল তাহাকে পর্বত বলে স্যার। মাস্টার গর্জিয়া উঠেন—কে বলতে পার ?—পদ্মা উঠিয়া দাঁড়ায়।

—যাও টুকুর কান মলে দিয়ে এস।

টুকু ঘামিয়া উঠে—পদ্মা কান মলিবে। কিন্তু পদ্মা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। লাস্ট বেঞ্চি হইতে রাম পদ্মার হইয়া কানমলাটা দিতে চায় টুকুকে।—আমি দিই স্যার।

টুকু মনে মনে আগুন হইয়া থাকে। ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে দুইজনে রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়া যায়। কাদায় একাকার শরীর। রামের শার্ট ছিঁড়িয়া যায়। উঁচু ক্লাসের দুইটি ছাত্র আসিয়া দুইজনকে দুইটি কানমলা দিয়া বিচার শেষ করে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রশেখরের হৃদপিণ্ড এই রূপসী গ্রামের হাই-স্কুলটি। গ্রামের ছেলেদের প্রাণকেন্দ্র, মাঠের তিনদিক ঘিরিয়া লম্বা লম্বা টিনের ঘর। দক্ষিণে খোলা মাঠ। মাঠের পাশ দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে কাঞ্চনপুরের খাল। গ্রাম-গ্রামান্তর ডিঙ্গাইয়া খালটা মেঘনা-নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। কীর্তিনাশা ও মেঘনার যোগাযোগ এই খালের ভিতর দিয়া। গ্রামের ব্যবসায়ী লোকের প্রধান শিরা এই কাঞ্চনপুরের খাল।

খালের উপরে কাঠের পুল হইতে দেখা যায় খালের সংলগ্ন ছোট্ট একটি আশ্রম। দুইখানা টিনের ঘর। সামনে সুন্দর একটি দেশী-ফুলের বাগিচা। টিনের বেড়ায় ভারতমাতার ছবি। তার নীচে স্বামী বিবেকানন্দের ফটো ও মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্র। আশ্রমের সর্বত্র একটা নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা।

আশ্রমের প্রাত্যহিক কাজের চাকা ঘুরিয়া চলে। গীতাপাঠ, স্তবপাঠ, বাগান করা, ব্যায়ামকরা—সব মিলিয়া নূতন এক জীবন। সহজ পরিতৃপ্তির ভাব সকলের চোখেমুখে। জীবনের বিরুদ্ধে তিক্ততা নাই। শান্ত স্নিগ্ধ জীবনযাত্রা।

সংসারে অনাসক্ত এই আশ্রমের ছেলেদের গ্রামবাসীরা সম্ভ্রমের চোখে দেখে। হেডমাস্টার মহাশয়ের খুল্লতাত ভাই শশা[illegible]

হাতে-গড়া এই আশ্রমটি। তাঁহার হাঁটাচলার ঋজু ভঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষের চোখে শ্রদ্ধা-ভক্তি ছাপাইয়া উঠে। সকালবেলায় ছোট-বড় নানা আকারের শিশি হাতে, উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ শিশুদের ভিড় লাগিয়া যায় আশ্রমের দুয়ারে। শশাঙ্কশেখর শিশিতে ওষুধ ঢালিয়া দেন সন্ধ্যার পর আবার খোঁজ লইয়া আসেন, রোগীরা কেমন আছে। গ্রা বাসীদের বিপদে-আপদে এইভাবে উপস্থিত হন এ মানুষটি।

এরই মধ্যে নূতন এক যুগ আরম্ভ হয়। চরকার যুগ। পল্লীর কুটীরে কুটীরে সে আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া লাগে। এ আশ্রমেও আসিয়া পৌঁছায়—চরকা, তাঁত, মাকু, নলি, স্টীলের 'ব', তূলা ও তূলার বীজ। দেখিতে দেখিতে তূলাগাছের চারা বড় হয়, ফুল ধরে—বিদে পণ্যকে বিদায়ের ইঙ্গিত জানায়। হাটে যাওয়ার পথে গৃহস্থেরা কা পুলে দাঁড়াইয়া একটু দেখিয়া যায় আশ্রমের ছেলেদের সূতার ব দেওয়া, তূলা রোদে দেওয়া, তূলা পাঁজ করা, 'ব' গাঁথা।

নগেন্দ্রশেখরও বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া তূলার বীজ দিয়া আসেন। কুটীর-শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে প্রতি বাড়িতে তূলার গাছ লাগাইতে হইবে। তাঁহার স্কুলের পেছনেও তূলার চারা লাগান হয়। নূতন করিয়া 'রুটিন' করা হয় স্কুলের। ক্লাসে সূতা কাটা শেখান হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে তাঁতি করিমদ্দিকে আনানো হয় ছেলেদের তাঁতবোনা শিখাইতে।

সূতা কাটার ক্লাসে ছোট ছোট হাতে চরকা ঘুরায় দীপু, টুকু, রাম। তাঁতের মাস্টার আসিয়া ধমক দেন—এ কি সূতা কাটা হচ্ছে, না সলতে পাকান হচ্ছে ?

পদ্মার নলের সূতা দেখিয়া খুশি হয় করিমদ্দি—বোন ঠারানের সূতা দিয়া তেনারই পরনের খাসা একখান ডুইরা শাড়ি হইব।

ছোটদের উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু উঁচু ক্লাসের ছেলেদের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁত বোনার উৎসাহে ঢিলা পড়ে। তাঁতঘরে বসিয়া কি যেন ফিস ফিস করিয়া বলে।

করিমদ্দি নিরুৎসাহ হইয়া বলে—এইভাবে মাকু চালাইলে সারা বছরেও কাপড় শেষ হইব না।

—তুমিই বুনে ফেল কাপড়খানা।—চুপি চুপি আদেশ দেয় হেড-মাস্টার মহাশয়ের ছেলে সুকল্যাণ। তাঁতের ক্লাসে বসিয়া রোজই কি একখানা বই সে পড়ে। বারান্দায় মাস্টার মশায়ের জুতার শব্দ পাইলে বইখানা লুকাইয়া ফেলে। ভাব গতিক দেখিয়া কেমন ভয় ভয় করে করিমদ্দির। তবু নালিশ করে না। সে জানে, হেডমাস্টার বাবু বাগিলে আব রক্ষা থাকিবে না।

তবু গুপ্ত সংবাদ গোপন থাকে না। সুকল্যাণ নাকি কাঞ্চনপুরের কোনও এক সন্ত্রাসবাদী যুবকেব সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছে। রণেন চৌধুবীর সঙ্গে মিশিতে আবম্ভ করিয়াছে সুকল্যাণ! রাগে দুঃখে বেদনায় স্তম্ভিত হইযা যান নগেন্দ্রশেখর। তারাসুন্দবী সন্তানের অমঙ্গলাশঙ্কায় ভীতা হইয়া উঠেন। তাঁহার চোখে মুখে আর্ত-ছায়া নামিয়া আসে। স্বামী কাবাববণ না কবিলেও দেশের জন্যই জীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিযা গ্রামেব শিক্ষকতার কাজ লইয়াছেন। তিনি নিজেও তাঁহার কুমাবী বয়সে হলুদ রঙেব ছোপান শাড়ি পরিয়া স্বদেশী মিছিলে বাহিব হইয়াছিলেন। তাঁহাদেব সেই—ভেঙ্গে ফেল কাচের চুড়ি—বঙ্গনাবী।—গান শুনিযা কত মেয়ে-বৌ কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। রঙ-বেবঙেব কাচেব চুড়ি হাত হইতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ধনী সম্ভ্রান্ত মহিলারা হাতেব সোনাব চুড়ি খুলিয়া দান করিয়াছে সেই দেশের ডাকে। আব তাঁহারই সন্তান সুকল্যাণ, পিতার আদর্শ ভুলিয়া বিপথে চলিয়াছে—এও কি সম্ভব? একটা অকল্যাণ আশঙ্কা বুকে পাথর চাপিয়া ধরে।

নগেন্দ্রশেখব চিন্তাভারাক্রান্ত মনে তাঁহার ঠাকুর ঘরে ঢোকেন।

পদ্মার বাবা ও মা থাকেন বিদেশে। শশাঙ্কশেখবেরই সহোদর ভ্রাতা ইন্দুশেখর পদ্মার পিতা। পদ্মার পিসীমা কুসুমলতা তাদেরই এক আত্মীয়ের ছাড়াবাড়িতে মেয়েদের স্কুল করিয়াছেন। ছাড়াবাড়ির পূবের ঘরে চাটাই পাতিয়া রোজ দুপুরে স্কুল বসে। নমপাড়ার মেয়েরা খাল সাঁতরাইয়া ভিজা কাপড়ে পড়িতে আসে। এদের লেখাপড়া শেখার

এত আগ্রহ—কিন্তু বাধার অন্ত নাই। তবু নিরাশ হন না কুসুমলতা। বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করেন।—কি গো সৌদামিনী, তোমার নাতনীরে আর পাঠাও না যে স্কুলে।

সৌদামিনী টিকা দিতে বসিয়াছে। কাঠ-কয়লার গুড়ি গুলিতে গুলিতে অলস কণ্ঠে উত্তর দেয়—চিঠি-পত্র লিখতে শিখছে, আর ইস্কুলে গিয়া কি হইব। এখন ঘরে থাকলে কামে লাগে। একটা মাইয়াতে আর পাইরা উঠে না। কর্তাবাড়ীর বাড়কির ধান সিদ্ধ দিছে—বুড়ী বড় নাতনীকে ডাক দেয়—কইলো যমুনা, আয় দেখি। একটু হাতে হাতে সার দেখি। সন্ধ্যার আগেই চার কুড়ি টিকা দিয়ে আসতে হইব সেরেস্তা-ঘরে। পদ্মার পিসীমা ব্যথিত স্বরে বলেন—নিজেরা তো মুখ্যু হইয়া সারাজীবন কাটাইলা—এখন নাতি-নাতনীদের একটু লেখাপড়া শিখতে দাও। সৌদামিনী হাসে—বেশী বিদ্যা দিয়া মাইয়া মানুষ তো আর জজ ম্যাজিষ্টেট হইব না। সেই সোয়ামীর ঘরের ভাত ফুটান আর পুরুষের কিল লাথি খাওন আর পোলাপান বিয়ান—এইতো মাইয়া মানুষের কপাল।

—সোয়ামীর কিল লাথি না-খাওয়ার জন্যই তো লেখাপড়া শেখা।

—তাহা হইল বিধাতার বিধান। একমাত্র বিধাতাই পারে এ লিখন খণ্ডাইতে—সৌদামিনী জবাব দেয়। অগত্যা সে তাহার ছোট নাতনী হারানীকে ইস্কুলে পাঠায় মাষ্টারনী মায়ের সঙ্গে। এই নিঝুম ছাড়া-বাড়িতে ছাত্রীদের পড়া বুঝাইতে বুঝাইতে কুসুমলতার বহুদিন হারাইয়া যাওয়া মেয়ের কথা মনে পড়ে। তাঁহার ইন্দ্রানী। তাঁহার বুকটা শূন্য করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কত দীর্ঘ যুগ কাটিয়া গিয়াছে। তবু মনে হয়, তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আজও ঘুমাইয়া আছে তাঁহার ইন্দ্রানী। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। জমিদার বাড়িতে নহবতে শানাই বাজিতেছে। স্মৃতির বুনানি শানাইয়ের সুরে। তাঁহারও বাড়ীতে এমনি রোশনচৌকী বাজিত—আজ সে সবই নিশ্চিহ্ন পদ্মার স্রোত-ধারায়। কতকালের কথা। তবু মনে হয়। সেই শিশু-কন্যার কোমল স্পর্শ লাগিয়া আছে অঙ্গে অঙ্গে।

জমিদার বাড়ীর মণ্ডপের সামনে শিশুদের ভিড় লাগিয়াই আছে। মাস ভরিয়া তন্ময় হইয়া দেখে তাহারা কুমারদের প্রতিমা গড়ান—লক্ষ্মী-সরস্বতীর আঁচল চিত্রি-করা। পদ্মা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া যায়। নাট মন্দিরের থামগুলিও নূতন করিয়া লাল শালু দিয়া সাজান হইতেছে। সোনালী জরি জড়ান সেই থামগুলির গায়ে গোপবালাদের সঙ্গে চপল কৃষ্ণের লীলাখেলার বিচিত্র ছবিগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে পদ্মা। দশমীর পরদিন হইতে স্টেজ বাঁধা আরম্ভ হয় নাটমন্দিরে। জমিদারের ছেলেরা থিয়েটার করিবে কোজাগরী-পূর্ণিমা রাতে। পোস্ট-মাস্টারের ছেলে আসিয়া ধরে, তাহাকে একটা পার্ট দিতে হইবে। সবাই একবাক্যে অস্বীকার করে—অসম্ভব। গত বছরের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটাই মার্ডার করল ওই হতচ্ছাড়া কার্তিক। নাছোড়বান্দা অনুনয়ে উত্যক্ত হইয়া মড়ার পার্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে গতবছরে। তাহাতেই সে খুশি। প্রত্যহ নিয়মিত আসিত মড়ার পার্টের রিহার্সেল দিতে। কিন্তু এত করিয়া রিহার্সেল দিয়াও ছেলেটা শেষ পর্যন্ত মড়ার ভূমিকায় অসাড় হইয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হাত তুলিয়া সশব্দে মশা মারিতে আরম্ভ করে। এত বড় একটা কাণ্ড করিয়া কোন মুখে আবার পার্ট লইতে আসে সে।

কার্তিক উত্তর দেয়—কি করবো। যা মশা। কতক্ষণ আর মশার কামড় সহ্য করা যায়। তা এবার একটা জ্যান্ত মানুষের পার্ট দিন। তা হলে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়িতে মশাও আর কামড়াতে পারবে না। কার্তিক কাকুতি জানায়। অবশেষে সকলের পরামর্শ লইয়া তাহাকে ছত্রধারীর পার্ট দেওয়া হয়। কিন্তু কার্তিকের চাইতেও বিপদে ফেলিয়াছিল বিলাসপুরের যোগেশবাবু 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করিতে গিয়া। রাণী মুরার পার্ট। পেন্টিং সাজসজ্জা লইয়া সাজঘরে সবাই ব্যস্ত। অভিনয়ের সময় প্রায় হয়-হয়। কিন্তু যোগেশবাবু একখানা থান কাপড় পরিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট পোড়াইয়া চলিয়াছে। সবাই অবাক।—একি আপনার গোঁফ কামালেন না। যোগেশবাবু নির্বিকার সুরে উত্তর দেয়—একরাতের থিয়েটারের—

জন্যে আমার এত বাহারের গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেলি—আমার কি মাথা খারাপ।

অনুনয়, বিনয়-তর্ক-বিতর্ক সব বৃথা। অগত্যা প্রকাণ্ড এক ঘোমটা টানিয়া রাণী মুরার ভূমিকায় ষ্টেজে নামে যোগেশবাবু। সেই হইতে জমিদারের সহিত মনোমালিন্য হইয়া আছে। আর কোনও বছর তাহাকে রূপসী গ্রামের থিয়েটারে ডাকা হইবে না। যোগেশবাবুও দমিবার পাত্র নয়। তাহারা বিলাসপুবে আলাদা করিয়া 'কারাগাব' থিয়েটার করিতেছে এ বছর।

বিলাসপুরের রামপতির মত অত সুন্দব ফিমেল পার্ট কেহ কবিতে পারে না। না পারুক। পাল্টা জবাব দেয় জমিদারেব ছেলে। কলিকাতা হইতে ওরিয়েণ্টাল ডান্সার আনাইবে। নাচ দেখিয়াই মুগ্ধ হইবে সবাই।

পূজার মাস শেষ হইয়া যায়। রবিশস্য বোনা ক্ষেতেব বুকে কুয়াসাব ওড়না জড়ায়। আবার শীতের রৌদ্রে সে কুহেলী কাটিয়া যায়। খাল-পাড়ের মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে। কুয়াসায় ঢাকা দীঘির ওপব হইতে তাহাদের ব্রতকথা ভাসিয়া আসে ঃ—

"উঠ উঠ সূর্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি হিয়লের লেইগা।"

দুপুর বেলায় গাছের তলায় তলায় শীতের ঝরা পাতা ঝাঁট দেয় খালপারের মেয়েরা। উপরে গাছের শাখায় আবাব নূতন পাতা গজায় —আসে বসন্ত।

ফাল্গুন মাস কাটিতে না কাটিতেই মহামারীর হাহাকার ছড়ায় চৈতালী ঘূর্ণি হাওয়া। খালবিলের জল শুকাইয়া যায়। সবুজ শেওলার বঙ ধরে জল-নামিয়া যাওয়া পুষ্করিণী গুলিতে। পানীয় জল দূষিত হইয়া উঠে। গ্রামের বুড়া ডাক্তার বাড়ি-বাড়ি সতর্ক করিয়া দিয়া যায়—সাবধানে থেকো সব। চরে কিন্তু দারুন কলেরা আরম্ভ হয়েছে।

নিঝুম রাতে একটা নিম-পেঁচা খালপারের একটা নিষ্পত্র হিজল গাছের ডালে বসিয়া রোজই ডাকে—নিম-নিম-নিম। অকল্যাণের দূত এই অলক্ষ্মী পেচকের গুরুগম্ভীর ডাকে ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ সকলে ভীত

হইয়া উঠে! মায়েরা কোলের সন্তানকে শক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে। বুড়ীরা ঘর হইতে চিৎকার করিয়া বলে—লোহা পোড়া দিলাম—দূর-দূর-দূর। যমুনার তিন বছরের ছোট বোনটাও ঠাকুরমার কথার সুরে সুর মিলাইয়া বলে—দুঃ দুঃ দুঃ। জলন্ত লৌহ-শলাকার ভয়ে মড়ক অপদেবতার বার্তাবহ অলক্ষ্মীটা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল কিনা কে জানে।

অন্ধকার ঘরে শুইয়া শুইয়া ছোট ছেলেমেয়েদের ছোট্ট ছোট্ট বুক-গুলিও একটা অজানা ভয়ে কুঁকড়াইয়া থাকে। ভয়ে বড়দের গা ঘেষিয়া শোয়। বহুদূরে শ্মশান-মুখী একটা হরিধ্বনি শোনা যায়।—বল হরি হরি বোল। বল হরি হরি বোল।

—কে জানি আবার মরলো গো পিসী।—প্রতাপ ঘর হইতে চেঁচাইয়া বলে। আর এক ঘর হইতে হারাধন উত্তর দেয়। পূবের চর নাকি এই বছর 'ছাফ' হইয়া গেল। কথা বলিয়া রাতের এ অশুভ নিস্তব্ধতাকে সহজ করিয়া লইতে চায় গৃহস্থরা। প্রতাপ উঠিয়া দুয়ারের ঝাঁপ খুলিয়া বারান্দায় টিকা ধরাইতে বসে।—টিকা ধরাইলি নাকি প্রতাপ। দে দেখি এক ছিলিম।—যমুনার বাবা হারাধনও উঠিয়া আসে।

—কোন দিক দিয়া উইড়া গেল রে অলক্ষ্মীটা।—সৌদামিনীও ঘরের ঝাঁপ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে এক ছিলিম তামাক খাইতে। হারাধন নিস্তেজ কণ্ঠে উত্তর দেয়।—দক্ষিণে।

দিনে রাতে বিশ্রাম নাই আশ্রমের ছেলেদের। রাত ভরিয়া কলেরা রোগীর নার্স করে তাহারা। সঙ্গে স্কুলের ছেলেরাও যায় কেহ কেহ। সুকল্যাণও যাইতে চায়। নগেন্দ্রশেখর বাধা দেন না। তারাসুন্দরী মনে মনে ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া ছেলের মাথায় ইউক্যালিপটাস অয়েল ছিটাইয়া দেয়।

স্কুলের লাইব্রেরী ঘরের পেছনে একটা টিউবওয়েল বসানো হয়। খালপারের ছেলেমেয়েদের চোখে বিস্ময় নামিয়া আসে। কি ভৌতিক ব্যাপার! লোহার ডাণ্ডাটা ওঠা-নামা করিলেই জল উঠিয়া আসে।

টলটলে স্ফটিকের মত জল। পিপাসা থাক না-থাক ছেলেমেয়েগুলি বারে বারে আসিয়া জল খায়। সোনামিঞা ধমক লাগায়—টিব কলটা তোরা শেষই করবি। যা বাড়ি যা।

সোনা আর সূর্য স্কুলের বাগানের আগাছায় নিড়ান দিতে বসিয়াছে। স্কুলের মালি সূর্য। পাঁচ-ছয়টি গ্রামের ভিতরে এই একটি মাত্র স্কুল। ক্রোশ দুই দূরের পথ হইতেও ছাত্ররা এই স্কুলে পড়িতে আসে। সূর্য গর্ব অনুভব করে। সোনা জঙ্গল সাফ করিতে করিতে উঠিয়া গিয়া একটু জল খাইয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া দোস্তকে বলে—কি কলের জল! পরানটা ঠাণ্ডা হইল। পুষ্করিণীর জল একটু বেলা হইতে না হইতে গরম হইয়া যায়। তৃষ্ণা মেটে না।

ছোট ছেলেপুলেগুলি যাইতে না যাইতেই বৌ-ঝিরা কলসী লইয়া জল লইতে আসে। সূর্য এক মনে বাগান পরিষ্কার করে। কি একটা ফুলের ঘ্রাণে মো-মো করে বাগানটা।

সোনা নিঃশ্বাস ভবিয়া সুঘ্রাণ টানিয়া বলে—যাই কও না ক্যান মালির পো, তোমার বড় বাহাইরা কাম! আর আমাগো দেখছো তো—বীজ বুনছি সেই কবে। একটু পানির নাম নাই আকাশে। আল্লার কি মর্জি।

সূর্যের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়। একটু চঞ্চল হইয়া উঠে—আবার কে জানি জল লইতে আইছে। টিবকলটা থুইব শেষ কইরা দেখতাছি। সূর্য ঘরের পিছনে উঠিয়া যায়।—কে যমুনা নাকি লো।

যমুনা ঘাবড়াইয়া যায়—জলা তে বাইর হয় না।—

—দেখি সর দেখি। সূর্য আগাইয়া যায়। জোরে জোরে পাম্প করে। নল দিয়া গব গব করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করে।—নে রাখ তোর কলসী।

কলসী উপছাইয়া মাটিতে জল পড়ে। যমুনা তবু যায় না। বসিয়া বসিয়া পা ধোয়, হাত ধোয়, চোখে মুখে জল দেয়। সূর্য এদিক-ওদিক একটু দেখিয়া লইয়া স্বর নীচু করিয়া বলে—যমুনা, তুই যদি আমাগো স্বজাতি না হতি—

—কি হইত তবে।—যমুনা জলের কলসী কাঁখে তুলিয়া লয়।

—তোরে আমি বিয়া করতাম।

যমুনা লজ্জায় লাল হইয়া উঠে।—দাঁড়াও আমি তোমার ভাইয়ের কাছে কইয়া দিমু।

কিন্তু কথাটা গোপনই রাখে যমুনা।

পদ্মা আর যমুনা ঘরের পিছনে ছঞ্চাতলায় বসিয়া মাটির হাঁড়ি কড়াই লইয়া পুতুলের নিমন্ত্রণ রাঁধিতেছে।

বাড়ীর উঠানে যমুনার ঠাকুরমার গলা শোনা যায়—ও যমুনা, শীগ্‌গীর বাড়ী চল। তোরে দেখতে আইছে।

যমুনাকে পুতুলের গৃহস্থালি হইতে উঠাইয়া লইয়া যায়। পদ্মার পূবের ঘরের কাকিমার নিকট হইতে একটা সুগন্ধি তেল চাহিয়া যমুনার চুলে মুখে মাখাইয়া দেয় সৌদামিনী। ভিতর হইতে একটু চাপা নিঃশ্বাস বুক ঠেলিয়া উঠে।

—মা-মরা মেয়েটার কপালে যেন সুখ হয়।

মাস না কাটিতেই যমুনা শ্বশুরবাড়ী রওনা হয়। লাল-পাড় কোরা শাড়ী পরনে, গাটছড়া-বাঁধা আঁচলে, দুই হাতে দুই জোড়া লালি শাঁখা হলুদ সূতোয় বাঁধা, সিন্দুর লেপা মাথায় মস্ত ঘোমটা।

সূর্য কাঠের পুলে দাঁড়াইয়া দেখে বধূবেশী যমুনার স্বামী গৃহে যাত্রা। পুলের তলায় নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় খালপাড়ে। ধরনীবুড়ী নাতনীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলে। মা-মরা মেয়েটাকে সে-ই বুকে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছিল এতদিন। আজ চিরদিনের জন্য পর হইয়া গেল যমুনা। ছোট্ট পদ্মাও খালের ধারে দাঁড়াইয়া বিরস বদনে দেখে তাহার খেলার সাথীর কোন অচিন দেশে যাত্রা। নৌকার পাটাতনে দাঁড়াইয়া মফিমিঞা ডাক দেয়—মালির পো এইটুক বেলা থাকতে নাও না ছাড়লে আন্ধার লাইগা যাইব কিন্তু বুড়ীর হাটের বাঁক না ঘুরতেই।

হারাধন মাকে তাড়া দেয়—পাও ধুইয়া নৌকায় উঠুক যমুনা। এইবার নাও ছাড়ন লাগবো।

যমুনা খালের ঘোলাজলে তাহার আলতাপরা পা ধুইয়া নৌকায় উঠে। তাহার জামাই নৌকার গলুইয়ে বসিয়া আছে। চল্লিশের উপর বয়স, একমাথা বাবরি চুল। তেল কুচকুচে চুলের মাঝখান দিয়া মেয়েদের মত সিঁথি কাটা।

সূর্য কাঠের পুলের উপর হইতে দেখে বধূবেশী যমুনার চোখের জলে ভেজা মুখখানা—সিন্দুরে লেপা মাথা। হাতে হলুদ সূতার গ্রন্থী বাঁধা যমুনার সোয়ামীকেও দেখে। মদনের লাল চক্ষুর লোলুপতা, ক্রন্দনরতা ধরণীবুড়ি, যমুনার চোখের জল সব মিলিয়া যেন বুকের মধ্যে একটা কান্না মোচড় দেয় পুরুষ মানুষ সূর্যেরও। মফি লগির খোঁচা মারে।* ঠাকুরমা বুড়ী চোখের জল মুছিয়া লয়, দুর্গা দুর্গা। মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করে। মেয়েটা যেন সুখী হয়।

সূর্যের লাল আভা প্রতিবিম্বিত হয় যমুনার সিন্দুরে লেপা কপালে, লালপাড় শাড়ির ঘোমটা টানা সুন্দর মুখখানাতে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে যমুনার।

নৌকা খালের উপর দিয়া দূরে ধানক্ষেতের আড়ালে সরিয়া যায়। বিদায়-বিষণ্ণ বনানী। শূন্যতাভরা দিগন্তে বিলীন ধানক্ষেত। সূর্য আরও কিছুক্ষণ পুলের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে—বহুদূরে লগির মাথাটুকুও চোখের আড়াল হইয়া যায়।

সূর্য বিষণ্ণ মন্থর পায়ে পুল হইতে নামিয়া আসে। খালের ধারে নামাজ করে। নামাজ পড়া আরম্ভ হইয়াছে। সোনার খোঁজে যায় খালের ওপারে। সোনামিঞা বাড়ী আছে। সোনাকে লইয়া যাত্রা-গান শুনিতে যাইবে ঠিক করে। বাজারে পাঁচ-আনিরা পালাগান দিতেছে। মফির বড় মেয়ে উত্তর দেয়—চাচা তো হাট থেইকা ফেরে নাই।

বটতলায় সোনার সঙ্গে দেখা হয়। একটা ইলিশ মাছ আর কি সওদা লইয়া হাট হইতে ফিরিতেছে।—আউজকা মাছ যা সস্তা! চার পয়সা কইরা যাইতেছে ইলশা মাছ। যাও কিন্যা লইয়া আস একটা।

—নাঃ আউজকা আর হাটে যামু না। চল আইজ পালাগান শুইন্যা আসি।—দুইজনে একসঙ্গে ফেরে। খালের উপর হাট ফিরতা বড় বড়

পাটের নৌকাগুলি রাতের জন্য পাড়া গাড়িয়া আছে। মস্ত চওড়া খালের মুখে ঘূর্ণি খাওয়া ঘোলাজল। খালে বাঁধা নৌকার পাটাতনে পাটতনে চুলা ধরিয়া উঠিয়াছে। নীচে জলের বুকে উনানের আগুনের ছায়াগুলি কাঁপিতেছে। রাত্রির রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত মাঝিরা। মাটির সানকিতে খলবল করিয়া তৈলাক্ত ইলিশ মাছ ধুইয়া উঠায়, আরেক মাঝি মসলা বাটে। কাঠের পুলে পা দেয় সোনা আর সূর্য। বন্দর ভরিয়া মস্ত মস্ত টিনের গুদামঘরগুলি বহু দূর হইতে দেখা যায়। মাঝ নদীতে এক মাঝি ভাটিয়ালি গান করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। মনটা আবার পুড়িয়া উঠে সূর্যের—যমুনা শ্বশুর বাড়ী চইলা গেল আজ। —বিষণ্ণ কণ্ঠে দোস্তকে জানায়।

সোনা ঠাট্টা করে—তোমার বরাত মন্দ দোস্ত, পাখী উইরা গেল। —সোনা সূর্যকে সান্ত্বনা দেয়—টাকা রোজগার কর। আমি ওর থেইকা সোন্দর মাইয়ার খোঁজ আইন্যা দিমু। কেরায় যামু যখন, তোমাগো জাইত্যা মাইয়ার খোঁজ লইয়া আসুম। তোমাগো মধ্যে যত নটি খটি। না হইলে তিনকুড়ি টাকার জোরে মাইয়াটারে কিন্যা লইল ব্যাটা।

সূর্য বিবস কণ্ঠে উত্তর দেয়—না মিঞা, আর বিয়া করুম না। ঠিক করছি শহরে চইল্যা যামু।

—তুমি দেখি বিবাগী হইয়া উঠলা। যমুনারে না পাইয়া নাকি? সোনা ঠাট্টা করে।

সূর্য বিদায় নেয়—শীগ্গীর কইরা আইস কিন্তু—নাইলে জায়গা পামু না।

কাঠের গুদামের পিছনে পালাগান আরম্ভ হইয়াছে। কুমিল্লার দল। ডে-লাইটের আলোতে ঝলমল করে চারদিকের গাছ-গাছালিগুলি পর্যন্ত।

শতরঞ্জির উপর দশ-বার বছরের বিষ্ণুপ্রিয়ার নাকের বেসর খসিয়া পড়ে। শূন্য কলসী ভাঙ্গিয়া যায়, রাতে কোকিল ডাকে, অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীতা বধূ শাশুড়ীর স্মরণ লয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণসুরে দর্শকদের চোখে চোখেও বেদনা ঘন হইয়া উঠে। ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে

মহামায়া আসিয়া নিদ্রা ঢালিয়া দিয়া যায়। প্রিয়ার অঞ্চলের গ্রন্থী খুলিতে থাকে নিমাই।

—যাই যাই মনে করি—যাইতে না পারি। মায়ার বাঁন্ধন ছাড়ায়ে গো যাই।—চতুর্দশ বর্ষীয় নিমাইয়ের সে বিদায়ী সুরে দর্শকদেরও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে। বুক ভারি হইয়া উঠে।

মাথার উপর হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত আর বেশি বাকি নাই। সূর্য আর সোনা বাড়ি ফিরিতেছে। নিমাই সন্ন্যাসের করুণসুরে পরিপূর্ণ শ্রোতাদের কণ্ঠকাকলি আগে-পিছে, এদিকে-ওদিকে। সূর্যের কানে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে আলুথালু বসনা শচীমাতার করুণ বিলাপধ্বনি—নিমাই-নিমাই। প্রতিধ্বনি বলে—নাই-নাই। একটা বেদনা মাখানো আলাপ হিমে-ভেজা বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে যেন থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

বিদায় দুঃখে ভরা এ দুনিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া গেল নিমাই। যমুনাও ছাড়িয়া গেল তাহাকে।

কুসুমলতার দিনেরাতে মুহূর্ত সময় নাই। শিল্প প্রদর্শনী আসিয়া পড়িয়াছে। বড়দিনের সময় প্রতিবছরই স্কুলের ঘরগুলিতে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাঁহারই উদ্যোগে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রকমারি হাতের কাজ সংগ্রহ করেন—শীতলপাটি, বাঁশের সাজি, ডালা, কুলা, নক্সা-কাটা কাঁথা, চটের আসন, পাড়ের সুতার পাখা, বালিশ-ঢাকনা।

কুসুমলতার স্কুলের মেয়েরা শাড়ির উপর, খদ্দরের ব্যাজ লাগাইয়াছে, রঙিন একটুকরা খদ্দরের কাপড়। ঐ রঙিন টুকরাটুকুই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে কিশোরী মনকে। স্ত্রীলোকের রাস্তা দিয়া পুরুষেরা যাইতে পারিবে না। বহুদূর গ্রাম হইতেও দলে দলে গ্রামের বৌ-ঝিরা আসে। অবাক হইয়া দেখে কৃষ্ণনগরের কুমারদের হাতে-গড়া পুতুলগুলিকে। তাহাদেরই সকাল সন্ধ্যার কাজের পাঁচালী কি সুনিপুণ ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঐ মাটির পুতুলগুলিতে! ঠাসাঠাসি

ভিড় দুয়ারে। লক্ষ্মী হিমসিম খাইয়া যায় দর্শকদের সামাল দিতে। বছর সাতেকের একটি ছেলে তাহার ঠাকুরমার পিছন পিছন মহিলাদের দুয়ার দিয়া ঢুকিয়া পড়ে।

লক্ষ্মী বাধা দেয়—এ পথ দিয়া পুরুষরা যাইতে পারিবে না।

সাত বছরের পুরুষটি ঘাবড়াইয়া যায়, তাহার ঠাকুরমার আঁচল ছাড়িলে সে যে এই ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যাইবে!

পদ্মা একটা স্টল হইতে লক্ষ্য করে। উঠিয়া আসিয়া বলে—ওকে ছেড়ে দে লক্ষ্মী, এত ছোট ছেলে একা যেতে পারে নাকি।

লক্ষ্মী গজ গজ করে—ছোট হলে কি, পুরুষ তো।

বিকেল বেলা স্কুলের মাঠে মেয়েদের ছোরা-খেলা লাঠি-খেলা দেখান হইবে। সদর মহকুমার হাই-স্কুলের মেয়েরা ছোরা-খেলার প্রতিযোগিতায় আসিয়াছে। বাঁশ দিয়া সীমানা করা খোলা মাঠে খেলা আরম্ভ হয়। শির-তামোচা-বাহেরা। চকচকে ছোরাগুলি উঠে নামে বিদ্যুৎ গতিতে।

নিঃশ্বাস পড়ে না দর্শকদের। পদ্মা মুগ্ধ চোখে দেখে, তাহার সমবয়সী কি কিছু বড় মেয়েরাও কথায়-বার্তায় হাঁটা-চলায় সাজ-সজ্জায় কি সুন্দর সপ্রতিভ। ফরসা লম্বা মেয়েটির লাল রিবন-বাঁধা বিনুনিটাও লাঠি ঘুরানোর ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে। পড়ন্ত রোদের আভা আসিয়া পড়িয়াছে মেয়েটির চোখেমুখে। গায়ের রঙ যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে তপ্ত সূর্যের কিরণে।

ছেলে ও মেয়েতে লাঠি খেলা হইতেছে। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ে না দর্শকদের। খেলার পর সেই লাল রিবন বাঁধা মেয়েটির সঙ্গে পদ্মার আলাপ হয়। চোখেমুখে কী উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা। কেমন সহজভাবে কথা বলে বিপাশা, যেন কতকালের পরিচিত পদ্মা। পদ্মার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলে—চল আমাদের স্কুলে পড়বে। দেখো তোমাকে কিরকম লাঠি খেলা শিখিয়ে দেবো।

সন্ধ্যার আগে অধিবেশন আরম্ভ হয়। বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় কুসুমলতা। বৃদ্ধার স্খলিত কণ্ঠের তেজস্বিনী কথার ঝঙ্কার

মৌন শ্রোতাদের মনের তরঙ্গে কাঁপিয়া উঠে। পদ্মা তাকাইয়া দেখে, বিপাশাও মন দিয়া শুনিতেছে তাহার পিসীমার বক্তৃতা।

অন্ধকার হইয়া আসে। দূরের কোন বাড়ীতে শাঁখ বাজিতেছে। একটু চঞ্চল হইয়া ওঠে গৃহস্থবধূরা। ভলান্টিয়ার মেয়েরা অনুরোধ জানায়—আপনারা গোলমাল করবেন না। একটু চুপ করুন। দুই-একটি কোলের শিশু কাঁদিয়া উঠে। তাড়াতাড়ি বুকের দুধ দেয় মায়েরা।

ভলান্টিয়াররা আসিয়া ডে-লাইটগুলি পালা করিয়া দিয়া যায়।

ডে-লাইটের সে উজ্জ্বল আলো আসিয়া পড়ে বক্তার লোলচর্মের প্রতিটি ভাঁজে। বেদনাক্লিষ্ট তপস্যার দ্যুতি নিস্প্রভ চোখের মণি দুইটিতে। বৃদ্ধা দুঃখের সুরে বলিয়া যান—বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত আসিয়া পড়ায় নারী-প্রগতি ভিন্ন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা ভারতীয় ও বঙ্গনারী। ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য কোথায়?

বিপাশারা রাত্রের স্টীমারেই চলিয়া যায়। কিন্তু পদ্মা সেই অপরিচিত মেয়েটির প্রথম কথা কয়টি ভুলিতে পারে না।—পদ্মা, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ! আশ্চর্য মেয়ে। জানা নাই, চেনা নাই, তবু তাহাকে খুঁজিয়া হয়রাণ! এক মুহূর্তে ভাল লাগিয়া যায় তাহার এই লম্বা বিনুনি-বাঁধা সপ্রতিভ মেয়েটিকে। সব সময়ই চোখে ঝরিতেছে কি মিষ্টি হাসি। একই ক্লাসে নাকি পড়ে বিপাশা। পাশ করিয়া বিজ্ঞান পড়িবে সে।—পদ্মা একা বসিয়া বসিয়া ভাবে বিপাশার জীবনের কতকিছু পরিকল্পনার কথা।

প্রদর্শনী শেষ হইয়া গিয়াছে। আবার ঠিকমত চেয়ার টেবিল-গুছাইয়া রাখিতেছে সূর্য। পদ্মা স্কুলের বারান্দায় বসিয়া সংস্কৃত শব্দরূপ মুখস্থ করে। স্কুলের বোর্ডিংয়ের ছেলেরাও রোদ্র-বিছানো মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া শেখে। কুয়াশাঘেরা শীতের রৌদ্র।

নূতন একটি ছেলে আসিয়াছে বোর্ডিংয়ে। দূর হইতে পদ্মা দেখে—অশোকগাছের তলায় বসিয়া সেই নূতন ছেলেটিও বইয়ের ভিতরে কোন

বিস্ময়ময় রহস্যের মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে। রোজই দেখে পদ্মা—শোভনকে রৌদ্রে-ভেজা স্কুলের মাঠে। হাতে—ডিকেন্সের বই। চিবুকে এক তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্রের আভাস। একটু গর্বের আমেজ। কথা হয় না কোনদিনই। তবু মুগ্ধ হয় পদ্মা।—একমাস না যাইতেই সুকল্যাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘন হইয়া উঠে শোভনের। সুকল্যাণদের পোড়োবাড়ীর গোপন জায়গায় বসিয়া কবিতা লিখিয়া চলে শোভন। হাতে-লেখা গোপন পত্রিকা বাহির করে। প্রচ্ছদপট আঁকে শোভনই। পদ্মাও হারিকেনের সামনে বসিয়া গভীর রাতে লুকাইয়া লুকাইয়া পড়ে—সেই 'সবুজ' পত্রিকা। একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে কোন এক অনাগত বিপ্লবের শিহরণ।

বৈকালের ছায়া নামিতে না নামিতে ছেলেরা সবাই জড়ো হয় স্কুলের মাঠে। পদ্মাও আসিয়া বসে অশোক গাছের তলায়—কোলের উপর বিছান 'বেনু' পত্রিকা। অদূরে খেলার মাঠ হইতে থাকিয়া থাকিয়া কানে আসে ছেলেদের সমন্বয়ে উৎফুল্ল চিৎকার—'গোল'। কাঁঠালী চাঁপার তলায় বসে ছোট্ট একটি বৈঠক।

—গ্রামেতে ছেলেদের জন্য একটা রিডিংরুম ও লাইব্রেরীর একান্ত প্রয়োজন। সুকল্যাণ কথাটা তোলে।

শোভন সমর্থন করিয়া বলে খালের ধারে নূতন রাস্তা তৈরী হবে শুনছি—ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হতে। ও রাস্তাটা তোলার ভার আমরাই নেব। 'দি আইডিয়া।'

উৎসাহে কাঁঠালচাঁপার তলাটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। সন্ধ্যার ছায়া নামে। খেলার মাঠে খেলা সাঙ্গ হয়। ফুটবল হাতে বাড়ি ফিরিয়া যায় ছেলেরা—চোখেমুখে নূতন উৎসাহ।

দিন কয়েক পরেই কাঠের পুলে বিগ্‌ল বাজিয়া উঠে। মাটি টানা ঝুড়ি, আর কোদাল লইয়া গ্রামের ছেলেরা খালপাড়ে আসিয়া জড়ো হয়। বিগলের শব্দ নিষ্কম্প বনভূমির ওপর দিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগন্তে মিশিয়া যায়। নিড়ানি হাতে ক্ষেতে যাইতে যাইতে চাষীরা বাবুদের ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হয়। একদল মাটি কোপাইয়া

ঝুড়িতে তুলিয়া দেয়, মাটির ঝুড়ি মাথায় গামছা বাঁধা মাথাগুলি বহু দূর হইতেও চোখে পড়ে।

পদ্মাও আসিয়া যোগ দেয় এ মাটি কাটার দলে। শোভনের মাথায় মাটির ঝুড়িটা তুলিয়া দিতে না দিতেই রবি খালি ঝুড়ি লইয়া সামনে দাঁড়ায়—পদ্মাদি, ঝুড়িটা মাথায় তুলে দাও তো।

খালের ওপারে দিগন্তে বিলীন শস্যভূমি, দূরে কুয়াশায় ঢাকা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সীমারেখা, এপারে জীবনরসে মুখর গ্রাম্য ছেলেদের কলধ্বনি—পদ্মার মনে দিন ভরিয়া রেশ থাকে এ শিশির ভেজা সকালগুলির। নিঃশ্বাস ভরিয়া গ্রহণ করে চারিদিকের প্রকৃতির এক অজানা সৌরভ। হাঁটার ছন্দে পায়ে পায়ে এক নূতন আনন্দ ছড়াইয়া পড়ে। বাড়ী ফিরিয়া শোনে তাহার মা, বাবা বাড়ী আসিতেছেন। কয়েক দিন দেশের বাড়ীতে থাকিয়া মামার বাড়ীতে যাইবেন। দুপুরের ষ্টীমারেই আসিয়া পৌছান তাঁহারা। পরের দিন পদ্মা তাহার ছোট ভাইবোন প্রসাদ আর চিত্রিতাকে খালের ধারে লইয়া যায়।

পদ্মার দাদা প্রকাশ ঠাট্টা করে—এ ভাবে কি আর টাকার সমস্যা মেটে। তাহলে তো সবাই কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে মাটি কাটতে শুরু করতো।

কিন্তু পদ্মার বাবা মেয়ের এই যেখানে সেখানে স্বাধীন চলাফেরা দেখিয়া চিন্তিত হয়। গম্ভীর হয়ে বলে—যা তোরা বাড়ী যা। এখানে কি কাজ তোদের।

পদ্মার মা মৃদু অনুযোগের সুরে বলে, এখন বড় হয়েছে ও, ওর এখন ছেলেদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান ভাল দেখায় না। তা ছাড়া ঘরের কাজ কর্ম করা উচিত। এসব তাঁত-ফাঁত বোনা শেখা কি কাজে লাগবে ওর ভবিষ্যতে।

পদ্মার পিসীমা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলেন—ঘরের কাজ মধ্যবিত্ত-ঘরের মেয়েদের আর শেখান লাগে না। দেখে দেখেই শেখা হয়ে যায়।

—তা' কেন এইত চিত্রিতা এই বয়সেই মাছের ফ্রাই আর পুডিং

করতে শিখেছে। প্রতি রোববারে রান্না শেখাই ওকে। আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখায় সুহাসিনীর ঈষৎ গর্বিত মুখখানা।

মাত্র তিন দিন বাড়ীতে থাকিয়া রওয়ানা হইয়া যান তাঁহারা। মাত্র কয়দিনেই পদ্মার মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধিয়া রাখিয়া যান তাহার মা-বাবা। পদ্মা আর মাটি কাটিতে যায় না। তারাসুন্দরী নিষেধ করে—থাক না গেলি আর। তোর মা-বাপ যখন পছন্দ করে না।

সিঁড়িতে বসিয়া পরীক্ষার পড়া শেখে পদ্মা—দূরে বিগ্‌ল বাজিয়া উঠে। যেন ঘর ছাড়ার ডাক আসিতেছে দূরের বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া। পদ্মার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। বসিয়া বসিয়া ভাবে, এতক্ষণে হয়তো খালপাড়টা ভরিয়া গিয়াছে। কোদাল আর ঝুড়ি হাতে ছেলেরা চলিয়াছে। রাস্তা বাঁধান প্রায় শেষ হইয়া আসে—পুল ছোঁয় ছোঁয়। উৎসাহে খালপাড়টা যেন ফাটিয়া পড়ে। খালপাড়ের উলঙ্গ ছেলেরা তামাসা দেখিতে সার দিয়া দাঁড়ায়। পদ্মা দূব হইতে শোনে তাহাদের উল্লাসিত চিৎকার—পোল, পোল। একটা বিষণ্ণ ছায়া নামে পদ্মার চোখের পাতায়। স্কুলের মাঠ, দিঘির ঘাটলা, পোস্টাফিসের বারান্দা সব হইতেই দূবে সরিয়া আসে সে। পদ্মা নিঃশব্দে নীরবে অন্দর মহলে বদ্ধ সীমানায় ঢুকিয়া পড়িল সকলের অজান্তে অলক্ষ্যে।

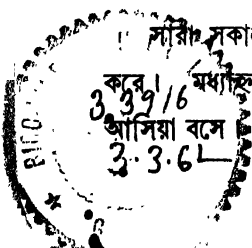
আপন আনন্দেই সে যেমন সর্বত্র অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছিল তেমনই আপন ব্যথার সুরেই নিজেকে নিজের ভিতরেই লুকাইয়া ফেলিল—কেহ জানিল না—খোঁজও রাখিল না বন্দিনী পদ্মার এ আহত ব্যথার।

সন্ধ্যার ছায়া নামে অশোক গাছে—দূর হইতে দেখে পদ্মা। তাহার মনেও ছায়া নামিয়া আসে। ছেলেরা হল্লা করিতে করিতে মাঠ হইতে ফিরিতেছে। পদ্মা দালানের সিঁড়িতে বসিয়া শোনে ছেলেদের কলধ্বনি। শোভনও চলিয়াছে তাহাদের সঙ্গে। হাস্নাহানার মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসে। কি এক নূতন বিস্ময় দেখা দিয়াছে পদ্মার মনে। কুহেলীময় বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে সে। সন্ধ্যায় কাতর ছায়া নামে উঠানের বুকে। দূর হইতে দেখে পদ্মা, দিঘির ধার দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে

শোভন। আবছা আঁধারে অস্পষ্ট হইয়া যায় যেন জীবনে প্রথম দেখা কৈশোর উত্তীর্ণ অপরূপ সুন্দর দেহভঙ্গি। পদ্মা প্রাণভরে অনুভব করে এক মধুর ব্যথা।

সামনেই কাঠগোলাপ গাছে লক্ষ্মী পেঁচাগুলি এক সঙ্গে ডাকিয়া উঠে। খালের ওপারে মালীর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নারকেলের মালা বাজাইয়া ঝিঁ ঝিঁ পোকা ধরিবার ছড়া বলিতেছে—'ঝিঁ ঝিঁ লো আয়লো।

দূর হইতে ঝিঁ ঝিঁ ধরার ছড়ার সুর ভাসিয়া আসিতেছে। পদ্মার পূবের ঘরের কাকীমা তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে চলিয়াছে। জ্যেঠিমা ধূনা ঘুরাইয়া যায় ঘরে ঘরে। এখুনি ডাক পড়িবে জ্যেঠ্যাইমার স্তোত্র পাঠে। পদ্মা উন্মনা হইয়া ভাবে, আর কোন দিন কি সে ঐ স্কুলের মাঠে অশোক গাছের ছায়ায় বই লইয়া বসিতে পারিবে না। আশ্রমেও যায় না সে কতকাল। তাহার অসমাপ্ত শাড়িখানা কে বুনিতেছে কে জানে। যমুনার 'জামাই' সেই যে দ্বিরাগমন করিতে শ্বশুর বাড়ীতে আসে আর নিজের গ্রামে ফিরিবার নাম করে না। যমুনার ঠাকুরমার ঘরখানিতে সে দখল বসাইয়া লয়। দেশে তাহার আছেই বা কি। একখানা দোচালা ঘর। তারও টিনগুলি এক মুদীর কাছে বন্ধক দেওয়া। এখানে কয়দিন ভরিয়া পাড়া-পড়শী শালীদের আদর-আপ্যায়নে ও ঠানদি শাশুড়ীর হাতের মুড়ি-মুড়িকেতে তাহার মন জমিয়া উঠে। শীগগীরই নাকি কর্তা বাড়ীতে কবিগান আসিতেছে। সে নিজেও কিছুদিন যাত্রার দলে কাজ করিয়াছে। দলের অধিকারীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় সে কাজ এখন ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। অবশ্য সে খবরটুকু শ্বশুর বাড়ীতে বলা চলে না, বৌয়ের কাছে তো একেবারেই না। সবাই জানে, তাহাদের অধিকারীর হাতে কোনও বায়না নাই, তাই মদনের এখন ছুটি কিছুদিন।



সারা সকাল ভাতের সঙ্গে রাব গুড় মাখিয়া বড়শির 'আধার' ঠিক করে। মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া একটু ঘুম দিয়া উঠিয়া খালের ধারে আসিয়া বসে। একেবারে সন্ধ্যার আগে 'ডুলা' ভরা টেংরা পুঁটি টাকি

মাছ লইয়া ঘরে ফেরে। ঠানদি ফোকলা দাঁতে খুশির হাসি হাসে—খাসা তর তাজা মাছ। একটু মাছ হইলে তবু চারটি ভাত খাইতে পারি। বুড়া হইলে রুচির বাছ আরম্ভ হয়।

বছর ঘুরিয়া আসে। কর্তা বাড়ীতে কবিগান চলিতেছে। সপ্তাহ ভরিয়া দিনরাতে গান চলে। গ্রাম-গ্রামান্তরেও পুরুষেরা চঞ্চল হইয়া উঠে—মেয়ে কবির দলের গোলাপী নাকি পুরুষ দলের দলপতিকে ছড়া কাটায় একেবারে নাজেহাল করিয়া দিয়াছে।

মদন একটা পানবিড়ির দোকান দিয়াছে কর্তাবাড়ীর পথে। গোলাপীকে নিজ হাতে পানের খিলি সাজিয়া দিয়াছে সে। তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি খুশিতে চিক চিক করে। মিছরির মত গলা গোলাপীর। তাহার বাপের জন্মে এমন গলা কেউ শোনে নাই। পানবিড়ি কেনা বেচার ফাঁকে ফাঁকে বাবরি চুলে চিরুণি বুলায়। কে জানে কখন গোলাপী পানদোকানীর খোঁজে আবার আসে। শুভ মুহূর্ত বৃথা না যায়।

গোলাপী আসে ঠিকই। দোকানীকে সে চিনিয়া রাখিয়াছে। কাল রাতে পানের খিলিতে কেশর বিলাস ঢালিয়া দিয়াছিল দোকানী। কেন জানে, গোলাপী।

নাটমন্দিরে আসর জমিয়া উঠিয়াছে। শৈলর গানের পালা এখন। শৈলর গলা মণ্ডপে উঠিয়াছে। মেয়েলী সুরের মাদকতা দর্শকের চোখে। গোলাপী আসর হইতে উঠিয়া আসে। দলপতির চোখ এড়ায় না। তিন-তিনটা মেয়ে যোগাড় করিয়াছে সে। উহাদের জন্যই তাহার আজ এত পসার। তাহার উপর গোলাপীর যেমন গলা, তেমনি রূপ।

—একখিলি পান খাওয়াও দেখি—ঠিক কালকের মত করে সেজে দিও। মদন গলিয়া যায়! মনে আছে তবে। গত রাত্রির পানের সুগন্ধ ভোলে নাই গোলাপী। গোলাপী পানের খিলি হাতে লইতে লইতে জিজ্ঞাসা করে—কি নাম গো তোমার দোকানী—ঘর বুঝি কাছেই।

দিনের বেলায় রাত্রি জাগরণের অবসাদ ভরা দেহে—ঘুম ভরা চোখে 'বাসী' কাজ করে যমুনা। গতরাত্রির উচ্ছিষ্ট বাসনের পাঁজা লইয়া ঘাটে যায়! এখনও কানে বাজে কবি মেয়েদের গানের সুর। হঠাৎ

চোখ পড়ে খালের ওপারে। মদন বঁড়শি লইয়া বসিয়াছে এই ভোর বেলায়। তাহার পাশে বসিয়া সেই কবির দলের সুন্দরী মেয়েটা। এক মুহূর্তে যমুনার মন বিষাইয়া উঠে। গানের সুন্দর কলিগুলি কোথায় মিলাইয়া যায়। যমুনা মনে মনে গুম হইয়া বাসন মাজা শেষ করে।

সারাটা দিনই মুখভার করিয়া থাকে সে। উনানের ডালের হাঁড়ি বসাইয়া পাতা দিয়া জ্বাল ঠেলে। শুকনো পাতাগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে। জ্বলন্ত আগুণের শিখায় যমুনার ম্লান মুখখানাতে মনের তলার বিতৃষ্ণারই ছায়া পড়ে। হইলইবা পুরুষ মানুষ। তার জন্য একেবারে দিন দুপুবে সূর্যের তলায় বসিয়া একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি। রাগে রাগে আধসিদ্ধ ডালে সম্বরা দিয়া দেয়। ধরনীবুড়ী শাক বাছিতে বাছিতে তাকাইয়া দেখে—ও কি লো, এ কেমন ছিড়ি রাঁধন। এমন রান্না পুরুষ মানুষের পাতে দেওয়া যায়।

যমুনা ঝাঝিয়া উঠে—পুরুষ মানুষ! মাইয়া মানুষ আর মানুষ না।

ঠাকুরমা বোঝে সব। নাতনীর পছন্দ হয় নাই জামাইকে। কিন্তু সবই যে কপালের ফের। তা না হইলে বাপই বা কেন এক কুড়ি-টাকার মায়ায় কাঞ্চনপুরের অমন সুন্দর কুঞ্জ ছোঁড়াটাকে হাতছাড়া করিবে। তবু নাতনীকে বুঝায়।

অভিজ্ঞতায় ঠাসা জীবনের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে-সে। যমুনার ঠাকুরদার সেই মায়াদয়াহীন প্রহারের কথা ভাবিলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। যমুনাকে বুঝায়—মেয়ে মানুষ যদি সব আগলা করিয়া দেয়, তবে ঘোড়ার লাগাম ছুটিয়া যাইতে কতক্ষণ।

যমুনা বড় হইয়াছে। যৌবনের সাড়া সর্বাঙ্গে। সাজ গোজ ভালবাসে সে। সুন্দরখুড়ির নিকট চুলের ফিতা কাঁটা, মাথার ফুল লইয়া চুল বাঁধিতে যায়। মদন এক শিশি সুগন্ধ তৈল আনিয়া দিয়াছিল সুগন্ধ তেলের মিঠা গন্ধে মনটায় একটু খুশির মোচড়-দেয়। বড় এক খিলি পান মুখে ঠাসিয়া প্রতাপ কাকার ঘরে ঘুরিয়া আসে। তার দূর সম্পর্কের কাকা এই প্রতাপ আর সূর্য। প্রতাপ বৌকে বাপের বাড়ী

হইতে আনিয়া নূতন সংসার পাতিয়াছে। সুন্দর-বৌরও মনে পরিপূর্ণ জোয়ার। যমুনাকে দেখিয়া ঠাট্টা করে—কি লো যমুনা, সুগন্ধি তৈলের ঘ্রাণ যে ভুর ভুর করে। জামাই বুঝি আইন্যা দিছে। তারপর এখন জামাইর ঘরে যাসত? তোর ঠাকুরমা সেদিন কইতাছিল—মাইয়াটারে লইয়া কি বিপদে পড়ছি—রাত্রে মোটে জামাইর ঘরে যাইতে চায় না। ক্যান লো-বিয়া হইছে বয়স হইছে এখন আবার ঠাকুরমার কাঁথার তলে কি।

সুন্দর বৌ ভাতের জ্বাল ঠেলিতে ঠেলিতে বলে—জামাই কি বাঘ না ভাল্লুক। এত ডর কিসের।

রাত শেষ হয় হয়। সিংজোর চিৎকারে প্রতাপের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। কর্তাবাড়ীর হিন্দুস্থানী দারওয়ান লাঠি ও লণ্ঠন হাতে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ধরনী বুড়ীকে ডাকিতেছে—ও ধরনী বুড়ী। হারাধনের মা শীঘ্র চলো কর্তাবাড়ী।

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া শীতে ঠক ঠক্ করিতে করিতে মাস্টার বাবুর উঠানের উপর দিয়া ছোটে। ঘরের ভিতর হইতে পদ্মার জ্যেঠীমা ডাক দেয়—কে যায় গো।

—আমি গো আমি। ছোট কর্ত্রীর ব্যথা উঠছে। আশীর্বাদ করবেন পোলা যেন ধরতে পারি।

ছোট কর্তার প্রথম সন্তান আসিতেছে। পুত্র সন্তান হইলে একখানা গায়ের চাদর চাহিয়া লইবে। বুড়া হাড় হইতে শীত যেন আর ছাড়িতে চায় না মাঘের সন্ধ্যায়।

ধরনী বুড়ী আঁতুড় ঘরে ঢোকে।

আকাশ ফর্সা হইয়া আসে। বুড়ীর কর্কশ হাতের উপর নরম তুলতুলে ক্ষুদ্র একটি শিশু নড়িয়া চড়িয়া কাঁদিয়া উঠে, বৃদ্ধার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চেঁচাইয়া বলে—জোকার দাও-জোকার দাও—পোলা হইছে।

উলুধ্বনি শুনিয়া পাড়ার সকলেই কান সজাগ করিয়া গোনে—এক

দুই-তিন...'পাঁচ ঝাক পড়লো লো—ছেলে হইছে।—গ্রাম ভরিয়া সকলেই খুশি হয়—ছোট কর্তার ছেলে হইয়াছে।

ক্ষ্যান্ত খেজুর তলা দিয়া ছোটে কর্তাবাড়ীর অন্দরের দিকে। রাধা কানাইয়ের হাত ধরিয়া দৌড়ায়, কর্তাবাড়ীতে রসগোল্লা বিলাইতেছে—ছেলে হইছে।

সুন্দর বৌ চেঁচাইয়া বলে—রাধা আমার ভাগেরটা আনিস লো।

ধরনী বুড়ী সন্ধ্যাবেলা একবার বাড়ী ফেরে। মন খুশিতে আনচান। দন্তবিহীন একগাল হাসিয়া বলে—এই টানা টানা চোখ—আর চুল কি—রাজ পুত্তুরই হবেন কালে।—নবাগত শিশুর বাপকে সে-ই ধরিয়াছে। এখন তাহার মুখের দিকেও তাকাইতে ভয় করে। তাহাদেরই মনিব—হর্তা কর্তা।

—যমুনা গেলি কইলো—তামাকের কল্কিটা একটু দেতো। সারা রাত একঠায় বসা। কোমরটা ধইরা গেছে।

সুন্দর বৌ ঠানদিদির সঙ্গে একটু মস্করা করে—'কোমরই ধরুক আর যাই ধরুক, ছেলে যখন ধরিয়া আসছেন তখন পোষাইয়া যাইব।

সুকল্যাণ কলেজে পড়িতেছে। বড় খালি খালি লাগে তারাসুন্দরীর। তার উপর শশাঙ্কশেখর আজ দুই বছর হইল জেলে রাজবন্দী হইয়া আছেন। বিচারবিহীন এ বন্দী জীবনের পরিধি কত দীর্ঘ কে জানে। ছাড়াছাড়া লাগে সবকিছু। সুকল্যানের জন্যও দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। শঙ্কা অহেতুক হয় না। সংবাদ আসে সুকল্যাণ ধরা পড়িয়াছে এক রিভলভার কেসে। তারাসুন্দরী ব্রহ্মসঙ্গীতের সুর দিয়া বুকের ভিতরের চাপা কান্নাগুলিকে ভুলাইয়া রাখিতে চান। চোখের তারায় ছায়া ফেলিয়া যায় শিশু সুকল্যাণের আধফোটা কথা আর কৌতুকভরা চাহনি। পিতার আদর্শকে বিদ্রূপ করিয়াছে সুকল্যাণ। এ যে কত বড় দুঃসহ আঘাত তাহা কি একবারও ভাবিল না সে!

দূরে আজানের সুর শোনা যায়। নগেন্দ্রশেখর ঠাকুর ঘরে গিয়া বসেন। বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়া যায়। খাল পাড়ের ছেলেমেয়েরা অবাক

হইয়া দূর হইতে দেখে, লাল পাগড়ীতে ছাইয়া গিয়াছে মাস্টার বাবুর বাড়ীর উঠান। কোথাকার পোস্ট মাস্টারকে নাকি বন্দুক দেখাইয়া টাকার ব্যাগ লইয়া গিয়াছে মুখোশধারী স্বদেশী ডাকাতেরা। রথীন্দ্র মাস্টারকেও গ্রেপ্তার করিয়া নাকি পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—

সৌদামিনী তামাকের টিকা দিতে দিতে বিড় বিড় করে, তাহার তিনপুরুষেও এমন দিন কেউ দেখে নাই। কপালে কি আছে কে জানে। মদন ভয়ের চোটে শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম ছাড়িয়া পালায়।

মাস না ঘুরিতেই বিলাসপুরের রায়দের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া যায়। ডাকাতরা রায়-গিন্নীকে নাকি বলিয়া গিয়াছে—কানুদা যে বাড়ী নেই তা আমরা জেনেই এসেছি।

ক্ষীণ ব্যাথার চাপ অনুভব করেন নগেন্দ্রশেখর। মাস্টার মহাশয়দের সঙ্গে বেদনার্ত স্বরে আলাপ করেন—আমাদের দেশের ছেলেদের জন্য এ পথ নয়। এ ওদের অন্ধ অনুকরণ। এ পথে দেশের মঙ্গল হতে পারে না।

পদ্মাকে কলেজে পড়াইতেছেন তাহার মা-বাবা। বিবাহযোগ্যা কন্যার সংসার আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া এ ভাবে বিদেশে অনাত্মীয়ের মাঝে থাকাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত মেয়েদের এ বয়স হইতেই। কিন্তু যুগের পরিবর্তনকেও অস্বীকার করা যায় না।

পদ্মা কলেজে ভর্তি হইয়াছে। একটি মেয়ে পিছন হইতে চোখ টিপিয়া ধরে—বলত কে? বিপাশাকে দেখিয়া পদ্মা খুশিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে। সেও ভর্তি হইয়াছে ঐ কলেজেই। একই বোর্ডিং থাকিবে তাহারা। পদ্মা যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

ভোরবেলা বোর্ডিং-এ ঘুম ভাঙ্গার ঘণ্টা পড়ে। তারপর চায়ের ঘণ্টা। চায়ের টেবিলে চেঁচামেচি কথাবার্তা তর্ক বিতর্ক শুরু হইয়া গিয়াছে। ঝি-রা সব চায়ের কেটলি লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। মারথা বিপাশাকে দেখিয়া উনানের ধার হইতে গরম চায়ের কেটলীটা লইয়া আসে। এই দিদিমণিটিকে সে একটু আলদা করিয়া ভালবাসে।

বোর্ডিং-এর সব কিছু নিয়মানুবর্তিতার প্রতিই বিপাশার শৈথিল্য। সময় মত নাওয়া-খাওয়া, পড়িতে বসা এমন কি লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমাইয়া পড়া এসব নাকি এই বয়সে আর পোষায় না। তাই সে 'রাত তুইটা পর্যন্ত জাগিয়া গল্প করে পদ্মার সঙ্গে। কিংবা দেশ বিদেশের উপন্যাস পড়ে। পদ্মা বিপাশার জীবনের অতীত কাহিনী শুনিয়া অবাক হইয়া যায়। বিপাশা কেমন নিঃসঙ্কোচে বলিয়া যায়, সে ভালবাসে জেলের এক রাজবন্দীকে।

বিশ্বরূপ ছোরা খেলা শিখাইত বিপাশাকে। একদিন অসাবধানে সে তীক্ষ্ণ ছোরার আঘাত লাগিয়া যায় বিপাশার বুকে। বিশ্বরূপ তাহার ছোরার মাথায় রক্ত দেখিয়া চমকিয়া উঠে—কি লাগলো নাকি। তবু বিপাশা সহাস্যে উত্তব দিয়াছিল, ছাত্রার বুকে আঘাত লাগান জীবনে সম্ভব নয় মাস্টার মহাশয়ের।—অহঙ্কার করার মতই ছিল বিপাশাব দক্ষতা। বিশ্বরূপও মুগ্ধ হইয়াছিল তাহারা দক্ষতা দেখিয়া।

তবু কেন জানি বিপাশার কথায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল বিশ্বরূপ। বিপাশার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ওদিকে বুকের রক্ত চুয়াইয়া ব্লাউজ ভিজিয়া উঠে

বিপাশা অনুপায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইয়া বোর্ডিংএ চলিয়া আসে। গোপনে গোপনে ওষুধ লাগাইয়া সে ক্ষত শুকায়। কিন্তু ক্ষতর দাগটা আজও আছে।

বিপাশা বিষণ্ণ মিষ্টি হাসিয়া বলে—জন্মান্তরেও যেন আমার এ দাগ না যায়।

পদ্মা ভাবে অন্ধকার কারাগৃহের নির্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনির্দিষ্ট কালের বন্দী বিশ্বরূপও কি এমন করিয়াই অনুভব করিতেছে বিপাশাকে। খাওয়ার ঘণ্টা পড়িতেছে। মেয়েরা সব হুড়াহুড়ি করিয়া নীচে নামিতেছে। সিকরুমে খাবার লইয়া আসিতেছে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী এ বোর্ডিংএর সবচাইতে অল্প বয়স্কা ঝি। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সে পদ্মাকে অনুরোধ জানায়—একখানা চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে তাহাকে।

লক্ষ্মী নির্দিষ্ট সময়ে পোস্টকার্ড লইয়া আসে। পদ্মা পোস্টকার্ড

খানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করে 'কি পাঠ দেব—কার কাছে লিখবে ?'

লক্ষ্মী আরক্তিম হইয়া উঠে। বিপাশা লক্ষ্য করিয়া বলে—কি স্বামীর কাছে লিখবে ?

সলজ্জে লক্ষ্মী মাথা নাড়ে।

পদ্মা আবার জিজ্ঞাসা করে—কি সংবাদ লিখবে ?

লক্ষ্মী এক কথাই বারে বারে বলে আর লাল হইয়া উঠে। বিপাশা মনেমনে দুষ্টুমীতে চটুল হইয়া উঠে। পোষ্টকার্ডখানা ফিরাইয়া দিয়া বলে—তুমি এখন কাজে যাও। আমি লিখে রাখবোখন। তোমায় সংবাদ বলতে হবে না।

বিপাশা লক্ষ্মীর হইয়া এক দীর্ঘ পত্র-লিখিয়া রাখে। লক্ষ্মী অবাক হয়—তাহারই মনের কথাগুলি ঐ কালির অক্ষরের মধ্যে এমন গুছাইয়া বলিয়াছে দিদিমনি। এই অবিবাহিত দিদিমনিই বা জানিল কি করিয়া তাহার মনের গোপন সংবাদ। খুশি হইয়া কাজে চলিয়া যায় সে।

শোবার ঘণ্টা পড়িতেছে—এখনই সুইচ অফ হইয়া যাইবে। বিপাশা তাহার পড়ার ডেস্ক বন্ধ করিতে করিতে বলে—লক্ষ্মীর স্বামী আবার এ চিঠির সংবাদ উদ্ধার করবার জন্য কার দুয়ারে ঘুরবে কে জানে। এ সতীসাবিত্রীর দেশের মেয়ে ঐ লক্ষ্মীর মনের স্বর্ণভাণ্ডারেও যে জমা আছে তার স্বামীর প্রতি অনুরাগ। সে পতি ভক্তিটুকুও জানাবার শক্তি নেই বেচারার।

বহুদিন মদনের সংবাদ পায় না—দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া আছে সৌদামিনীর মন। কিন্তু যমুনা আগের মতই ঘোরে ফেরে পাড়া বেড়ায়, সুন্দর খুড়ির বাড়ীতে দশ-পঁচিশ খেলে, তাহার কাজকর্মে সাহায্য করে। যমুনা যেন আরও বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে—শাড়ির আঁচলে দেহের পূর্ণতা বাধ মানে না। যমুনার ইচ্ছা করে, ঐ সুন্দরবৌর মত সেও তার নিজের একখানা ঘর লেপাপোছা করিয়া সুন্দর সাজাইয়া রাখে।

সাতদিন একটানা বৃষ্টির পর একটু রৌদ্রের ঝিলিক দেখা দিয়েছে। সুন্দরবৌ পুকুর পাড়ে ঘাসের উপর চাটাই পাতিয়া ধান রৌদ্রে দেয়।

মাথার উপর ধুসর বর্ণ মেঘ হালকা বাতাসে ভর করিয়া ভাসিয়া চলে। সুন্দরবৌ ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া চড়াই তাড়ায়। খুদে পাখী খালি ধান ছড়াইয়া জ্বালাতন করে।

চুলগুলি পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া ভাশুর ঝি রাধাকে ডাকে—লক্ষ্মী সোনা, একটু উকুন বাইছা দে না।

দিঘির পাড় দিয়া ক্ষান্ত মহারাণী ও যমুনা শাক তুলিতে চলিয়াছে। সুন্দরবৌ ক্ষ্যান্তকে ডাক দিয়া বলে—ও ক্ষ্যান্ত ঠাকুরঝি, দেখ দেখি ধানগুলি একেবারে শেষ হইয়া গেছে নাকি। ক্ষ্যান্ত ধান হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া গোটা দুই চাউল বাহির করিয়া দাঁতে দিয়া বলে, আর দুই এক 'আলঠ' রোদ দে। ধানে একটু ভাপ ধরছে। এই বাদলার দিনে আবার ধান সিদ্ধ করতে গেছিলি ক্যান ?

—সরকার বাড়ীর তাগিদের পর তাগিদ চলছে, তা এই দুপুরে দলবল লইয়া কই চলছো ?

—পাটশাক তুল্যা আনি চাউরগা। ভাত খাই কি দিয়া। আসুমখন ঐ বেলা। ক্ষান্ত দ্রুত হাঁটিয়া সঙ্গিনীদের ধরে। সুন্দরবৌর চমক ভাঙ্গে। কাল মেঘের টুকরাটা দেখিতে না দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাতাসে পিঠভরা চুল চোখে মুখে আসিয়া পড়ে। সুন্দরবৌ তাড়াতাড়ি ধানগুলি ধামায় ঢালিয়া কাঁখে তুলিয়া লয়।

ব্যস্ততাই সার—কয়েক ফোঁটা জল পড়িয়াই আবার রৌদ্র উঠে—বৌ-নাচানী বৃষ্টি। সুন্দরবৌ বাড়ী আসিয়া দেখে, কানাই উঠানে বসিয়া একটা পাটকাটির মাথায় সূতা বাঁধিয়া বঁড়শি বানাইতেছে।—কোন নদীতে মাছ ধরতে যাবি ?

সুন্দরবৌর—চোখে দুষ্টুমী। কানাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাটকাটির বড়শি বানাইতে বানাইতে উত্তর দেয়—সূর্য কাকার সঙ্গে খালপাড়ে মাছ ধরতে যামু।

সেই দুপুর হইতে খালের ধারে বসিয়া সূর্য মাছ ধরিতেছে, মনটা ভাল নাই তাহার। তাই কাজে যায় নাই। খোঁটে খোঁটে পুঁটি মাছ উঠে। খালের উপরে সাঁকোতে কার গলা শোনা যায়। যমুনার না ?

আঁচল ভর্তি শাক লইয়া সাঁকোর উপর দিয়া বাড়ি ফিরিতেছে যমুনা। চোখে চপল দৃষ্টি।

কানাই চেঁচাইয়া উঠে—কাকা আঁধার যে খাইয়া গেল মাছে—

যমুনা হাসে। পেছনে ক্ষ্যান্তর গলা শোনা যায়—কিলো সাঁকোর উপরেই থাকবি?

—তোমাগো জন্যইত দাঁড়াইয়া আছি।

—হাঁটনের কি নমুনা। শামুকেও ত এর থেইকা তরস্তে হাঁটে।

—তোর না হয় বয়সের জোয়ার, পায়ে তাই রেলগাড়ির চাকা। আড় চোখে তাকাইয়া দেখে ক্ষ্যান্ত সুন্দরকে।

বেলা পড়িয়া আসে। সুন্দর বৌ ঘাটে বসিয়া বাসন মাজে, ক্ষ্যান্ত পাড়ে বসিয়া ফিস ফস করিয়া কথা বলে—মানসাবাড়ি চল একদিন, অব্যর্থ ওষুধ পাবি। পাঁচটা পান আর পাঁচটা সুপারি আর পাঁচটা তামার পয়সা লাগবে। ক্ষ্যান্ত উঠিয়া দাঁড়ায়, বেলা আর নাই। সুন্দর বৌ ঝামা দিয়া কড়াইয়ের কালি ঘষিয়া তোলে। চোখের সামনে বেদনাতুর সুখস্বপ্ন। মা-মনসা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন কি? বুকের ভিতরে যেন কোন শিশু হামা দিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়। উত্তরের ঘরে শাশুড়ী বৌ ধান ভানিতেছে। নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া শুধু ঢেঁকির শব্দ কানে আসে।

বিষ্যৎবার সারাদিন উপোস থাকিয়া সুন্দর বৌ ক্ষ্যান্তর সঙ্গে মনসা-বাড়ি যায়। মনসাবাড়ির উঠানে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু প্রৌঢ়ের ভিড়। গোবর দিয়া লেপা মাটির রোয়াকে মনসাঠাকুরের বিধবা পিসি বসিয়া আছে। গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনতিলক। ঘরের দুয়ার ভেজানো। ভেতরে ঠাকুর 'বায়ালি' পড়িয়াছেন।

বটেশ্বরীর ডাক হয়। ফোঁশ ফোঁশ শব্দে মনসাদেবী ভক্তের উপর ভর করেন। বাইরে উঠানে বরপ্রার্থীরা করজোড়ে সসম্ভ্রমে তাকাইয়া আছে—কান সজাগ। কখন কার ডাক হয়। ঠাকুরের দিদি চেঁচাইয়া বলে—বটেশ্বরীর ডাক হইছে।

আলুথালু বসন সংযত করিতে করিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা করজোড়ে

দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলে। ঘরের ভিতর হইতে অস্পষ্ট সুরে অলক্ষ্য দেবতা কথা বলেন—তোর মনে বড় অশান্তি। বড় দুঃখ পাইতেছিস তুই।

বৃদ্ধা চোখ মুছিয়া নম্র বিনীত সুরে উত্তর দেয়—মা তোমার ত কিছুই অজানা নাই। এর বিহিত কর মা। আমার ঐ একমাত্র ছেলে। কই যে আছে, কেমন আছে—ভিতর হইতে বাধা দিয়া বলেন—কোনও ভয় নাই—শীগ্‌গীরই খবর পাবি। মাটিপড়া নিয়া যা।

আবার ডাক হয়—কাদম্বিনীর। আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া কাদম্বিনী দাঁড়ায়—পেছন হইতে ধরিয়া দাঁড়ায় শাশুড়ী প্রণাম কর।

সুন্দর বৌ আকণ্ঠ ঘোমটা দিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে। বুকটা ঢিব ঢিব করে। এতগুলি লোকের মধ্যে সে তাহার আকাঙ্ক্ষার কথা কেমন করিয়া বলিবে। মনে মনে মনসাদেবীকে ভাবে—মাগো তুমি ত সবই জান।

—সিন্ধুবালা কে, তার ডাক হইছে। ঠাকুরের দিদি চেঁচাইয়া ডাকে।

ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি সুন্দর বৌকে দুয়ারে লইয়া যায়। ভিতর হইতে আশ্বাসবাণী শোনা যায়—তোর মনে বড় অশান্তি। শনির গ্রহ লাগছে তোর পেছনে। সামনের রবিবারে পূজা দিয়া যাইস সব ঠিক হইয়া যাইব।

যাওয়ার আগে ক্ষ্যান্তর সঙ্গে ঠাকুরের দিদির ফিসফিস করিয়া কথা হয়—কি যেন একটা শিকড়-ওষুধ দিয়া দেয় সঙ্গে।—বৌ, এইটা বাটিয়া খাইতে দিস।

ফেরার পথে খামারবাড়ির পাশ দিয়া ক্ষ্যান্তর পিছন পিছন হাঁটে সুন্দর বৌ—মস্ত ঘোমটা।

কামলারা সব 'বাড়কীর' ধান মাপিতেছে—লাভেরে এক, লাভেরে দুই, লাভেরে তিন। সূর্য ও প্রতাপ দুই ভাই-ই ধান মাপিতে আসিয়াছে। গোমস্তা বৈরম খাঁ হিসাব ঠিক রাখে—নায়েবের খাতায় লিখাইতে হইবে।

—নয়নতারা—দশ দাঁড়ি সিদ্ধ, শ্রীদামের বৌ পাঁচ দাঁড়ি সিদ্ধ, নিস্তারিণী দশ দাঁড়ি আতপ।

যমুনাও বাড়কীর ধান নিতে আসিয়াছে, না হইলে খাইবে কি—স্বোয়ামী যখন—মনে মনে ভাবে বৈরম খাঁ। আড়চোখে একটু তাকাইয়া দেখে তাহাকে।

গোলমাল হইয়া যায় হিসাবটা। আবার মনে মনে গুণিয়া ঠিক করে।—যমুনা, কিসের ধান লিবা?

—সিদ্ধ চাউলের।

মফি মিঞা মাপিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে আড়চোখে নজর রাখে বৈরম খাঁর চোখের উপর আর দেখ না দেখ পাঁচসের ধান বেশি ঢালিয়া দেয় যমুনার ধামায়। যমুনার নজর এড়ায় না। সূর্যেরও চোখ এড়ায় না।

যমুনার চোখদুটি পাকিয়া উঠে—বাহাদুরী আছে মিঞাভাইর। কি তরস্তে হাত চলে, নাতেরে এক নাতেরে দুই।

কিন্তু সূর্য গম্ভীর হইয়া যায়।

সুন্দর বৌ ঘোমটায় ফাঁক হইতে দেখে, ধান মাপারত স্বামীর পেশী-বহুল অনাদৃত বক্ষ, ঘর্মাক্ত ললাট। তাার ডাগর চোখে ভালবাসা ঝরিয়া পড়ে। দূরের বাংলো বাড়ীর প্রাঙ্গণে রঙ বেরঙের বিলিতি ফুলের বাহার। ভিতরে কলের গান চলিতেছে। বাংলোবাড়ির বাগান হইতে জমিদারের ছোট মামা সিদ্ধেশ্বরের চোখ পড়ে সুন্দর বৌএর উপর।

—ছোটলোকের ঘরের এত রূপ! চোখ ফিরাইতে পারে না সিদ্ধেশ্বর।

সূর্য বাড়ি গিয়া যমুনাকে ডাকিয়া বলে—তোর বাড়কির ধান এর পর থেইকা আমি আইন্যা দিমু। আর পরনের কাপড় কিনাইয়স বলাইরে দিয়া সামনের হাটে—আমি টাকা দিমু। সূর্যের এ গম্ভীর আদেশ যেন অমান্য করিবারও অধিকার নাই যমুনার।

সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরে প্রতাপ। তাহার মন বড় খুশি আজ।

নূতন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। বৌকে ডাকিয়া সংবাদ দেয় ছোট কর্তার ছেলের অন্নপ্রাশন সামনের মাসে। আর উৎসবের ছবি ফুটিয়া উঠে চোখের সামনে। কবি-খেমটার বায়না দেওয়া হইয়া গিয়াছে। খুশিতে ডগমগ প্রতাপ। সিদ্ধেশ্বর আসিয়াছে প্রতাপের খোঁজে। প্রতাপ জলচৌকিটা আগাইয়া দেয় বসিতে।

সিন্ধুবালার কেমন ভয় ভয় করে—কেমন ধারা চাউনি মানুষটির। যেন সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া গিলিতেছে।

ভাল করিয়া গায়ে কাপড় টানিয়া দেয়। ঘর হইতে আর বাহির হয় না।

মাস কাটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে অন্নপ্রাশনের দিন আসিয়া পড়ে। জরির পোশাক পরানো হইয়াছে ছেলেকে। গৃহদেবতার দুয়ারে ছেলেকে বলন করিয়া নেওয়া হইবে—পালকি সাজানো দুয়ারে এরই মধ্যে সোরগোলে পড়িয়া যায়—ছেলের গলার হার কি হইল! অন্দরমহলে নারীকণ্ঠের গুঞ্জন আরম্ভ হয়—কি সর্বনাশ, কার এমন সাহস। বাহিরবাড়িতে নায়েব-গোমস্তার হাঁক-ডাক পড়িয়া যায়। চাকর-বাকর, 'কামলাদের ডাকিয়া ধমকায়—ভাল চাস তো এখনও স্বীকার কর, না হলে 'বাটি পড়া' দেব। ভয়ে মুখ শুকাইয়া যায় কামলাদের।

সিদ্ধেশ্বরের হঠাৎ মনে পড়ে, সে নাকি প্রতাপকেই আজ সকালে বারেবারে ছেলের গলার দিকে তাকাইতে দেখিয়াছে।

প্রতাপের চোখমুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠে। কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হাতের বেতের চিক্কণ ডগাটার দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায়, 'ধর্মের দোহাই হুজুর একাজ আমি করি নি।

সিদ্ধেশ্বরের গোঁফের আড়ালে ক্রুর হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।

জমিদারের হুকুম শুনিয়া মুখ শুকাইয়া যায় সকলের। গোলাবাড়ির ছোট একটা ঘরে লইয়া পিঠমোড়া দিয়া বেত মারা হইবে প্রতাপকে। প্রতাপের করুণ কাকুতিতেও কঠিন আদেশ নড়চড় হয় না। এক মুহূর্তে পাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে সংবাদটা। ধরণী বুড়ি নিজকানে শুনিয়া আসে প্রতাপের আর্ত চিৎকার। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ি ছুটিয়া

আসে। সুন্দর-বৌকে ডাকিয়া বলে—আর দেরি করিস না বৌ—যা মনিবের হাতেপায়ে ধর গিয়া—ওরে তো মাইরা শেষ করল।

ভীত কম্পিত পায়ে সুন্দর-বৌ ধরণী বুড়ির পিছন পিছন ছুটিয়া চলে। লজ্জা করার সময় না এখন। দূর হইতে স্বামীর করুণ চিৎকার কানে আসে। গোলাবাড়িতে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া সিদ্ধেশ্বর সিগারেট টানিতে টানিতে নায়েবের সঙ্গে কথা বলিতেছে। ধরণী বুড়ি সুন্দর-বউয়ের কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিয়া দেয়—পায়ে ধর, পায়ে জড়াইয়া ধর।

সুন্দর-বৌ নায়েবের পায়ে জড়াইয়া ধরে—ধর্মের বাপ আপনি, ছাইড়া দেন—দোহাই আপনার—।

নায়েব পা সরাইয়া লইয়া ধরণী বুড়িকে তিরস্কারের সুরে বলে—একে আবার এখানে আনলি কেন? বাড়ি যা তোরা।

সিদ্ধেশ্বর কামনাতুর দৃষ্টিতে দেখে সজলনয়না সুন্দর-বৌকে। মনে মনে ভাবে, এখন তো সংমের বালাই নাই। আর সেদিন বুঝি লজ্জাবতীর ঘর থেকে বার হওয়াও গেল না। ছোটলোকের বৌ—তার আবার অত সংগোপনা। কুটিল হাসির রেখা গোঁফের তলায় মিলাইয়া যায়। এ সতীপনা ছুটবার খুব ভাল জানা আছে। মনে মনে হিসাব করে একজোড়া মাকড়ি গড়াইতে দিতে হইবে।

ঘরে ফিরিয়া সুন্দর-বৌ লক্ষ্মীর কাছে মাথা ঠোকে। বিধাতার বিরুদ্ধে বুকঠাসা অভিমানে চোখের জল বাধা মানে না। দূর হইতে চলন বাদ্য শোনা যায়—উৎসবের কোলাহল।

জমিদার বাড়ির অন্দরে গিয়াও পৌছায় প্রতাপের চিৎকার। বড় কর্ত্রী নায়েবকে ডাকিয়া হুকুম দেন—ছেড়ে দিন ওকে।

নায়েব বিরক্ত মনে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।—এত মার খেয়েও ব্যাটা স্বীকার করলো না—দেখা যাবে পরে।

সমস্ত শরীরে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে। চোখমুখ লাল। ঘরে গিয়া মাটির উপর শুইয়া পড়ে প্রতাপ। বৌকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া এ চোর অপবাদ লইয়া। স্বামীর চোখের জল দেখিয়া সুন্দর-বৌর দুঃখের মধ্যে হু হু করিয়া কান্না ঠেলিয়া উঠে।

নহবতের উপর সানাইয়ে মালকোষ রাগিনী বাজিয়া উঠে—সানাইয়ের সুরে বুকের পাঁজরের মধ্যে চুয়াইয়া উঠিতে চায় প্রতিহিংসার ক্ষীণ বাসনা। মূক দম্পতি আধা-অন্ধকার ঘরের মধ্যে আকুল হইয়া বিধাতার নিকট ভাষাহীন অভিযোগ জানায়—গরীব বইলাই তো আমাগোর এই বিচার। তুমিও কি এর বিচার করবা না ঠাকুর।

কাঠের পুলের উপর হইতে সূর্য দেখে জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রতের ভিড়। প্রতাপের প্রতি এ অবিচারে তাহার সমস্ত মন ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। কর্তাদের জমিতে চাষ করিতেছে বলিয়াই কি এত অন্যায়-অত্যাচার সহিতে হইবে তাহাদের জীবন ভরিয়া। বংশানুক্রমে যুগ যুগ ধরিয়া চলিবে এ অন্যায় অবিচার। এ অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে মাথা গুজিবার মত তাহাদের এই পূর্বপুরুষের ভিটাটুকুও থাকিবে না। নিজের হাতে গাছগাছালি লাগায় তাহারা; ঘরের চালে লতাইয়া উঠে লাউ-কুমড়ার ডগা। তবু ঐ ভিটার মাটিতে তাহাদের কোনও অধিকার নাই। কেন এ অবিচার। ভিতরের উষ্ণ রক্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিধাতার রাজ্যে এত অবিচার আর কতকাল জমা থাকিবে!

বিপাশা একখানা চিঠি হাতে লইয়া পদ্মাকে খুঁজিয়া হয়রান হয়। দোতলা, তিনতলা কোথাও নাই পদ্মা। স্টাডিরুমের বারান্দা হইতে চোখে পড়ে, পদ্মা মাঠে বসিয়া বই পড়িতেছে। সামনেই একটা পপিফুলের বেড, একটা ফোয়ারা—এখন আর জল পড়ে না। ঘাসের উপর পপিফুলের পাপড়ি বিছান। বিপাশা চিঠিটা দেখাইয়া খুশির সুরে বলে—কি খাওয়াবে বল।

চিঠির গায়ে জেলখানার ছাপ আঁকা। পদ্মার ছোড়দা মুক্তি পাইয়া দেশে চলিয়াছে। আফিংফুলের মতই খুশির রক্তাভা ছড়াইয়া পড়ে পদ্মার সারা মুখে। বিপাশার দাদাও রাজবন্দী হইয়া আছে বক্সা জেলে।

অরুণাভের সঙ্গে তার শেষ দেখা দিনটি চোখে ভাসে। কাঁটা

তারের ঘেরা পাহাড়ের টিলায় বসা এক তীক্ষ্ণ সুদর্শন ছেলে। মাথার উপরে মেঘলা আকাশ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাইনগাছের সারি। আর এক সপ্তাহ পরেই পূজার ছুটি আসিয়া পড়ে। পদ্মা পূজার ছুটিতে বাড়ি আসে।

জমিদার বাড়িতে পূজার বাজনা বাজিতেছে। সুকল্যাণের থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে জেলখানার বন্ধুদের কথা, পদ্মার কাছে জেলের ছেলেদের গল্প করে। তারা ড্রাম বাজাইয়াই পূজার উৎসব জমকালো করিয়া তুলিত। না দেখিলেও জেলখানার বন্ধুরা পরিচিত হইয়া উঠে পদ্মার মনে। পদ্মা বোঝে, সুকল্যাণ তাহাদের ভুলিতে পারিতেছে না। জীবনের একটা বিশিষ্ট অধ্যায় যাহাদের সঙ্গে কাটাইয়া আসিল, তাহাদের কথা ভোলা সহজ নয়—হয়তো সম্ভবও নয়।

পদ্মা রান্নাঘরে বসিয়া ছোড়দার জন্য নিত্য নূতন খাবার তৈয়ার করে। সুকল্যাণ কর্মরতা পদ্মার চুলের বেণীতে মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলে—মনে আছে ছোট বেলায় একবার তোর চুলের একদিকের বিনুনী কেটে দেওয়ায় বাড়িসুদ্ধ লোকের কাছে বকুনি খেয়েছিলাম আমি। এক দুপুর পা ছড়িয়ে বসে সে কি কান্না মেয়ের! আমি যত বলি এক ফোঁটা রক্ত পড়ে নি ততই কান্না আরও বাড়তে থাকে।

নগেন্দ্রশেখরও একবার আসিয়া রান্নাঘর ঘুরিয়া যান।—আজ নূতন কি রান্না হচ্ছে আমার অন্নপূর্ণা মায়ের ঘরে।—উহাদের আসরে একটু কথা বলিতে চান নগেন্দ্রশেখর। সুকল্যাণের দীপ্ত মুখখানা এত কাছে বসিয়াও যেন কতদূর হইতে দেখিতেছেন মনে হয়। আবার উঠিয়া যান স্কুলের দিকে। বাগানের কাজের তদারক করে না, —না সূর্যকে নিয়ে আর চলে না। কেবল ফাঁকি। পঞ্চমুখী জবার গাছগুলি শেষ করে দিয়েছে। মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন কিন্তু মনের তলায় স্থির প্রসন্নতাই উঁকি মারে।

লক্ষ্মীপূজার দিন সুকল্যাণের এক বন্ধু বেড়াইতে আসে। অনুপম। পদ্মা তাহার ছোড়দার নিকট বহু সুখ্যাতি শুনিয়াছে এই অনুপমের সাহিত্যিক প্রতিভার। পশ্চিমে কোন এক শহরের কলেজের অধ্যাপক,

সে। সকালের মিঠা রোদে বসিয়া চা খায় উহারা। পদ্মা খাবার সাজাইয়া দেয়। অনুপম তাহাকেও ডাকে খাবারের আসরে। পদ্মা অপরিচিতের নিকট একটু সঙ্কোচ বোধ করে। পদ্মার জ্যাঠামশাই উত্তর দেন—পদ্মা আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমার উপোস করেছে।

অনুপম হাসিয়া বলে—বাঙ্গালী মেয়ে তো—কলেজে পড়া মেয়ে হলে কি হবে? পূজা অর্চনাটা তাদের মজ্জায় মেশান।

জ্যেঠামহাশয় উত্তর দেন—যে দেশের যে বৈশিস্ট্য। এ দেশ কোন-দিন তার নিজ বৈশিন্ট্য ভুলতে পারে না।

পদ্মা তাহার পূবের ঘরের কাকিমার সঙ্গে ঘর ভরিয়া আলপনা দেয়। লক্ষ্মীর পাড়া দিয়া ধানছড়া ঘুরাইয়া আনে। সম্মুখে পূজার আয়োজন। অনুপম মুগ্ধ হইয়া দেখে চিত্রণরতা পদ্মাকে। আঙিনায় শুভ্র আলপনার বুকে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। অনুপম মুগ্ধ চোখে দেখে পদ্মার জ্যেঠিমাকেও। শাঁখা সিঁন্দুর আর লালপাড় শাড়ি। তাহার প্রবাসী বাঙালীর চোখে এই স্নিগ্ধ মূর্তিখানি বড় অপরূপ লাগে।

পূজা শেষ হইয়া যায়—ঢাক লইয়া অন্য বাড়ি যায় ঢাকী। সমস্ত বাংলাদেশে ঘরে ঘরে আজ এই একই বাদ্য বাজিবে। অনুপম উঠানে বসিয়া তন্দ্রাজড়িত চোখে সমস্ত বাংলার একখানি সম্পূর্ণ চিত্র যেন দেখিতে পায়।

পিসিমা প্রসাদ লইয়া আসেন। সুকল্যাণ পূজাপার্বন পছন্দ করে শুধু এই প্রসাদের অংশটুকুর জন্যই। সে দুইহাত অঞ্জলি পাতিয়া বলে, চিরজীবী হউন ভারতের লক্ষ কোটি দেবদেবীরা।

গোবর দিয়া লেপা উঠানের বুকে জ্যোৎস্নার বন্যা আসিয়াছে। চাঁদের আলোতে পাটি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে দুই বন্ধু। পদ্মার মনে আজ শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। এই লক্ষ্মীপূজার দিনটা তাহার বড প্রিয়। ঐ শুভ্র আলপনা আর চাঁদের কিরণ মিলিয়া আজ তাহার মন পরিপূর্ণ।

অনুপম ডাকে পদ্মাকে—কথা শোন বাঙালী মেয়ে।

খুশি হয় পদ্মা। বাঙালী মেয়েই তো সে। এইতো তাহার গর্ব—। এই তার সত্যিকারের পরিচয়। তাহার এই একান্ত পরিচয়খানি

অনুপমেরও চোখে ধরা পড়িয়াছে। সেও দেখে অনুপমকে। তাহাদের আঙ্গিনার এ বিশেষ রাত্রির অতিথিকে। জ্যোৎস্নাস্নাত এক সুপুরুষ মূর্তি।

পরের দিনটা থাকিয়াই চলিয়া যায় অনুপম। পিসিমা অনেক করিয়া বলিয়া দেন, কলিকাতা যাওয়ার পথে এখান হইয়া যেন যায় সে। এই পথেই তো যাইতে হইবে তাহাকে।

মাত্র দুইদিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে অনুপম। কিন্তু দুইটি দিনই অনুক্ষণ কথা বলিয়াছে সে। সুবক্তা সে ঘরোয়া আসরে! পদ্মা লক্ষ্য করিয়াছে তাহার বুদ্ধির দীপ্তি। মোহিত হইয়াছে তাহার কথার বুনানিতে। পদ্মা ভোলে নাই, অনুপম যাওয়ার আগে কথা দিয়া গিয়াছে সে আসিবে, মৃদু প্রতীক্ষাকাতর মন লইয়া সে কাজ করিয়া যায়। স্বল্পভাষিণী পদ্মা সব কথাই যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে স্নিগ্ধ অনুভূতির মাধুরীতে।

কোজাগরীর পর অতিথি অভ্যাগত সবাইকেই মিষ্টিমুখ করাইতে হয়। পদ্মা জ্যেঠিমার সঙ্গে বসিয়া নারিকেলের গঙ্গাজল, লস্করা সাঁজে তোলে। পিসিমা মুড়ির মোয়া চিড়ার মোয়া বানাইয়া রাখে।

গ্রামের সবাই কোলাকুলি করিতে আসে। প্রাক্তন ছেলেরা আসিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যায়।

পদ্মা জ্যেঠিমার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মকাটা কাঁসার রেকাবে জলপান সাজায়। হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কলেজেপড়া প্রাক্তন ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া আলোচনা হয়। সন্ত্রাসবাদের বিফলতা আজ তাহারা ব্যথার সঙ্গে স্বীকার করে।

পূজার ছুটি ফুরাইয়া আসে। ছাত্ররা একজন দুইজন করিয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এরই মধ্যে একদিন টেলিগ্রাম আসে, শশাঙ্ক মুক্তি পাইয়া বাড়ি আসিতেছেন। পদ্মার জ্যেঠিমা পিয়নকে ডাকিয়া বকশিস দেন।

মুহূর্তের মধ্যে গ্রামে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। স্কুলের ছেলেরা, প্রাক্তন ছাত্ররা সবাই ছুটিয়া আসে। তাহারা অভিনন্দন মালা লইয়া

স্টীমার ঘাটে যাইবে। কলাগাছ, পূর্ণ কলসী আম্রপল্লব দিয়া দুয়ার সাজায়। পদ্মা চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া কাকাকে প্রণাম করে।

শশাঙ্ক মৃদু হাস্যে ছাত্রদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ উচ্ছ্বাসে কোনও উন্মাদনা অনুভব করেন না তিনি আজ। নগেন্দ্রশেখর লক্ষ্য করেন সহোদরের মনের এ পরিবর্তন।

শশাঙ্কশেখর কলিকাতায় থাকিবেন স্থির করেন। কুসুমলতা অবাক হন। কিন্তু নগেন্দ্রশেখর বিস্মিত হন না শুধু একটা ক্ষীণ বেদনা উপলব্ধি করেন ভিতরে ভিতরে। একান্নবর্তী পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইয়া যাওয়ার মতই বড় অসহায় বোধ করেন নিজেকে। সুকল্যাণ জেলে জেলেই প্রায় কাটাইল এতকাল। সন্ত্রাসবাদী সুকল্যাণ তাহার মনের আর একটা ব্যথার স্থান। উহা স্বদেশপ্রেম নয়।

বিশেষ বয়সের একটা উগ্র নেশা মাত্র। সত্যনিষ্ঠ দেশসেবক একমাত্র গান্ধীপন্থীরাই। তাহারাই এদেশের মর্মবাণী উপলব্ধি করিয়াছে। তাই শশাঙ্কের প্রতি তাহার আস্থা ও আশা এত প্রবল কিন্তু সেও কি ভারতের এ ঐতিহ্যকে ভুলিয়া গিয়াছে?

পদ্মা অবাক হইয়া তাহার সনাতনপন্থী সেজকাকার মুখে শোনে নবজাগ্রত রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের অতুলনীয় কাহিনী। এ শুধু কথা বলা নয়, সমস্ত হৃদয় দিয়াই আজ তিনি উপলব্ধি করিতেছেন সেই সুদূরবর্তী হিমশীতল দেশের অন্তর্নিহিত কি এক গভীর তত্ত্বকথা। কথা বলিতে বলিতে দীপ্ত হইয়া উঠে তাঁহার চোখ মুখ। নগেন্দ্রশেখর লক্ষ্য করেন কেমন এক পরাভবের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ওঠে মন। শশাঙ্ক চলিয়া যাইবেন। সবাই যদি শহরমুখী হইতে চান, তবে এ দীনদরিদ্র পল্লী-বাসীকে বাঁচাইয়া রাখিবেন কে। বাংলার মেরুদণ্ড এই গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবেন কাহারা। নগেন্দ্রশেখর মনের অবসন্নতা ঝাড়িয়া ফেলিতে চান—আশ্রমে একটু ঘুরিয়া আসেন। নূতন লাগান তূলাগাছগুলির কি দশা হইল দেখিতে যান।

শশাঙ্কশেখরের রওয়ানা হইবার দিন আসিয়া পড়ে। পদ্মাও যাইবে

সঙ্গে। কিন্তু সুকল্যাণ গ্রামেই থাকিবে। রামভদ্রপুর স্কুলে একটা মাস্টারী লয় সে। নগেন্দ্রশেখর খুশি হন। কিন্তু শশাংক বোঝেন, স্কুলের কাজ লওয়াটা সুকল্যাণের একটা অজুহাত মাত্র, আসলে রাজনীতি করার জন্যই দেশ ছাড়িতেছে না সে এখন।

শশাঙ্ক পদ্মাকে লইয়া রওয়ানা হইয়া যান। ভোরে স্টীমার ছাড়ে। শীতের আশঙ্কায় স্তিমিত হইয়া আসিতেছে খরস্রোতা পদ্মা। স্টীমারের চাকা ঘুরিয়া চলে দক্ষিণমুখে।

পদ্মা প্রাণ ভরিয়া দেখে—নদীর জলে সদ্যস্নাতা কৃষক কুমারীর অবাক চাহনি, কলসী কাঁখে ঘোমটাটানা গৃহস্থ বধূ, কাঠের গুদাম ঘর, বন-বনানী ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। আরও দূরে সুপারীগাছের সারির আড়ালে তাহার জ্যেঠিমা পিসীমা, জ্যেঠামণির বিদায় কথাটুকুই যেন তাহার জীবনেও অক্ষয় সঞ্চয়।

অনুপমও চলিয়াছে সঙ্গে। এই সীমাবদ্ধ এই যাত্রাশেষের সঙ্গেই চির-দিনের জন্য ভাবাইয়া যাইবে সে। পদ্মা স্টীমারের রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া দেখে—দূরে বিলীয়মান প্রিয় গ্রামখানি। দিগন্তে বিলীন রবিশস্য।

অনুপম পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। আবার দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হয় কি এক মধুর উত্তেজনায়। অনুপম লক্ষ্য করে পদ্মাকে। উপভোগ করে তাহার সুন্দর লাজুকতটুকু। স্টীমারের অপর প্রান্তে কে গলা ছাড়িয়া গান করিতেছে। জলকণা ভারী বাতাসে বাতাসে সে সুর দূরে তরঙ্গায়িত পদ্মার বুকে মিলাইয়া যায়।

সন্ধ্যা হইয়া আসে। অন্ধকার ছায়া নামে ঘন নীল জলে—কোমল অনুভূতিতে মন ভরিয়া উঠে।

এই বিশাল নদী, অনন্ত জিজ্ঞাসা ভরা নীলাকাশ আর ঘন বনের ইশারা পদ্মার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

পদ্মা এখন শশাঙ্কশেখরের কাছেই থাকিবে ঠিক হইয়াছে। চারতলার উপর দুইখানা ঘর লইয়া ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। শশাঙ্কের ঘরে লোক আসে ঘন ঘন—পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্ক বিতর্ক সমালোচনা চলে

গভীর রাত্রি পর্যন্ত। পদ্মা বারান্দায় বসিয়া পুরানো মাসিক পত্রিকা উল্টায়, কিন্তু পড়া আর হয় না—ঘরের মধ্যে তুমুল তর্ক উঠিয়াছে। দুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। সোভিয়েত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা, কংগ্রেস পলিটিক্স, এ. আই. সি. সি. রেজলিউশন, সর্বহারা বিপ্লবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সূক্ষ্ম কূটতর্ক চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ! পদ্মা অবাক হইয়া শোনে।

রাজনীতির জটিলতা বোঝে না সে। শ্রদ্ধা করে স্বদেশী ছেলেদের। শ্রদ্ধা করে দেশবন্ধু, মতিলাল, লালা লাজপতের স্মৃতিকে। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত চিত্ত জোঠামণির সেই বিষণ্ণ মুখখানা পদ্মার শিশু মনকেও সেদিন নাড়া দিয়াছিল। শ্রদ্ধা করে সে মহাত্মা গান্ধীকে। তাহাদের গ্রামেও গিয়াছিলেন সেই মহাত্মা। পদ্মার শৈশব উত্তীর্ণ তখন। সূতাকাটারত সারিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবিকার ভিতর দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান পদ্মার পিসিমা এক ফালি খদ্দরপরিহিত এক অতি-মানুষকে। ছোট্ট পদ্মা বিস্মিত চোখে দেখিয়াছিল—দেশের মহাত্মাকে। বিপুল শক্তিমান অলৌকিক কিছু যেন আবির্ভূত হইয়াছিল সেদিন তাহার চোখের সামনে। মানুষ নয়—মহাত্মা।

পদ্মা আজ অবাক হইয়া ভাবে, এতকাল নিজেকে সে শুধু এক কাব্য-ময় পর্দার আড়ালেই রাখিয়াছে।

পদ্মার কলেজ জীবন শেষ হইতে চলিল। দেখিতে দেখিতে একটি বছর কাটিয়া গেল, মনে হয় এই সেদিনের কথা। মাঠের কোণে একখানা বই লইয়া বসে। বইয়ের ভাঁজ হইতে একটা পুরান চিঠি চোখে পড়ে। অনুপমের চিঠি। বিজয়ার পর একখানা চিঠি লিখিয়াছিল তাহাকে—লাজুক মেয়ে, এ বছর আমি যেতে পারলাম না, তাই এখানে বসে মনে পড়ছে গত বছরের কোজাগরের রাত্রিটি।

বিশেষ কিছুই লেখে নাই অনুপম, তবু মনে হয়, যেন বিশেষ কত কিছুই লেখা আছে ঐ ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে। প্রতিটি কথা এক মধুর অর্থ লইয়া ধরা দিতে চায় যেন।

অনুপমের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হইবে কি। কি একটা মৃদু

ব্যথার উত্তাপ ভিতরে। তবু অনুপম কোনদিন জানিবে না তার এ ব্যথার সংবাদ।

পদ্মা আর বিপাশা একদিন শশাঙ্কের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াইতে যায়। গঙ্গার উপর দিয়া নৌকা চলিয়াছে। বিপাশা নৌকার মাথায় বসিয়া কি লইয়া পদ্মার সঙ্গে তর্ক করিতেছে। শশাঙ্ক একটু কৌতুকের সঙ্গে শোনেন দুইজনের বাদানুবাদ।

দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। দ্বাদশ শিব মন্দির, রাণী রাসমণির কালীমন্দির, পরমহংস দেবের বাসগৃহ। বেগবতী নদী ছুটিয়া চলিয়াছে দক্ষিণে। আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। পদ্মা বলে—মন্দিরে মন্দিরে প্রাত্যহিক বৈকালী, সন্ধ্যারতি, গীর্জায় গীর্জায় প্রতি রবিবারে প্রার্থনা শোনা, মসজিদের নমাজ পড়া, জীবনের সঙ্গেই জড়িত এ ধর্মানুষ্ঠান গুলি। প্রাণের সঙ্গেই মেশান। আমাদের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মুসলমানদের ঈদের চাঁদ, খৃস্টানদের বড়দিনের উৎসব, এত শুধু দেব-অর্চনা মাত্র নয়। এর সঙ্গে জড়িত শিশুমনের কত বিস্ময়, কত রহস্যময় কল্পনা।

বিপাশা উত্তর দেয়—শিশুমনের কল্পনাকে সজীব করতে স্বর্গের দেবদেবী কেন? ইতিহাসের স্মরণীয় দিনগুলি দিয়েও তো তাদের উৎসব সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

পদ্মা বলে—দেখো বিপাশা, আনন্দ জিনিষটা তর্কের ব্যাপার নয়। বিশেষ করে, শিশুর আনন্দ। দুর্গাপূজার সময় একবার পূজামণ্ডপে গিয়ে দেখে এসো তারপর বল, শিশুদের মন থেকে স্বর্গের দেবদেবীদের নির্বাসন দেওয়ায় লাভের অঙ্কে না লোকসানের অঙ্কেই শূন্য পড়বে।

মিটিং, বস্তি আর পাঠচক্র—এই লইয়াই ঠাসা বিপাশার জীবন। সে একদিন তাহাদের এক বস্তীর মিটিং-এ পদ্মাকে ডাকিয়া লইয়া যায়।

কতকগুলি জীর্ণ খোলার ঘরের সামনে ছোট্ট একটু খোলা জায়গা—সামনেই একটা গরু মহিষের বাথান। মাঠটুকুর উপর সারি সারি কয়টা দড়ির খাটিয়া। মরা-ঘাসের উপর বসা কম বয়সের একটি ভদ্রলোক—

চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণতা। উনিই আজকের বক্তা। অনতিদূরে আরও কমবয়সের একটি ছেলে অস্পষ্ট স্বরে কি আলোচনা করিতেছে। অনুমানে বোঝে, কলেজের ছাত্র তাহারা—মনের উত্তেজনাকে অপ্রকাশিত রাখার অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই এখনও।

ক্রমে ছোট্ট মাঠটুকু ভরিয়া যায়। হিন্দুস্থানী শ্রমিক সব। মনে হয়, সবে মাত্র কোনও কর্মস্থল হইতে ফিরিল। ঘর্মাক্ত দেহ, কারখানার কালির চিহ্ন চোখেমুখে।

সভা আরম্ভ হয়। শ্রমিকদেরই একজনকে সভাপতি করা হয়। একটা খাটিয়া খালি করিয়া দেওয়া হয় সভাপতির জন্য।

বক্তৃতা আরম্ভ হয় হিন্দিতে। পদ্মা বিস্মিত হয়, এত সহজে এত অনাড়ম্বরে যে আবার জনসভা হইতে পারে, সে জানিতও না।

পদ্মা অবাক হইয়া তাকায় শ্রোতাদের মুখে। গভীর মন দিয়াই শুনিতেছে তাহারা। চোখেমুখে ফুটিয়া উঠিতেছে কোন দুরন্ত আশার মৃদু আলো।

আবার কি শুনিয়া কালোছায়া নামে চোখে। উহাদেরই সুখদুঃখের কথা। শুধু ভাষার ঝঙ্কার নয়। প্রাণস্পর্শী সুচিন্তিত কথা সব। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সে যুদ্ধের ঢেউ তাহাদের বুকের উপর দিয়াও যাইবে। তাই আগে হইতে এ হুঁসিয়ারা।—

আগে হইতে হুঁসিয়ার না হইলে বৌ লইয়া ফুটপাতে পড়িয়া মরিতে হইবে। শেয়াল শকুনে ছাইয়া ফেলিবে এ সোনার বাংলাভূমিকে।

পদ্মা সশ্রদ্ধ চোখে বক্তার মুখের দিকে তাকায়। চোখে মুখে ঐকান্তিকতার গভীরতা, দৃষ্টিতে সুদূর প্রতিজ্ঞা। বিশেষত্ব নাই চেহারায়, তবু বিশেষ কি যেন ধরা পড়ে দেহের বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে।

প্রতিটি কথায় ঝরিয়া পড়ে কত গভীর মমতা। বিপাশা ফিসফিস করিয়া বলে—আমার দাদা অরুণাভ।

পদ্মা বিস্মিত হয়। খুশি হয়। এই বিপাশার দাদা! চোখে না দেখিলেও বহুকালেরই পরিচিত সে পদ্মার শ্রদ্ধানত মনের গভীরে। কত অগণিত নিশ্চঞ্চল মুহূর্ত কাটিয়াছে তাহার এই বীর বন্দীদের ধ্যানে।

সভা শেষ হইয়া যায়। বিপাশা বলে—চল পদ্মা, আমাদের নূতন আস্তানা দেখে যাও।

অরুণাভের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়।—আমার বন্ধু, শ্রীমতী পদ্মা। লাজুক মেয়ে পদ্মা কথা বলিতে পারে না। শেষে শ্রদ্ধা করে। অরুণাভ লক্ষ্য করে।

অরুণাভ ও বিপাশা ছোট একখানা বাসা ভাড়া করিয়াছে খালের ওপারে শহরের শেষ সীমান্তে। দোতলার উপর একটা ছোট ছাদের সংলগ্ন দুইখানা মাত্র ঘর। বাড়ির সামনেই এক জোড়া নারিকেলগাছ—নিচে খোলা মাঠ। অনতিদূরের খালের গায়ে সারি সারি খোলার ঘর—চটকল আর পাটকলের মজুরদের ঘর।

শিশুকালটা মামার বাড়িতে আর বাকি জীবন বোর্ডিংয়েই কাটাইয়াছে বিপাশা। বিপাশার মা আত্মহত্যা করিয়া মারা যান, বিপাশা তখন কথা বলিতেও শেখে নাই। বড় হইয়া সে বাড়ির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে নাই। যে সংসারে তাহার মাকে আত্মহত্যা করিতে হয়, সে সংসারে থাকিয়া তাহার মায়ের স্মৃতির অপমান করিতে রাজী হয় না সে।

তাহার পিতা থাকেন যুক্তপ্রদেশের এক ছোট্ট শহরে। লোকমুখে তাহার পিতার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের কথা বিপাশারও কানে আসে।

অরুণাভের পাঠ্যাবস্থা কাটিয়াছে তাহার ঠাকুরমার কাছে ধানখালি গ্রামে। কলেজে পড়িতে আসিয়া স্বদেশী স্রোতের টানে সেও হারাইয়া যায় বহু দূরে। তাই দাদার সঙ্গেও সম্পর্কটা তাহার নূতন করিয়াই শুরু হইয়াছে।

এই কয় মাসেই অরুণাভ পাড়ার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মুদি দোকানী, পান বিড়িওয়ালা কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক, স্কুল ফেরতা শিশু-ছাত্রবা, ঘুটে-দেওয়া-বৃদ্ধ পাগলী বুড়ি—সকলের সঙ্গেই তাহার হৃদ্যতা।

পাগলী বুড়ি তাহাকে ছেলে বলিয়া ডাকে।—ছেলে গেল কোথায় এই রৌদ্র মাথায় করে। দিন ভরিয়া শুধু ঘুটেই দেয় পাগলীটা?

অরুণাভ হাসে—নিজেও তো এই রৌদ্র মাথায় করেই ঘুঁটে দিচ্ছ। আমরা—দীনদুঃখী মানুষ, আমাদের মাথার উপর রৌদ্র দৃষ্টি থাকে—এই তো ঈশ্বরের বিধান।

—চমৎকার বিধান কিন্তু ঈশ্বরের।— বিপাশার বিদ্রূপ হাস্যে পদ্মার দিকে তাকায়। পদ্মা আপত্তি জানায়—এসব বিধান তো আর ঈশ্বর করতে আসেন নি। এ বিধান মানুষেরই। অরুণাভ মৃদু হেসে উত্তর দেয়—অথচ বেচারা ভালমানুষ ঈশ্বরের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষ তার কাজ হাসিল করে নিচ্ছে যুগ যুগ ধরে। পদ্মাও জানে তাহা। ইতিহাসে পড়িয়াছে সে। ধর্মের নাম করিয়া কত অন্যায় রক্তপাত হইয়াছে পৃথিবীতে সব যুগে সব দেশেই। আর উত্তর দিতে পারে না সে। অরুণাভ একটু স্নেহের হাসি হাসে।

বাড়ি আসিয়া ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া দেখে, আজ তাহার মায়ের মৃত্যু দিবস। মায়ের শেষ দেখা মুখখানা একটু মনে পড়ে। বিপাশার মুখে খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। একরকমই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর চেহারা ছিল তাঁরও। বিপাশা অনেক চেষ্টা করিয়াও মায়ের মুখ মনে করিতে পারে না।

বিপাশা তখনই আবার বাহির হইবে।

অরুণাভ ম্লান কণ্ঠে বলে—বিপাশা, আজ মায়ের মৃত্যু দিবস। আসার পথে একটু ফুল নিয়ে আসিস।

মায়ের শেষ দিনটি আজও এত স্পষ্ট মনে পড়ে তাহার। তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কি আকুল কান্না। মায়ের কান্না দেখিয়া তাহার চোখদুটিও জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, ঐটুকু বয়সেই কি করিয়া টের পাইয়াছিল, অবাক হয় অরুণাভ, হয়তো মনের সহজাত অনুভূতি দিয়াই বুঝিয়াছিল বাবার প্রতি মায়ের গভীর ভালবাসার কথাটা। বাবার জন্যেই কাঁদে যে তার মা সর্বক্ষণ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল সে। তাই সেদিন মায়ের চোখের বাঁধ-না-মানা বন্যা দেখিয়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে মাকে—বাবার জন্য কাঁদছো মা?

তাহার কথায় মা যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—নারে অরুণ, তোদের জন্যই বড় কষ্ট হচ্ছে। খুব ভাল ছেলে হোস কেমন? —তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইয়া ছিলেন।

অরুণ যেন মায়ের কথা শুনিয়া একটা সান্ত্বনার পথ খুঁজিয়া পাইল। কচি কণ্ঠে মাকে জানাইয়াছিল—মা, তুমি কেঁদো না। আমি খুব ভাল ছেলে হবে। বোনটিও খুব ভাল মেয়ে হবে।—এই তার শেষ কথা মায়ের সঙ্গে।

এক গুচ্ছ শ্বেতপদ্ম হাতে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরে বিপাশা। সঙ্গে পদ্মাকেও লইয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইতেই অরুণাভ ছাদে বসিয়া আছে। দূরের আকাশে গাঢ় অন্ধকার—যেন মৃত্যুর পরের অজানা অন্ধকারকেই ইঙ্গিত করিতেছে।

মৃত্যুর পরের জিজ্ঞাসা দিয়াই আরম্ভ মানুষের জীবনদর্শন। তারপর কি—এ প্রশ্নের সমাধান মিলিয়াছে মানুষের বুদ্ধিতে কিন্তু অনুভূতির রহস্য কাটে নাই।

বিপাশা ছাদে আসিয়া বসে। পদ্মাকে অনুরোধ করে—একটা গান কর পদ্মা। লাজুক মেয়ে পদ্মা। কিন্তু দুটি ভাইবোনের এ স্মৃতি দিবসের মৌন গাম্ভীর্য তাহার নিজের মনের কোন ব্যথার স্থানকেও নাড়া দিয়া যায়। পদ্মা গভীর দরদ দিয়া গান করে, হে মহা জীবন, হে মহামরণ।

দ্বিতীয়ার চাঁদের অতি ক্ষীণ জ্যোৎস্না সে শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ মুখে ছড়াইয়া পড়ে। পদ্মা যেন এই মুহূর্তটিতে নূতন করিয়া পরিচয় পাইল অরুণাভের। এত কাজের আড়ালে লুকান মানুষটির অন্তর্দেশেও জমিয়া আছে এত স্মৃতির পীড়ন।

অন্ধকার ভোরে উঠিয়া বাহির হইয়া যায় অরুণাভ। খালের ধার দিয়া শহরের দিকে হাঁটে। চাদরের তলায় লিথোকরা লিফলেটের ভারী বাণ্ডিল। রাস্তার কলের ধারে বস্তির মানুষদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে—পিতলের ঘটি, কলসী হাতে মেয়ে-পুরুষের ভিড়।

অবিরাম কাজ চতুর্দিকে। একদিন নূতন কর্মীর সঙ্গে দেখা হয় কৃষাণ অফিসে।—বোম্বের সূতাকলে ষ্ট্রাইকের খবর শুনেছেন?—দেড লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়েছে ধর্মঘটে। ছেলেটির চোখভরা আশার আলো।

অরুণাভের চোখেও সংক্রামিত হয় সে আশার সুর।

এই সতেজ আশা আর এই নূতন উদ্দীপনার সুর—এই তাহাদের ভবিষ্যৎ।

সারাদিন ধরিয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে। অরুণাভ শুইয়া শুইয়াই জানালা দিয়া আকাশে তাকাইয়া দেখে। এ গুঁড়ি বৃষ্টি থামিবার লক্ষণ আছে কি না। একটা অকারণ আলস্য আসিয়া জমিয়াছে আজ দেহে মনে। বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছে না। কিন্তু বাহির না হইয়া উপায় নাই। বস্তিতে একটা পাঠচক্রে ক্লাস লইতে যাইতে হইবে। পাশের ঘর হইতে মেয়েলী কণ্ঠের টুকরা টুকরা আলাপ, বিপাশার উচ্ছল হাসি ভাসিয়া আসিতেছে জানালা ঘুরিয়া।

আর শোওয়া চলে না। জোর করিয়াই দেহ মনের এ অলসতাকে ঝাড়িয়া ফেলে। পদ্মাকে ডাকিয়া বলে—পদ্মা, কষ্ট করে এলেই যখন সময় মত, তখন আর একটু কষ্ট করে দু-কাপ চা খাইয়ে যাও। একটু আবৃত্তির সুরে বলে—প্রথম পিয়ালা কণ্ঠ ভিজায়—দ্বিতীয় আমার তৃষ্ণা নাশে।

বিপাশা ঠাট্টা করে—বিপাশার করা চায়ে বুঝি তৃষ্ণা নাশে না?

অরুণাভ উত্তর দেয়—আমরা বাংলা দেশের ছেলে, পদ্মার পরিবেশনেই মন তৃপ্ত হয়। বিপাশা এসেছে বড় রুক্ষ দেশের ভিতর দিয়ে। তার অনুর্বর দানে আমাদের মন ভেজে না। বিপাশা দুষ্টুমির সুরে বলে—আচ্ছা দেখাই যাবে কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে। তখন স্রোতস্বিনী পদ্মার পাত্তাও পাবে না। আর যদি চোরা বালির তলায় লুকিয়েও থাকে সে স্রোতস্বিনী তাকে দিয়েও চায়ের পিপাসা মিটবে না—তখন বিপাশারই স্মরণ নিতে হবে।

পদ্মা একটু আরক্তিম হইয়া উঠে। সে উঠিয়া চায়ের সরঞ্জাম গুছায়। অরুণাভ স্টোভ ধরায়।

কেটলিতে জল ফুটিয়া ধোঁয়া বাহির হয়। অরুণাভ বলে—দেখ পদ্মা কেমন কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে।—বিপাশা ঠাট্টার সুরে বলে, পদ্মার দর্শনের এটা গোড়ার কথা। একেবারে ডিরেক্ট মেথড ট্রেনিং পাচ্ছ পদ্মা।

অরুণাভ বলে—তার চেয়েও ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আমার মনে।

পদ্মা নিজের অলক্ষ্যে আরও একটু আরক্তিম হইয়া উঠে। অরুণাভ লক্ষ্য করে। বলে—চোখের সামনে ধোঁয়া-ওড়া সুন্দর কাপে চা—সঙ্গে সঙ্গে এই বুড়ো মনটা ইয়াং হয়ে উঠে।

বিপাশা একটু হাসে—তার ওপর সে চায়ের পেয়ালা যদি কোনও কঙ্কন-পরা হাতে পরিবেশিত হয়।

—তা তো হয়ই।—হাসে অরুণাভ।

মনে মনে পদ্মার এই সলাজ রক্তিমাটুকু উপভোগ করে। পদ্মার এই স্নিগ্ধ ভাবটুকু ভাল লাগে। বর্ষাতিটা গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া যায়—চলি পদ্মা, মাঝে মাঝে এসে এমন চা খাইয়ে যেও।

শশাঙ্কের ঘরে ছোট একটি আসর জমিয়াছে। শীতের সন্ধ্যা। পদ্মা জানালার ধারে বসিয়া মহুয়ার কবিতা পড়িতেছে। স্টোভের উপর চায়ের জল বসান। মেঝের উপর শেষ বেলার রৌদ্র। পাশের ঘর হইতে তর্কালাপ ভাসিয়া আসে। পদ্মা উন্মনা হইয়া ভাবে, সত্যি কি এরা রবিঠাকুরকে বুর্জুয়া মিষ্টিসিজম বলিয়া ব্যঙ্গ করে! মানুষের অন্তরাত্মার সৌন্দর্য পিপাশাকে কটাক্ষ করে বিলাস বলিয়া?

অরুণাভ ঘরে ঢোকে। হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ। পদ্মার কোলের উপর বইটাতে চোখ বুলাইয়া ঠাট্টার সুরে বলে, কি 'মহুয়া'? পদ্মা মৃদু হেসে উত্তর দেয়, 'মহুয়ার' পাতা পুড়িয়ে পুড়িয়ে যারা চায়ের জল গরম করে তাদের দলে ভিড়বার যোগ্যতা যে অর্জন করি নি।

অরুণাভ হাসে, কিন্তু 'মহুয়ার' পাতা পড়ে পড়েও চায়ের জল গরম করে যারা তাদেরও দলে ভিড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করেছি আমরা। কাজেই একটা রাতে একটু কষ্ট করতে হবে আমাদের জন্য। একরাশ পোস্টার লেখা বাকী এখনও। আজ রাতের মধ্যেই শেষ করা চাই।

একা সারারাত জাগলেও শেষ হবে না। বেকার মানুষের জন্য একটা কাজ নিয়ে এলাম, খুশি কি না বল ?

—কাজটা চিরস্থায়ী তো ?—পদ্মা একটা মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলে।

—সেটা বিচার হবে কাজের যোগ্যতা দিয়ে।—অরুণাভ তুলি কালি লইয়া বসিয়া পড়ে।

পদ্মা চা তৈয়ার করিয়া দিয়া আসে পাশের ঘরে। অরুণাভের সামনেও এক পেয়ালা চা রাখিয়া একটা তুলি লইয়া বসে। তুলির টানে বড় বড় লাল অক্ষরগুলি জ্বল জ্বল করিয়া উঠে। নিঃশব্দে সময় কাটে। পদ্মার সমস্ত সত্তায় একটা তৃপ্তির আমেজ ছড়াইয়া পড়ে।

বাহিরে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঘন হইয়া উঠে। ব্লাক আউটের অন্ধকার রাত্রি।

পদ্মা তুলি বুলাইতে বুলাইতে ভাবে, অরুণাভের মধ্যে লুকান আছে কিসের এক আকর্ষণীয় গভীর আন্তরিকতা। শ্রদ্ধা করে সে তাহার জ্যেঠিমা, জ্যেঠামণি পিসিমাকে, ভালবাসে বিপাশা ও সুকল্যাণকে, অনুপমের পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্যে মুগ্ধ সে—তবু মনে হয়, তাহার আত্মার আপনজন কেহ নাই ঐ ছবিতে।

পদ্মা টের পায়, অরুণাভের চোখে ধরা পড়িয়াছে তাহার এই নিঃসঙ্গ মূর্তিটি। অরুণাভ কথা বলে কম। অনুপমের মত অত কথা বলার ক্ষমতাও হয়তো নাই তাহার। তবু সে যখন চলিয়া যায়, মনের ভিতরে এক দুর্বোধ্য ব্যথা অনুভব করে সে অনুক্ষণ।

রাত্রি গভীর হইতেছে ধীরে। পাশের ঘরে পড়ায় মগ্ন শশাঙ্কশেখর। অরুণাভ আস্তে আস্তে বলে, আমাদের বাড়ির ওপর ওয়াচ বসেছে। মনে হচ্ছে বিপাশার উপরই নজর। তাই এখানে এলাম। এ বাড়িটা এখনও পুলিশের নজরে পড়ে নি। কি একটু চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করে, —নিচের ফ্ল্যাটের ওরা কেমন লোক ?

পদ্মা একটু লজ্জিত হয়। মিশুক মেয়ে নয় সে। নিজে হইতে যাচিয়া কাহারও সঙ্গে মিশিতে জানে না। তাই এতদিন যাবৎ আসিয়াও কোনও ফ্ল্যাটের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই।

অরুণাভ পদ্মাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলে, মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাটা কিন্তু গুণ নয়।

শশাঙ্কশেখর একবার ঘুরিয়া যান—কি তোমাদের কত দূর হল? আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম।

অরুণাভ লজ্জিত সুরে উত্তর দেয়, শশাঙ্কদা আমার কিন্তু আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না। ভেবেছিলাম ওরা বুঝি সত্যি কাজের মেয়ে। কিন্তু যে গতিতে হাত ঘুরছে। আলপনাই শুধু দেওয়া চলে এ সব হাতে।

পদ্মা প্রতিবাদ জানায়, আচ্ছা গুণেই দেখা যাক, আলপনা দেওয়া হাতে পোস্টারও লেখা চলছে কি না।

শশাঙ্ক খুশি হয় পদ্মার উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া।

পদ্মা গভীর উপলব্ধির সঙ্গেই যেন লিখিয়া চলে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা। মোমাধারের ম্লান আভা আসিয়া পড়িয়াছে তাহার ঘন-পক্ষাবৃত আয়ত চোখ দুইটিতে। একটা নূতন আনন্দের দীপ্তি ঝরিয়া পড়িতেছে চোখের পল্লবে।

টানা টানা হস্তাক্ষর। মেয়ে কি পুরুষের লেখা বোঝার উপায় নাই। দূরে কোনও বড় লোকের বাড়িতে পেটা ঘণ্টা বাজে—এক···দুই।

অরুণাভ একবার চোখ তুলিয়া তাকায়—দুটো বাজলো, আর আধঘণ্টা বাদে তোমার ছুটি।

—আর আপনার?

—দেশে যেদিন মজদুরবাজ গঠন হবে সেদিন।

পদ্মা মনে মনে ভাবে, কি কঠিন দায়িত্ববদ্ধ জীবন উহাদের। কাজ, শুধু কাজ।

অরুণাভ ঠাট্টা করিয়া বলে—আজ তো পদ্মা আমাদের সঙ্গে বসে ধনীর রাজত্ব উচ্ছেদ করার জন্য রাত জাগছো। আর দুমাস পরেই যখন কোনো ভাগ্যবান বিজনেসম্যানের ঘর আলো করতে যাবে, তখন আবার এই পদ্মাকেই দেখবো হয় তো ষ্ট্রাইক-বিরোধী কোনও সভার সভানেত্রীরূপে। তাই না?

অরুণাভ শুনিয়াছে, পদ্মার বিবাহ স্থির করিয়াছে তাহার দাদা, তাহার বন্ধু এক বিজনেসম্যানের সঙ্গে।

অরুণাভ পোস্টারের উপর তুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুখ না তুলিয়া বলে—সেদিন আমাদের বিরুদ্ধে যত রণ'রঙ্গিনী মূর্তি ধর না কেন, বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে যেন আমরা বাদ না পড়ি।

দুষ্টুমিভরা চোখে পদ্মার দিকে তাকায় সে। কিন্তু পদ্মার চোখের দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্তে কথা থামিয়া যায় তাহার। অরুণাভ যেন জীবনে দেখে নাই এমন অন্তস্পর্শী দৃষ্টি। কি কি ধরা দেয় সে দৃষ্টির আড়ালে। অরুণাভ যেন ভয়ানক ভাবে ধাক্কা পায়। কলম ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রশ্ন করে—পদ্মা, তোমার মত নেই বিয়েতে?

পদ্মা ম্লান হাসিয়া বলে, আপনার কি মনে হয় আমাকে দেখে?

অরুণাভ আবার একমনে তুলি ঘুরায়। তাহার চোখের উপর হইতে একটা কুয়াসার পর্দা যেন সরিয়া যায় আজ। বিষণ্ণ নীরবতায় শুধু ঘড়ির টিক টিক কানে আসে। ঘড়িতে তিনটা বাজে। অরুণাভ পদ্মাকে বলে, আর লিখতে হবে না। এবার শুয়ে পড়।

—তা হলে আপনিও আসুন। এক সঙ্গে আরম্ভ করে আপনাকে মাঝখানে রেখে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

—ভাল দেখাতে চাইলে তো পদ্মা, সারাজীবনই চলতে হয় একসঙ্গে।

তাহার কথায় পদ্মার চোখে একটু আরক্তিম আভা খেলিয়া যায় নিমেষের জন্য। অরুণাভ লক্ষ্য করে। পোস্টারগুলি গুছাইয়া রাখে সে—কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে বাহির হইতে হইবে।

আকাশের অনেক উঁচুতে একটা উড়োজাহাজ চলিয়াছে দক্ষিণমুখী। জানালা দিয়া দেখা যায়, উর্ধ্ব আকাশে নীল তারার মত ছুটিয়া চলিয়াছে উড়োজাহাজের নীলাভ বাতি দুইটি।

অরুণাভ বাহির হইয়া যায়।

পদ্মার চোখে আর ঘুম আসে না। উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে মন। পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। নিচে ফুটপাতের উপর ঘুমাইয়া আছে গৃহহীন মানুষেরা। ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় দেখা যাইতেছে প্রেত-

লোকের অচেতন মূর্তির মত। অন্ধ ভিখারীটিও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বুকের কাছে ছোট ছেলেটি নিবিড় ভাবে ঘুমাইয়া আছে। তাহারই পাশে ঘুমাইয়া আছে লোম-ওঠা কুকুরটি। দূরে নারকেলগাছ জোড়াও তন্দ্রাচ্ছন্ন। শুধু ঘুম নাই তাহার চোখে—মমতায় আচ্ছন্ন দুটি ভীরু চোখ।

প্রকাশ কয়দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে—পদ্মার বিবাহ স্থির করিয়াছে সে তাহার এক বড়লোক কণ্ট্রাক্টর বন্ধুর সঙ্গে। পদ্মাকে সংবাদটা দিয়া তাহার একটা ফরম্যাল মতও নেওয়া দরকার। শিক্ষিতা সাবালিকা যখন।

পদ্মা তাহার প্রতি তাহার পরিবারের ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। শেষে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে স্থির হইল তাহার। পারিবারিক জীবনের সব কিছুর প্রতিই একটা বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়া গিয়াছে তাহার মনে। আগের সে ভীরু স্বভাবের স্থানে দেখা দিয়াছে এক বিদ্রোহী রুক্ষতা। খুশিমত ঘুরিয়া বেড়ায় আজকাল পদ্মা। রাত হইয়া যায়, তবু বাড়ি ফেরে না। শশাঙ্ক পদ্মার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। কিন্তু বিস্মিত হন না, কিন্তু প্রকাশ অবাক হয় বোনের চালচলন দেখিয়া।

পদ্মা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে, প্রকাশের উত্থাপিত বিবাহের প্রস্তাবে তাহার সম্পূর্ণ অমত। পদ্মার মত মেয়ের পক্ষে এ ঔদ্ধত্য স্পর্দ্ধাতীত। সমস্ত দোষ পড়ে শশাঙ্কর উপর। এতটা স্বেচ্ছাচারিতায় প্রশ্রয় দেওয়া খুব অন্যায় হইয়াছে। প্রকাশের চোখে মুখে চাপা বিরক্তি ফুটিয়া উঠে।

সাম্যবাদীদের মিটিংয়ে এত যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন পদ্মার। দেশাচার মানে না উহারা। অবিবাহিত ছেলেমেয়েতে যেখানে সেখানে যখন তখন এত ঘোরাঘুরি বরদাস্ত করিতে পারে না সে।

পদ্মা লক্ষ্য করে দাদার মনোভাব। কিন্তু আরও বেপরোয়া হইয়া উঠে সে। বিকালবেলা একটা মিটিংয়ে যাইবে। যাওয়ার আগে প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করে, চা চাই কি?

—কেন! তুই আবার বেরোচ্ছিস নাকি?

পদ্মা শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, একটা মিটিং আছে। চটকলে ষ্ট্রাইক চলছে—তার সমর্থনে। একেবারে স্পষ্ট মন্তব্য—এতটুকু লুকোচুরি নাই! প্রকাশ স্তম্ভিত হইয়া যায়।

সভা শেষ হইলে রাত্রিতে বাড়ি ফেরে পদ্মা। অরুণাভ সঙ্গে আসে। পথটা ভাল না। সভা শেষ হইলে পদ্মাকে ডাকিয়া বলে, দাঁড়াও পদ্মা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। শশাঙ্কদার কাছে একটু কাজ আছে।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটে দুইজনে নিঃশব্দে। স্বভাবতই মৌনভাষী পদ্মা। যাচিয়া কথা বলিতে ভালবাসে না। ম্লান জ্যোৎস্না। পিচঢালা রাস্তার গায়ে পাশাপাশি দুইটি ছায়া পড়ে। পদ্মা মনে মনে ভাবে, তাহার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে চলিয়াছে সে—অথচ সে হয়তো তাহার মনের কোনও খবরই জানে না।

পদ্মাদের বাড়ি আসিয়া পড়ে। অরুণাভের সঙ্গে পদ্মাকে এত রাত করিয়া ফিরিতে দেখিয়া প্রকাশ মনে মনে জ্বলিয়া উঠে। উদ্ধত গম্ভীর রুক্ষ স্বরে অরুণাভকে জিজ্ঞাসা করে, অরুণ, তোমার সঙ্গে পদ্মার কি সম্পর্ক জানতে চাই।—একটু থামিয়া ক্রূর ভঙ্গিতে বলে, মনে রেখো, এটা ভারতবর্ষ—রাশিয়া নয়।

অরুণাভ এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে স্তম্ভিত হইয়া যায়। এ অভিযোগ তাহার নিকট এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, যে তাহার ভিতরটা ক্রোধে ও অপমানে কাঁপিয়া উঠে। তাহার নামে এত বড় অভিযোগ আজ পর্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। কিন্তু পদ্মার সম্মানের জন্য মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া লয়। পদ্মা লজ্জায় মিশিয়া যায়। অরুণাভের মত মানুষের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ! মুহূর্তকাল কি চিন্তা করিয়া সে-ই উত্তর দেয়—আমার সঙ্গে অরুণাভবাবুর কি সম্পর্ক জানতে হলে সে প্রশ্ন একা তাঁকে করলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া মুস্কিল।—ধীর সংযত গম্ভীর কণ্ঠস্বর। একটু থামিয়া আরও স্পষ্ট আরও স্পর্দ্ধিত সুরে বলে, তাছাড়া আজ থেকে জেনে রেখো, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি অন্তর দিয়েই।

প্রকাশ এই স্পর্ধিত জবাবে স্তব্ধ হইয়া যায়। এতটুকু দ্বিধা নাই, জড়তা নাই পরিষ্কার স্পষ্ট নাটকীয় উত্তর।

অরুণাভ তাকাইয়া দেখে, পদ্মার চোখে যে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। এই কোমল মৃদুস্বভাব মেয়ের ভিতরেও যে এ মূর্তি লুকাইয়া থাকিতে পারে—এ যেন কল্পনাতীত তাহার কাছে। প্রকাশ আর একটাও কথা বলে না। আরও ঘাঁটাইলে আরও কিছু অপ্রিয় স্পষ্ট ইঙ্গিত জানাইয়া বসিবে ঐ উদ্ধত মেয়ে এই মুহূর্তেই। বাহির হইয়া যায় সে। তাহারই বোন শেষে অপমান করিল তাহাকে। একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে। অরুণাভ আবার তাকায় পদ্মার দিকে। চোখে চোখে মিশিয়া যায়। স্থির অচঞ্চল আয়ত দৃষ্টি। অকথিত, বহু কথার ভিড় সে চোখে।

প্রকাশের সংসারে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে তাহার বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে। অফিসে কাজ করিতে করিতে হার্ট ফেল করেন। একদিকে শোকে মুহ্যমান সংসার, অন্যদিকে আর্থিক অসচ্ছলতায় অসহায় হইয়া পড়েন নগেন্দ্রশেখর।

শিক্ষকতার এ সামান্য আয়ের উপর নির্ভরশীল সম্পূর্ণ একটি পরিবার। সবার উপরে বিবাহযোগ্যা পদ্মা। পিতার সঙ্গে অন্তরের স্নেহের সম্পর্ক অনুভব করে নাই সে কোনোদিন। তবু আজ তাহার অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অরুণাভ সংবাদ শুনিয়া পদ্মার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। অরুণাভ স্নেহশীতল হাতখানা রাখে মাথায়। পদ্মা অরুণাভর হাতখানা যেন তরঙ্গায়িত সমুদ্রে আশ্রয় ধরার মতই শক্ত করিয়া ধরে। অরুণাভ পদ্মার এই নিবিড় স্পর্শে তাহার মনের নির্ভিকতা উপলব্ধি করে।

পদ্মা আর পারিতেছে না নিজের সঙ্গে নিজের এই অহর্নিশি সংগ্রামে। ঘরে বসিয়া মনের অসহায়তাকে রূপ দেয় এক সম্বোধনহীন লিপিকায়। লেখে—তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল যে মুহূর্তে, সে ব্রাহ্মমুহূর্তকে আমার অন্তরের প্রণাম জানাই। কিন্তু বন্ধু, তুমি তোমার পা দিয়েছ পশ্চিম সাগরের ডিঙ্গিতে, আমি দিয়েছি পূবের,

তোমার ডিঙ্গির পাল পশ্চিমের হাওয়ায় খাটান, আমারটা পূবের হাওয়ায়। এমন সময় যদি বলি—এসো বন্ধু, তুমি আমি কাব্য পড়ি পাশাপাশি, ব্যঙ্গ করবে প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমার মন যে চায় বিপুল ব্যবধানের মাঝেও কাছে পাওয়ার মাধুরী।

লিখতে লিখতে চমকে ওঠে পদ্মা এ কি লিখিতেছে সে। কাহার কাছেই বা লিখিতেছে। উঠিয়া জ্বলন্ত উনানের আগুনে কাগজটুকু ধরে। অক্ষরগুলি জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়। তবু পদ্মাব মনের অক্ষর অস্পষ্ট থাকে না অরুণাভের চোখে। লক্ষ্য করে সে তাহার চোখভরা বিষণ্ণ আকুলতা। পদ্মা যে তাহাকে ভালবাসিতেছে উহা আর অস্পষ্ট নয় তাহার চোখে। কয়দিন ধরিয়া কি চিন্তা করিয়া বিপাশাকে বলে, পদ্মাকে ঘরে আনতে চাই। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি, তাই ভাবছি—

বিপাশা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, পদ্মা কি জানে না তা। দুঃখ বরণ করবার শক্তি নিয়েই ভালবাসছে সে। কাজেই সে উদারতাটুকু না দেখালেও চলবে।

—ওর বাড়ির লোকেরা যদি মত না দেন, ও পারবে কি সে দুঃখ স তে।

বিপাশা উত্তর দেয়—দুই নৌকায় পা দিযে তো আর চলতে পারে না। একটা নৌকা ছাড়তেই হবে।

শশাঙ্কশেখর শুনিয়া খুশি হন। প্রসন্ন চিত্তেই উহাদের আশীর্বাদ করেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তিতও হন—এ অসবর্ণ বিবাহে তাঁহার মা মত দেবেন কিনা সন্দেহ। শশাঙ্কশেখর স্থির করেন তিনি নিজেই বাড়ি গিয়া বাড়ির মত পাইতে চেষ্টা করিবেন।

এ সংবাদ শুনিয়া বাড়ির সকলে স্তম্ভিত হইয়া যায়। পদ্মার মত মেয়েও আধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। ব্যথিত হয় সবাই। পদ্মার মা কাঁদিয়া আকুল হন। শশাঙ্ক বুঝান, অন্যায় সে কিছু করছে না। এত দুঃখ পাচ্ছ কেন?

সুহাসিনী দেবরকে অভিযোগ করেন, মেয়েকে কেন এতটা প্রশ্রয় দিয়েছ, যাতে তাদের মত পরিবারে এত বড় কলঙ্ক দিল সে।

শশাঙ্কশেখর বলেন—পদ্মা যে পরিবারে বড় হয়েছে—সে পরিবারের মেয়ের পক্ষে জাতিভেদ অমান্য করাটাও আর অগৌরবের নয়। কাজেই এতে কলঙ্কের কি হল ?

নগেন্দ্রশেখর আহত হন—তাহার পদ্মার বিবাহও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হইবে! শশাঙ্ক অগ্রজকে জানান, আমি অন্তর দিয়েই বিশ্বাস করি, তার চাইতে যোগ্য ছেলে হতে পারে না—আমি অরুণাভকে ভালভাবে চিনি। একসঙ্গে একঘরে জেলখানায় বছরের পর বছর কাটিয়েছি।

নগেন্দ্রশেখরের কাছে শশাঙ্কের কথার মূল্য অনেক। তবু মনের ভিতরে কিসের যে কাঁটা বিঁধিতে থাকে অনুক্ষণ। দেশের আবহাওয়া বদলাইতেছে। উহা আর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

—ছেলেটি সাম্যবাদী—সাম্যবাদই তাহার জীবনের একমাত্র আদর্শ। নগেন্দ্রশেখর বলেন—বড় কঠিন পথ বেছে নিল পদ্মা। সামনে দারুণ দিন আসছে—সব সহ্য করতে পারবে তো।

শশাঙ্ক সগর্বে মৃদু হাস্যে বলেন—এ পরিবারের মেয়ে হয়েও পারবে না—এ কঠিন জীবনের গৌরব বহন করতে।

কুসুমলতার জীবনের বড় আদর্শ একনিষ্ঠ প্রেম। একবার যখন উহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, তখন আর অন্য পাত্রে কন্যাদানের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

আর সব চাইতে অসুবিধা হয় প্রকাশকে লইয়া। সে স্পষ্ট জানাইয়া দেয়, এ বিবাহে কেহ যোগ দিলে তাহার সঙ্গে তাহার পরিবারের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে।

প্রকাশের উপরই সংসার একমাত্র নির্ভর। প্রকাশ সম্প্রতি একটা যুদ্ধের কনট্রাক্টারী পাইয়াছে, আসামের এক সহরে। ভবিষ্যতে আশা প্রচুর। আয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মতামতের একটা বিশিষ্ট স্থান দেখা দিয়াছে সংসারে। তাছাড়া সে-ই পদ্মার অগ্রজ। নগেন্দ্রশেখর বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। গীতা উপনিষদ আর

ধ্যান-স্তবস্তুতি লইয়াই তাহার সমস্ত চিন্তা-ধারা ব্যাপৃত। আর আছে স্কুলের ভবিষ্যৎ-উন্নতির পরিকল্পনা, গভর্ণিং বডির মিটিং, শিক্ষক নির্বাচন। সংসারের প্রতি এক নিস্পৃহ উদাসীনতার ভাব আসিয়া গিয়াছে।

সুকল্যাণ ও শশাঙ্কশেখর পূর্ণমাত্রায় রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত। তাই প্রকাশই এখন তাহার স্বর্গগত পিতার স্থানটি অধিকার করিয়াছে বৈষয়িক ব্যাপারে। পদ্মার মাও তাই বড় ছেলের অমতে এ বিয়ে সমর্থন করিতে সাহস পান না। তাছাড়া ভিন্ন জাতিতে কন্যাদানে ঘোর আপত্তি তাঁর।

শশাঙ্ক ফিরিয়া আসিয়া অরুণাভকে জানান, উহাদের বিবাহটা তাড়াতাড়ি হইয়া যাক। না হইলে অসুবিধায় পড়িবে পদ্মা।

অরুণাভ আর সহিতে পারিতেছে না পদ্মার এ বিষন্ন দৃষ্টি। পদ্মাকে পাইতে চায় সেও।

বাড়ির কাহাকেও না জানাইয়া বিবাহ হইয়া যায় পদ্মার—রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে অঙ্গীকার করিয়া নাম সই করে পদ্মা—কম্পিত হস্তে। তাহার মনে আজ ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। প্রেম ও নীতির সংঘাত। প্রিয়-পরিজনদের মনে ব্যথা দিয়ে গ্রহণ করিতেছে সে জীবনের প্রিয়তমকে। আজ জ্যেঠামণির আদর্শে বড় হইয়া সে-ই পরিহাস করিল তাঁহার আদর্শকে জীবনের মধুলগ্নে। সলজ্জ কণ্ঠে উচ্চারণ করে যায়—আই টেক দি অ্যাজ মাই লিগেল হাসব্যাণ্ড।

বিবাহ-বাসর নাই, যজ্ঞাগ্নি নাই, উৎসব মুখরিত প্রাঙ্গন নাই। উলুধ্বনি নিনাদিত স্ত্রীআচার নাই—কাগজে কলমে স্বাক্ষরিত স্বামী-স্ত্রী তাহারা আজ হইতে।

এ মুহূর্ত হইতে নূতন পরিচয় শুরু হইল তাহার জীবনে। পরিণীতা বধূ সে তাহার প্রিয়তমের। অতবড় মধুর পরিবর্তন আসিল জীবনে, অথচ বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ নাই এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের। নবপরিণীত স্বামীর মধুর হাতে সিঁথির সিন্দুর পরাইয়া দিবার কথা ছিল আজ শুভলগ্নে অগ্নিসাক্ষীর সম্মুখে। ঐ অক্ষয় সিন্দুরটুকুই বিবাহিতা কন্যার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

বিপাশার ভাল লাগে এ সহজ অনাড়ম্বর বিবাহ পদ্ধতি। হিন্দু-বিবাহের বেশীর ভাগ আচার-অনুষ্ঠানই বড় অভিনয় অভিনয় মনে হয় তাহার চোখে। টোপর-পরা বর-বধূকে দেখিয়া হাসি পায় তাহার।

অরুণাভ লক্ষ্য করে পদ্মার চোখের পাতার ম্লান হওয়া। বোঝে কোমল মনের পক্ষে এ আঘাত উপেক্ষণীয় নয়। আত্মীয় পরিজন প্রিয়জনদের মনে ব্যথা দিয়া জীবনের এ বিশেষ দিনটিকে মন হইতে গ্রহণ করা সহজ নয় পদ্মাব পক্ষে।

ভোরের গাড়ীতে সুকল্যাণ আসিয়া পেঁছায়।

অরুণাভের সঙ্গে তাহার মতের ও আদর্শেব পার্থক্য বিবাট। হয়তো জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে পদ্মা। একটা বেদনা মিশ্রিত অনুভূতির মৃদুপীড়ন অনুভব করে সে মনের গভীরে। তবু প্রসন্ন হাসি দিয়া উহাদের কল্যাণ কামনা করে।

সুকল্যাণ পদ্মাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া বলে, কি রে। মাথায় সিন্দুর কই? আমি ভাবতে ভাবতে এসেছি—গিয়ে দেখবো সিন্দুর লেপা মাথায় মস্ত ঘোমটা-টানা এক লাজুক বৌ।

পদ্মা হাসে—বিষণ্ণ ম্লান হাসি। ছোড়দার এই আন্তরিক স্পর্শে চোখ ভিজিযা উঠিতে চায়। সুকল্যাণের দৃষ্টি এড়ায় না। সে অরুণাভকে ডাকিয়া হাসিয়া বলে, ভাবছো ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারকে মাত্র পাঁচটি সিকি দিয়েই আমাদের বোনকে ঘরে তুলে নেবে। সেটি হচ্ছে না। দস্তবমত পাল্কী চাই, সানাই চাই, সামিয়ানা ঝাড়-লণ্ঠন চাই—আলপনা দেওয়া আঙিনা চাই—তবে তো আমাদের বোন শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করবে। সুকল্যাণ তাহার সুটকেশ হইতে কি বাহির করিয়া পদ্মার হাতে দিয়া বলে, মায়ের আশীর্বাদ।

একটি কাঠের সিন্দুরের কৌটা দুইগাছা লালশাঁখা একজোড়া সোনার বালা ও ধান দূর্বা।

পদ্মা আবেগভরা হাতে গ্রহণ করে তাহার জ্যেঠিমার স্নেহাশীর্বাদ। তাহার চোখে যেন জল আসিতে চায় কি এক অনুভূতির মৃদু পীড়নে। সে জানে, জ্যেঠিমার দরিদ্র সংসারে ঐ বালা জোড়াই একমাত্র

সোনার জিনিষ অবশিষ্ট ছিল—সুকল্যাণের বৌকে আশীর্বাদ করবার জন্য সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি এ শেষ সোনাটুকু। নিরাভরণা পদ্মা শ্বশুরগৃহে যাইবে—এ বুঝি পদ্মার জ্যেঠিমা ভাবিতেও পারেন না। সুকল্যাণ একখানি শতরঞ্জি খুঁজিয়া আনিয়া পাতে ঘরের মাঝে। অরুণাভকে ডাকিয়া বলে, বস ভাই শান্ত ছেলেটির মত যা বলবো, তাই করতে হবে এখন। একটি রত্ন লাভ হচ্ছে—তার জন্য একটুও কষ্ট করবে না। বিপাশার দিকে তাকাইয়া বলে—কমরেডের বাড়ি যখন শাঁখ তো নিশ্চয়ই নেই। তবে বাঙ্গালী মেয়ে যখন—উলু দিতে নিশ্চয়ই জানেন।—নিজের আঙ্গুল হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া অরুণাভের হাতে দেয়।—এবার সিঁথিতে সিঁন্দুর পরিয়ে দাও।

অরুণাভ মৃদু হাসে। স্নেহমাখা হাতে সিন্দুর পরিয়ে দেয় পদ্মার সিঁথিতে। পদ্মা প্রণাম করে শশাঙ্ক ও সুকল্যাণকে। সুকল্যাণ অরুণাভকে দেখাইয়া বলে, আরও একজন গুরুজন বাকী রইল যে। আমাদের শাস্ত্রমতে স্বামী পূজনীয় ব্যক্তি। কমরেড নয় কিন্তু।

অরুণাভ হাসে। সুকল্যাণ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরে। হাতের স্পর্শে ঝরে প্রগাঢ় প্রীতি।

পদ্মার চোখের মেঘ কাটিয়া রৌদ্র দেখা দেয়। নির্মল প্রসন্ন রৌদ্র আশীর্বাদ করে সুনীল আকাশকে। বিপাশা চা ও মিষ্টি লইয়া আসে। সুকল্যাণ খুশি হইয়া বলে, এতক্ষণে কুটুমবাড়ীর পরিচয় মিললো। এইজন্য বোনেদের শ্বশুরবাড়ী এত প্রিয় আমাদের কাছে। হাসে বিপাশা। সারাটা দিন একটা খুশির আমেজে কাটিয়া যায়। রাত্রির গাড়ীতেই আবার চলিয়া যায় সুকল্যাণ—বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

অরুণাভের ঠাকুরমা সরকারমশাইকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া পাঠাইয়াছে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া—বৌকে লইয়া যেন একবার বাড়ী আসে অরুণাভ।

অরুণাভ ঘর ছাড়া দীর্ঘকাল। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়াছে তাহার স্বদেশী গোপন আস্তানায় আর জেলখানায়। তাই

বাড়ীর সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। অরুণাভের পিতা বিদেশেই থাকেন চিরকাল। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই তাঁহারও।

বাড়ীতে একমাত্র প্রাণী অরুণাভের বৃদ্ধা ঠাকুরমা। পাঁচ-সরিকের প্রকাণ্ড ·এলাকা, পর পর পাঁচটা বাড়ী। অরুণাভর তিন-আনার অংশ। তাহার পর দুই-আনি দশ-গণ্ডা ও এক-আনি ছয়-গণ্ডার মালিকরা বিদেশেই থাকে দুই পুরুষ যাবৎ। সেখানেই মস্ত ব্যবসা তাহাদের।

শেওলা ঢাকা একটা সাবেক ধরণের দালান আর আধভাঙা কয়েকটা টিনের ঘর পড়িয়া আছে দেশের ভিটায়, দিঘীর ওপারে পাঁচ-আনি ও চারি-আনির পর পর দুই এলাকা। পাঁচ-আনিদের জাঁক-জমক আজও স্মরণ করাইয়া দেয় গ্রামবাসীকে তাহাদের মনিবদের অতীত সমৃদ্ধির কথা। রাধাগোবিন্দের পূজার আয়োজন, ভোগ-রাঁধা, বৈকালী, সন্ধ্যারতি, বালকভোজন, তারপর রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ঝুলন, উৎসবমুখর মধুর বৎসর ঘুরিয়া চলে মন্থর গতিতে।

চুনকাম করা মাটির ঘর, সারি সারি ভিটের চৌচালা, সাবেক আমলের পুরান দেওয়ালের দালান, হাল ফ্যাসনের গাড়ীবারান্দা সংযুক্ত ইংলিশ টালির বাংলো বাড়ী—সর্বত্রই একটা আয়েসি আরামের অলস ভাব। এ নিশ্চল জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারে না অরুণাভ নিজেকে। তাহার জীবনাদর্শের সঙ্গে এ জমিদারীর বনিয়াদের কোনও মিল নাই। তাই তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম রাখিয়াছে।

অরুণাভের পিতা তাহার সম্পত্তির প্রায় সবটাই নষ্ট করিয়াছেন যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক মিটাইতে। অরুণাভের ঠাকুরমা একলা মানুষ অন্দরমহল আগলাইয়া আছেন। আর বাহির-বাড়ীতে আছে বৃদ্ধ সরকারমশাই।

বুড়ী কর্ত্রী একটা পুরু চশমা চোখে দিয়া রোদে বসিয়া পূজার দূর্বা তুলিতেছেন। সুপ্রিয় আসিয়া সংবাদ দেয়, ঠাকুরমা, তোমার নাতি যে বিয়ে করেছে, সে খবর রাখ।

বৃদ্ধা আনন্দে বিস্ময়ে অভিমানে বিহ্বল হইয়া পড়ে।—সত্যি আমাগো অরুণ বিয়ে করছে, কস কি। কই থেক্যা শুনলি এ-খবর।

—এবার মিষ্টি খাওয়াও। তাই তো তাড়াতাড়ি আসলাম।

—তা তো খাওয়ানই লাগবো। এর থেকে সুখের খবর আর আমার নাই। এইবার আমার ঘরে বাতি দিবার লোক আসবো। আজ আমার এতবড় আনন্দের দিনে এই বাড়ী লোকে লোকারণ্য হওনের কথা। বৃদ্ধা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, সবই উল্টা পাল্টা হইয়া গেল। অমন লক্ষীমন্তকে আমার—বৃদ্ধা আর বলিতে পারে না। লোল গণ্ডস্থল বহিয়া উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। বৃদ্ধা অশ্রু সংবরণ করিয়া বলেন, আর মাইয়াটার কি মতি একদিনের জন্যও বাড়ী আসলো না।

বৃদ্ধা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, এখন মরতে পারলে বাঁচতাম। তা কি আর অদৃষ্টে আছে।

সুপ্রিয় বলে, এখনই মরবে কি? আরও কত কিছু শেখার বাকী এখনও। রাজার প্রজায় সব এক হয়ে যাবে। আর ঐ যে তোমার নুড়িপূজো ওসব আর চলবে না। ঘরের দাই নিস্তারিণী আসিয়া যোগ দেয়, শুন ভাই হিটলার যদি জেতে, তবে নাকি বিধবাগোও টেবিলে বইস্যা মাছ-মাংস খাওন লাগবো।

বৃদ্ধা নিঃশ্বাস ফেলেন, কি জানি কি আছে কপালে। এমন কপাল না হইলে আর এত আয়ু হইবে কেন? এখন ভগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা—এই ভিটাটুকুতে যেন প্রাণটা ছাড়তে পারি। সব কিছুর মায়াই তো ছাড়ছি—শুধু এই ভিটের মায়াটুকু ছাড়তে পারি নাই।

বিপাশা শিশু শিক্ষার ট্রেনিংয়ে আছে মাদ্রাজে। অরুণাভ বাড়ীতে থাকে খুবই কম। পদ্মা একটা প্রতীক্ষমাণ মন লইয়া ঘর গুছায়। অরুণাদের টেবিলে কাগজপত্র গুছাইয়া রাখে। মাঝে মাঝে বেণু পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখে, এলোমেলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি—সদ্য লিথো ইস্তাহার, জনযুদ্ধ, পিপ্‌লস ওয়ার। ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতির তীব্র সমালোচনা পাতায় পাতায়। ফ্যাসিস্ট জাপানকে ঘরের দুয়ারে ডাকিয়া আনিতেছে নাকি তাহারা খাল কাটিয়া কুমীর আনার মত।

মনটা বিষণ্ণ হইয়া যায়। এই ফরোয়ার্ড ব্লকের ছেলে সুকল্যাণ, রথীন্দ্র মাস্টার। অনুপমও সমর্থন করিত উহাদের। কাহাদের নির্দেশ যে নির্ভুল, বুঝিয়া উঠে না। সুকল্যাণকে জানে সে শিশু বয়স হইতেই! আবার অরুণাভ—সেও তো জনগণের কল্যাণের জন্যই খাটিতেছে দিবারাত্রি। প্রসাদও যোগ দিয়াছে তাঁহাদের দলেই। সেই ছোট্ট প্রসাদের ভিতরেও দেখা দিয়াছে আজ ঐ একই মাতাল-করা কর্ম নেশা। রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তামাটে হইয়া গিয়াছে তাহার ফর্সা মুখখানা। রুক্ষ উদভ্রান্ত ছায়া দেখা দিয়াছে চোখের কাঠিন্যে।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত কালো শেড দেওয়া বাড়ির আলোতে বসিয়া সপ্তাহের কর্মসূচী লেখে অরুণাভ। পুরুষদেহের যৌবনশ্রী—প্রশান্ত বক্ষে অবিন্যস্ত খাটুনির প্রতিজ্ঞা সুস্থ উন্নত ললাট, প্রেমাচ্ছন্ন চোখ, এসবই পদ্মা দেখে। নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়—একটা মধুর হৃদয় স্পন্দনের উষ্ণতা অনুভব করে। অরুণাভও অনুভব করে পদ্মার মনের এ আত্মীয়তা—সস্নেহে নরম হাতটা ধরে সে নিজের কঠিন হাতের—নিবিড় চাপে। কিন্তু কথা বলিবার অবসর নাই তাহার। অগ্নি-পরীক্ষার দিন সম্মুখে। দ্রুত কলম ঘুরায় অরুণাভ—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে। সময় নাই—দ্রুত স্পন্দন অনুভূতির তীব্রতায় হারাইয়া গিয়াছে বুঝি জীবনের মধুমাস।

বহুদূরে কৃষ্ণসাগরের পারে মরণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নাৎসী জার্মানীর বর্বর অভিযানে শ্মশানে পরিণত হইতেছে কত সমৃদ্ধ সোনার গ্রাম—নিশ্চিহ্ন হইতেছে শহরের পর শহর। আগুন জ্বলিতেছে পাকা ফসলভারে নুইয়া পড়া শস্যক্ষেতে, গোলাবাড়িতে, খামারে পঞ্চায়েতের আঙ্গিনায়, গীর্জার চূড়ায়। স্ট্যালিনগ্রাদের দুয়ারে রণগর্জন শোনা যায়। বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ শেষ রক্তবিন্দু দিয়া প্রতিরোধের সংগ্রাম করিতেছে নূতন সম্ভাবনায় ভরা ফ্যাক্টরীগুলিতে, প্রাণসজীব শিক্ষাকেন্দ্র, নবজাত শিশু সদন। কিশোর গরিলা বাহিনীর গোপন অভিযানের নব নব বিচিত্র পথে স্রোতস্বিনী নদী তটে তটে বরফ ঝরা পাইন বনের আড়ালে আর শেওলায় ঢাকা উপলখণ্ডে।

সমস্ত পৃথিবী আজ ধরিত্রীর মহাশ্বাস শুনিতেছে। পাথর চাপা নিস্পন্দ মুহূর্ত। এ যুদ্ধের হারজিতের উপর নির্ভর করিতেছে সমস্ত পৃথিবীর ভাগ্য।

অরুণাভকে ঠাকুর মা আবার চিঠি লিখিয়া পাঠায় বৌকে লইয়া যেন কয়েকদিনের জন্যও বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখাইয়া লইয়া যায়।

অরুণাভ পদ্মাকে লইয়া রওয়ানা হয়। রেল ষ্টেসন হইতে পাঁচ-মাইল গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। গ্রীষ্মের কয়মাস খাল শুকাইয়া নৌকা চলে না।

ফসল বোনা ক্ষেতের ধার দিয়া মাটির সড়ক। গরুর ক্ষুরে ক্ষুরে ধূলা উড়ে। ধূলামাটির বুকে দাগ কাটিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে গরুর গাড়ি। ভিতরে ছইয়ের তলায় আধাশোয়া অরুণাভ রাস্তায় কেনা পত্রিকাটা উল্টায়। সম্মুখে ধূ-ধূ করে বৈশাখের রৌদ্র ফাটা ধূসর অনাবৃত ভূমি। জমি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে, এক পসলা বৃষ্টির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে বীজ-বোনা উর্বর জমিগুলি।

বহু দূরে দেখা যায় গ্রামের সীমানা, সুপারিগাছের সারি।

অরুণাভ লক্ষ্য করে, পদ্মার চোখ দুইটিতে এক ঐন্দ্রজালিক আবেশ নামিয়াছে।

অসমান মাটির রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। গরুর গলার ঘণ্টাগুলি এলোমেলো ছন্দে বাজিতেছে। আরও দুইটি গ্রামের পর অরুণাভের গ্রাম। সে উসখুস করে—মিঞাভাই এখনও সাতক্ষীরাই ছাড়াইলা না। এর থেইকা হাঁইটা গেলেই আগে যাইতাম।

মিঞাভাই অরুণাভের কথায় ক্ষুণ্ণ হয়—এমন তেজী বলদ সদরেও নি দেখছেন।

—বলদ তো তেজী, কিন্তু পিঠের শিরদাঁড়া যে বেইকা গেল।

গাড়োয়ান উত্তর দেয় না। তাহার পাশে বসা বছর দশেকের ছেলেটি বাজানকে এক ছিলেম তামাক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। সে আসিয়া বসে বাজানের জায়গায়।

ছোট্ট গাড়োয়ানটি মুখ দিয়া বাপের মুখে শোনা শব্দ নকল করিয়া বলদগুলিকে ঠিক পথেই চালায়।

সূর্যের তেজ কমিয়া আসে। এই অঞ্চলে বীজ বোনা শেষ হয় নাই এখনও। মাথাল মাথায় দিয়া ক্ষেতে বীজ ছড়াইতে ছড়াইতে ভাগচাষীরা একটু বিস্মিত চোখে গরুর গাড়ীর আরোহীদের তাকাইয়া দেখে। আরও বিস্মিত হইয়া দেখে ঘোমটানা নীলশাড়ী পরা নূতন-বৌকে।

গাড়োয়ানের ছেলেটী গান ধরিয়াছে। ধূসর কর্ষিত ভূমির বুকে কচি-কণ্ঠের সে বেসুরা বাউল সুরের ঢেউ বহিয়া যায় বহুদূরে। অদূরে একটা জলার কিনারায় হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মাছ ধরিতেছে দুইটী উলঙ্গ ছেলে। তাহারাও অবাক বিস্ফারিত চোখে দেখে গরুর গাড়ির যাত্রীদের।

পদ্মা আজ বহুদিন পর যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছে নিজের ভিতরে। অরুণাভ লক্ষ্য করে। এ মৌন বিস্তৃত ভূমি মনকে এক উদাস করা অনুভূতির জগতে টানিয়া লইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য। গরুর গাড়ি চলিয়াছে তাহার নিজস্ব বাড়িতে। ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপি ধান-বোনা ক্ষেতের শেষ প্রান্ত আসিয়া মিশিযাছে গৃহস্থ পল্লীর সীমানায়।

আর একটা গ্রাম ছাড়ালেই ধনেখালি গ্রামের সীমা… আরম্ভ।

শিমুল-পলাশ, আম-জাম-কাঁঠাল-তেতুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরিয়া চলিয়াছে গরুর গাড়ী। গাড়িটার পাশ কাটাইয়া একটি ছেলে চলিয়াছে সাইকেলে—সুন্দর একহারা চেহারা। উল্টা বাতাসে চুলগুলি উড়িতেছে কপালের উপরে।

পদ্মা ছইয়ের ভিতর হইতে ছেলেটিকে একটু দেখে—অপরিচিত ছেলেটির সঙ্গে চোখে চোখ মিলিয়া যায়। হঠাৎ খুশি হইয়া সাইকেল থামায় ছেলেটি।

—আরে, অরুণ দা।

অরুণাভ উঠিয়া বলে—সুপ্রিয়! তুই বাড়ি এলি কবে? খুশিতে উচ্ছসিত হইয়া উঠে। গাড়োয়ান এই অবসরে আর এক ছিলিম তামাক খাওয়ার যোগাড় করে।

সুপ্রিয় পদ্মাকে আবার একটু দেখে—চোখভরা প্রসন্ন দৃষ্টি। বৌ না কমরেড ?

পদ্মা মৃদু হাস্যে মাথার ঘোমটাটা তুলিয়া দেয়। অরুণাভ হাসিয়া বলে—আসবি নাকি ভেতরে। তোর সাইকেলটা দে—আমি তিনমিনেটে চলে যাই। যা পিঠ কন কন করছে, সেই দুপুর থেকে এক কাতে বসা।

সুপ্রিয় দুষ্টামীর সুরে উত্তর দেয়—উঁ হু, তা ত নিয়ম নেই। বৌ নিয়ে চলেছো যখন, তখন দস্তুর মত বৌকে আঁচলে বেঁধে ঢুকতে হবে ঘরে। আমিই বরং খবরটা দিয়ে ঠাকুরমার কাছে বখসিস্‌টা আদায় করে ফেলি।

সুপ্রিয় পদ্মাকে সপ্রশংস হাসিভরা চোখে বলে—চলি।

সাইকেলটা চোখের নিমেষে দূরে গাছের আড়ালে মিলাইয়া যায়।

অরুণাভ পরিচয় দেয়—আমাদের জ্ঞাতি ভাই—তাছাড়া আমাদের দলেরই একজন।

হিজল গাছ তলায় আসিয়া গরুর গাড়ি থামে। অরুণাভের ঠাকুরমা নাতবৌকে জড়াইয়া ধরে। নাতিকে মৃদু অনুযোগ জানায়। —সংবাদ দিয়া আইলে পাল্কী পাঠাইয়া দিতাম স্টেশনে। কত কষ্ট হইছে মাইয়ার আমার।

ঠাকুরমার নাতবৌকে দেখিতে মেয়ে বৌতে তিন-আনির উঠান ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার পর আবার দেখা হয় সুপ্রিয়র সঙ্গে। হাসি ঝরা চোখে দ্বিতীয় বার সম্বর্ধনা করে পদ্মাকে। বুড়াকর্ত্রীকে ঠাট্টার সুরে বলে—ঠাকুরমা, তোমার বাড়িতে তো চায়ের কারবার নাই। আজকালকার বৌদের ছাড়া কি এক বেলা চলে। আমার ঘর থেকেই চায়ের পাটটা আনি কি বল। পদ্মার দিকে মিষ্টি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে—ছোটকর্তা কই ? কাছারী ঘরে নাকি ?

ঠাকুরমা জবাব দেয়—ছোট কর্তার আর কাছারি ঘরে যাইয়া কাম নাই। আর একবার ও বাড়ি আইলে আমি কইলাম, লেখাপড়া শিখ ছস এইবার পূর্ব পুরুষের বিত্তটুকু বুইঝা নে। ছোড়া করলো কি, সব প্রজাগো লইয়া মিটিং কইরা খাজনা দিতে বারণ কইরা গেল। তোরা না হয়

বিদ্বান মানুষ, চিন্তা নাই। কিন্তু বুড়ি-টুড়িগুলির কি উপায় হইব।

স্থপ্রিয় ঠাট্টা করে—কি আর হইব। তাড়াতাড়ি এই সমস্ত তল্পি-তল্পা গুটাইয়া যাত্রা করলে বুড়া কর্তারে তবু ধরণের আশা থাকবো। তা না হইলে আর কদ্দিন সে স্বর্গের অপ্সরী-টপ্সরীগো ফেলাইয়া তোমার জন্য পথ চাইয়া রইবো ?

ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলে—তোগো কালের মত কিনা।

স্থপ্রিয় ঠাকুরমার গা ঘেসিয়া বসিয়া আস্তে জিজ্ঞাসা করে—কি রকম ছিল ঠাকুরমা। তোমার এই গায়ের রং দেইখাই ভুইলা গেছিল তাই না ? আরও একটু স্বর নামাইয়া বলে—খুব ভালবাসতো না ?

ঠাকুরমার লোল চামড়ার আড়ালে সলজ্জ আভা খেলিয়া যায় পুরানো স্মৃতির অবগুণ্ঠন ঠেলিয়া।

স্থপ্রিয় পদ্মার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলে—দেখছ ঠাকুরমা কেমন ব্লাশ করছে। বৃদ্ধা সস্নেহে ধমক দেয়—যা ফাজিল ছোড়া।

স্থপ্রিয় ঠাকুরমার হাতের সঙ্গে নিজের হাতখানি মিলাইয়া বলে—না হয় এক পোঁচ কালাই আছি বুড়াকর্ত্তা চাইতে তাই বলিয়া এতই ফেলনা।

অরুণাভ আসে। স্থপ্রিয় বলে—কি পাঁচআনি। বাংলো থেকে বুঝি চায়ের কাজটি সেরে আসা হল। আর এ শ্রীমতীটিও যে আধুনিকা সে খেয়াল আছে।

—কেন দেবর লক্ষ্মণ থাকতে আর ভাবনা কি ?

—রাম ছাড়া যে সীতা গণ্ডীই ছাড়তে চায় না।

অরুণাভ আর ঘরে থাকে না।

—তবে চল আর একবার চা পেলে মন্দ হয় না।

চারআনির সংলগ্ন বাড়ীটাই দুইআনি দশগণ্ডার। বাড়ির গৃহিনী নিঃসন্তান। স্থপ্রিয়কে সেই পালন করিয়াছিল। অরুণাভের পিতাই স্থপ্রিয়কে নিঃসন্তান ভ্রাতৃবধূর হাতে আনিয়া দিয়াছিলেন পশ্চিম হইতে। স্থপ্রিয়কে জন্ম দিতেই তাহার মায়ের মৃত্যু ঘটিয়াছিল সেই বিদেশে। স্থপ্রিয় তখন খুবই শিশু। তাহার পর হইতেই সে এবাড়ীতে।

অরুণাভ একবার কলেজের ছুটিতে বাড়ি আসিয়া দুরন্ত অশান্ত সুপ্রিয়কে আবিষ্কার করিল। লেখাপড়ায় মন নেই, গালাগালিতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন খুশিতে ঘুরিয়া বেড়ায় রৌদ্র দগ্ধ মধ্যাহ্ন তপ্ত বালু পথে, কখনও জাম-লীচুর ডালে, কখনও ডিমে ভারী হাঁসের পিছনে।

অরুণাভের জ্ঞাতি জ্যেঠিমা আফশোস করে—কি ছেলেই জুটিয়ে দিয়েছেন দেওর আমার।

কিন্তু যাহাকে লইয়া মন্তব্য, ভর্ৎসনা, তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই কিছুতেই।

সেই দুরন্ত ছেলেও চার বাড়ীর সকলের চোখে বিস্ময় আনিয়া অরুণাভের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল।

সকলের চোখে চোখে ক্ষণিক আশ্চর্য চাহনি নামিয়া আসে—যেদিন প্রথম খোলা বই হাতে বাঁধানো ঘাটলার সিঁড়িতে সুপ্রিয়কে দেখিতে পাইল।

সুপ্রিয় যেবার বি এ পাশ করিল তাহার পালিতা মাতা হঠাৎ মারা যায়। কোন রকম আইনগত অধিকার না থাকায় দুইআনি দশগণ্ডার সম্পত্তি ছয় গণ্ডার হাতে চলিয়া যায়। সবাই তাহাদের ছি ছি করিতে থাকে। এ লইয়া পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন সবাই মাথা ঘামাইলেও মাথা ঘামায় না শুধু সুপ্রিয়।

সে চিরকাল যে ঘরখানিতে বাস করিত, আজও ঐ নিরালা অগোছাল ঘরখানি তাহার একমাত্র আরামের আস্তানা। শোনা যায় ঐ বাংলোখানি নাকি অরুণাভের পিতার অর্থেই নির্মিত হইয়াছিল।

দশ-গণ্ডার অন্দরের দুয়ারে ভারী তালার গায়ে পুরু মরিচা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উহা চোখেও পড়ে নি তাহার।

অরুণাভ সুপ্রিয়র-ঘরে গিয়া তক্তপোষের উপর সর্বক্ষণের জন্য বিছান একটা চাদরবিহীন তোষকের উপর শুইয়া পড়ে। সুপ্রিয় চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিতে করিতে বলে, আমি কিন্তু নাম ধরেই ডাকবো পদ্মাবতীকে।

সুপ্রিয় আজ হাট হইতে মুরগি কিনিয়া আনিয়াছে। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে—কি দিয়ে যাব নাকি এক প্লেট।

ঠাকুরমা—তাড়া দেয়—যা যা পোড়ারমুখ, আমাকে ছুঁইস না। যতসব অখাদ্যকুখাদ্য না হইলে আর রোচে না। সুপ্রিয় পদ্মার কাছে গল্প করে—জান, ছেলেবেলায় দেখেছি, এই বাড়ীর ঘটনায় একবার একটা মুরগির ঠ্যাং এনে ফেলেছিল বিড়ালে তাতে পাঁচ বাড়ীর রান্নাঘরের হাঁড়ি কড়াই সব মাজা হয়েছিল। আর আজ সেই বাড়িতে মুরগীর বাদশাহী পসন্দ রান্না হচ্ছে পদ্মা-বৌয়ের হাতে। 'কালের গতি' একেই বলে।

পদ্মা সস্‌প্যানের ঢাকনা তুলিয়া মাংসটা নাড়িয়া দেয়। এক ঝলক সুস্বাদু গন্ধ বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে সারা ঘরে। অরুণাভ উঠিয়া বসে—নাঃ এমন সুস্বাদু গন্ধ ছড়ালে আর শুয়ে থাকা চলে না।

সুপ্রিয় প্লেট হাতে মেঝেতে বসিয়া পড়ে।

কয়দিন ভরিয়াই এ বাড়ী ও বাড়ী হইতে রায়তজনের বৌঝিরা খামার বাড়ীর ছোট হিস্যার বৌ দেখিতে আসে, নিস্তারিণী বাটায় করিয়া পান বাহির করিয়া দেয়। নমবৌ পান মুখে দিয়া বলে—আউজকা শুধ্য পান দিয়াই বিদায় দিলেন। কিন্তু তারপর নাতির ঘরে পুতি যখন আসব সেদিন আর শুধ্য পান দিলে চলব না।

পদ্মা একটু আরক্তিম হইয়া উঠে।

বৃদ্ধা ছুতার বৌ অনুরোধ জানায়—ছোটকর্ত্তা এইবার বাড়ীতে আইস্যা বসেন। আমরা আপনাগো ভিটা কামড়াইয়া পইরা আছি, আপনারা বিদেশে থাকলে কি ভাল লাগে।

পদ্মা লক্ষ্য করে, বাড়ীর লোকজন কামলা, গোমস্তা সকলেরই চোখে চোখে ঐ একই অনুরোধ তাহারা বাড়ীতে থাকুক। তাহাদের এ অন্তরের অনুরোধ পদ্মাকে স্পর্শ করে।

ঘরের বুড়ো দাই খুশির সুরে বলে—উঠানের কাপড় রোদে দেওয়ার তারটাও কেমন মানাইছে। বিশ পঁচিশ বছর পর শাড়ি ঝুললো এই বাড়ীর তারে।

কামলারা সবাই কাজ করিতে করিতে সপ্রশংস দৃষ্টিতে নূতন বৌয়ের হাঁটাচলা দেখে। সকলেরই মনে একই প্রশ্ন—'ওনরা থাকবেনত। না আবার চইল্যা যাইবেন বিদেশে।

শীতলা দেবীর কুলা লইয়া আসিয়াছে—নিস্তারিনী উঠানে একটু জল ঢালিয়া দেয় কুলা নামাইতে। কুলা মাথায় বৌরা মাগনের গান করে 'মাগন দাওগো পুরবাসী।' পদ্মা দেখে আর রূপসীর কথা ভাবে। সেই শৈশবের গ্রামখানিতে আর হয়ত কোনদিন যাওয়া হইবে না।

চোখের তারায় কি একটা ব্যথা ছলছল করিয়া উঠে।

অরুণাভ সাতদিন থাকিয়াই চলিয়া যায়। হাজার অনুরোধেও তাহাকে রাখা যায় না।

—তাহলে আমার নাতবৌই থাকুক, ঠাকুরমা অভিমানের সুরে অনুরোধ জানায়।

—পদ্মা যদি থাকতে চায় থাকুক সে। তাকেই জিজ্ঞেস কর।

পদ্মা বৃদ্ধার এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে না। এই বৃদ্ধা দিদি শাশুড়ীর জন্য একটা অসহায় দুঃখে মন ভিজিয়া উঠে। চোখের নিষ্প্রভ তারা দুটি কী করুণ। আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কেহই নাই পৃথিবীতে। পদ্মা ভাবে, সব মানুষের জীবনের শেষ বেলায় কি এমনি একাকীত্বের অভিশাপ নামিয়া আসে। এই বৃদ্ধা দিদি শাশুড়ী জপের মালা লইয়া এমন একাগ্রতার সঙ্গে কি মৃত্যুকেই কামনা করিতেছে। মৃত্যুর জন্যও এমন প্রতীক্ষাকুলতা আসে মানুষের জীবনে!

আর কিছুই চাই নি—শুধু এই ভিটেটুকুতে তোর শ্বশুরকে রাইখা মানে মানে যাইতে পারি তবেই হয়। ভারী হইয়া আসে স্বর। তাহার—পুত্রবধু তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন পুত্রও যদি চলিয়া যায় আগে—সে লজ্জা সে দুঃখ যেন মাটিতেও রাখার স্থান পাইবে না। তাই মৃত্যুর জন্য কি আকুল আবেদন ভগবানের কাছে। দিনের বেলায় তবু লোকজন আসে যায়। উঠানে লোক চলাচলের ছায়া পড়ে। কিন্তু রাত্রিতে বড় করুণ বড় অসহায় মনে হয় এ নিঃসঙ্গ মানুষটিকে। যেন একটা অভিশপ্ত পুরীর দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া

উঠে পুরু ইটের স্যাঁতসেতে গাঁথনিগুলি। গা-ছমছম করা অশরীরী জীবলোকের মতো সে নিস্তব্ধতা। একটা সাবেক অট্টালিকাকে ঐ ক্ষীণ দেহ বৃদ্ধা যেন আগলাইয়া বসিয়া আছে।

সকালবেলা নিস্তারিণী আসিয়া চাবীর গোছা দিয়া যায় পদ্মার হাতে। —এখন বৌ-ঠারান আইছে—এইবার আমার ছুটি। মাচির থেইকা মাইধানীর চিরামুড়ি বাইর কইবা দিন।

পদ্মা ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলিয়া ছোট কাঠের সিঁড়ি দিয়া মাচাতে উঠে। মাচার উপর সাজান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির জালা। এক কোণায় স্তূপীকৃত পূজার বাসন—কোশাকুশি, টাট, পুষ্পপাত্র! আরেক কোনায় মস্ত মস্ত পরাত, গামলা, ডেগ কড়াই। মুহূর্ত্তের জন্য পদ্মার মন অতীতে চলিয়া যায় পূজাপার্বণ ক্রিয়াকর্ম মুখরিত তিন আনির গৃহ প্রাঙ্গণে।

পদ্মা অবাক হইয়া লক্ষ্য করে, এ বাড়ীর রায়তজন আজও ভুলিতে পারে নাই মনিব বাড়ীর সেই অতীতের জাঁক জমক। যেন তাহাদেরই জীবনের একটা অধ্যায় অপসারিত হইয়া গিয়াছে কালের স্রোতে।

নিস্তারিণী গল্প করে আমাগো অরুনের অন্নপ্রাশনের সময় রাত ভইরা পাঠা বলি হইছিল। অভাবত ছিল না কোন কালেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বুড়ী দাই বলে—তোমরা বাড়ীতে আইসা বসলে তোমাগো ছেলেপুলে কোলে কাঁকে লইয়া ঘুরুম, সে আমাগো কত আনন্দ।

পদ্মার মন চায় গ্রামে থাকিতে। গ্রামের আত্মার সঙ্গে তাহার প্রাণের যে নিবিড় সুর বাঁধা তাহা যেন বারে বারে ছিঁড়িয়া যাইতে চায় শহরের কোলাহলে। পদ্মা ও অরুণাভর মনের গঠনে পার্থক্য এইখানে।

পদ্মা এ শান্ত প্রকৃতির মাঝে এক নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে। উঠানের বুকে রৌদ্র নামে, আবার ধীরে ধীরে সে রৌদ্র মিলাইয়া যায় সন্ধ্যার ছায়ায়। রৌদ্র ছায়ায় ঢাকা উঠানটুকুর সঙ্গে কি মধুর মমতার সম্পর্ক তাহার প্রাণের, সে খোঁজ জানেশুধু।

সে নিজে। তাই সেও আজ উপলব্ধি করিতেছে তাহার বৃদ্ধা দিদি শ্বাশুড়ীর বুকের আড়ালের ব্যথার স্থানের।

বাড়ীর পিছনের আনারস ক্ষেতটার পাশ দিয়া সরু একটা মাটির পথ গোয়ালবাড়ী পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই জায়গাটুকু বড় প্রিয় পদ্মার। তাহাদের দ্বারা ছায়ায় শীতল হইয়া থাকে পথটুকু। পথের উপরে কয়েকটা আমগাছের গুঁড়ি পড়িয়া আছে। কিছু দূরে গোলাবাড়ীতে কামলারা সব ধান মাপে, ধান তোলে, তামাক খায় গরুর জন্য বিচালি কাটে। বড় একটা চালা আড়ালে থাকায় পদ্মাকে দেখিতে পায় না তাহারা।

আমের গুঁড়িটার উপর বসিয়া একটা কুর্শির লেস বোনে পদ্মা।

সুপ্রিয় সাইকেলে ঘরে ফিরিতেছে। দূর হইতে লক্ষ্য করে সে পদ্মাকে। সাইকেলটা গোয়ালবাড়ীর সরু পথ দিয়া ঘুরিয়া আসে। —কি? কবিত্ব জাগছে মনে।

পদ্মা স্নেহ মাখা চোখে তাকায় সুপ্রিয়র অস্নাত রুক্ষ মূর্তির দিকে। —এত দেরিতে ফিরলে—তারপর স্নান খাওয়া হবে কখন?

সুপ্রিয় সাইকেলটা গোয়াল ঘরে ঠেকাইয়া রাখিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া আরেকটা গুঁড়ির উপর বসে। —আমারত তবু সময় মত না হোক অসময়ে হলেও স্নানাহার মিলবে। আর কিছু বলে না কিন্তু আর কিছু রূঢ় সত্যস্পর্শ থাকে তাহার কথা বলার অস্পষ্ট বিদ্রূপে।

পদ্মা তাড়া দেয়—বসলে যে? এত বেলায় নাইলে অসুখ করবে না?

সিগারেটটা পোড়াইতে পোড়াইতে বলে সে—ভেবেছিলাম একটা গান শুনবো।

—গান শোনার এই উপযুক্ত সময় আর জায়গা কিনা।

—আর লেশ বোনার কি উপযুক্ত সময় কিনা এটা। ধানের দাম কত উঠেছে জান?

আতঙ্কে ত্রাস ধরে গেছে লোকের মনে।

পদ্মা লজ্জিত হয়। সুপ্রিয় উঠিয়া পড়ে। সাইকেলটা ঠেলিয়া লইয়া হাঁটিয়াই চলে। পদ্মা লক্ষ্য করে, সুপ্রিয়র মধ্যে কি একটা গুণ

আছে মনে কোনও গম্ভীর বিষণ্ণভাব টিকিতে পারে না তাহার সামনে।

পদ্মা কয়দিন যাবৎ অরুণাভের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া আছে! অরুণাভের এক ছত্র লেখার জন্য মন উদগ্রীব হইয়া থাকে। সুপ্রিয় কয়দিন বাড়ি ছিল না। কৃষক-প্রধান চরগুলিতেই তাহাকে কাজ করিতে হয় বেশির ভাগ সময়।

পদ্মা দুপুরবেলা সুপ্রিয়র ঘরে যায়। পদ্মাদের বাড়ির অন্দরের বেড়ার গা ঘেঁষিয়া একটা ছোট আনারস ক্ষেত। এক কোণে গৃহ-দেবতার ছোট একটি মন্দির—মন্দিরের গা ঘেঁষা একটা চাঁপাগাছ—তার পরই সুপ্রিয়র ঘর।

সুপ্রিয় সবে বিছানার উপর গা এলাইয়াছে, পদ্মা ঘরে ঢোকে।

—কি খবর? দুপুরেই পাড়া বেড়াতে বের হয়েছো? ঘরের বৌ না।

—ঘরের বৌকে যদি পরের ছেলে পাগল করে তোলে, তার না বেরিয়ে উপায় কি!

সুপ্রিয় হাসে, কি লিখেছে অরুণদা। চটে গিয়েছে—যাচ্ছ না বলে।

—তা হলেত খুশিই হতাম, এদ্দিনের ভিতর একটু কি খোঁজও নেওয়া চলে না—এ মানুষটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

—তা ত বুঝলাম—সে জন্য এ ভাগ্যবানের স্মরণ নেওয়া কেন।

—ভাগ্যবানকে একবার চট করে সাইকেলে ডাকঘর ঘুরে আসতে হবে।

সুপ্রিয় আরও একটু আরাম করিয়া শুইয়া পড়ে।—অত উতলা হওয়ার কি আছে। চিঠি আজ না পেলে কাল পাবে, আর কোনদিন না পেলেই বা কি আসে যায়। বসো বরং, এলেই যখন কষ্ট করে।

পদ্মা সুপ্রিয়র লক্ষণ দেখিয়া হতাশ হয়। খাটের একপাশে বসিয়া বলে—প্রেমের স্বাদ কিংবা বিস্বাদ কি একেবারেই মেলে নি জীবনে।

—মিলবে না কেন। তবে সে স্বাদ শুধু তেষ্টা বাড়াতেই পারলো তেষ্টা মেটাতে পারলো না—সমুদ্রের জলের মত।

পদ্মার চোখে দুষ্টুমীভরা হাসি ছলকাইয়া উঠে—তাই নাকি? কার ঘরে সে নির্ঝরিণী অপেক্ষা করছেন।

সুপ্রিয় রসচ্ছলে একটু খেলার সুরে উত্তর দেয়—খুব বেশী দূরে নয়। ঐ তিন-আনির ছোটকর্তার ঘরেই। সেই স্রোতস্বিনী আজ উঠে এসেছেন ফেনিল স্বচ্ছপাত্রে। কিন্তু এত কাছে থেকেও আমার কাছে সে শুধু ফেনিল সমুদ্রেরই সামিল।

পদ্মা হাসিয়া ফেলে, আমাকে বিপদেই ফেলবে দেখছি। অত স্পষ্ট করে কি বলতে হয় এসব অস্পষ্ট কথা। আমাকে ঘর থেকে তাড়াতে চাও নাকি!

—কে তাড়াবে ঘর থেকে? ঘরের মালিক। অতই বোকা মেয়ে কিনা আমাদের পদ্মাবতী।

সুপ্রিয় উঠিয়া বসে, কষ্ট করে এলেই যখন—এক কাপ চা খাইয়ে যাও।

পদ্মা খুঁজিয়া পাতিয়া চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করে। কতগুলি পাটশলা আনিয়া চায়ের জল বসায় বারান্দার একটা তোলা উনানে। সুপ্রিয় পাশে বসে অরুণাভের ছোটবেলার জীবনের গল্প শোনায় পদ্মাকে।

আরও এক সপ্তাহ চলিয়া যায়—অরুণাভের চিঠি আসে না—চিন্তার ছায়া আসে পদ্মার চোখে। দিদি-শাশুড়ীরও নজর এড়ায় না—কি লো অরুণের চিঠি পত্র যে আর আসে না।

পদ্মা যেন মরমে মরিয়া যায়। তবু স্বর শান্ত রাখিয়া উত্তর দেয়—কাজে ব্যস্ত আছেন তাই সময় পান না।

দিদি-শাশুড়ীর মনে সায় দেয় না এ উত্তর। হাজার কাজ থাকিলেও বৌকে একখানা চিঠি লেখারও সময় পায় না। কেমন একটা আশঙ্কার অস্পষ্ট ছায়াপাত করে মনে—হয়তো সে বৌকে রাখিয়া দেওয়ায় রাগ করিয়াছে।

পদ্মাকে আবার ডাকে—তাকে আসতে লিখে দেই।

—আসতে তো পারবেন না—লিখে লাভ কি। বৃদ্ধা পদ্মার মুখের দিকে একটু অবাক হইয়া তাকায়। কথা বলিতে বলিতেই সুপ্রিয় আসিয়া দাঁড়ায়—হাতে একখানা এনভেলাপ।—এই মাত্র পোষ্টাফিস থেকে এলাম এই নাও তোমার চিঠি।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে পদ্মার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার?

—ছোড়দা গ্রেপ্তার হয়েছে রাজদ্রোহিতার অপরাধে।

পরের দিন ভোরের ডাক আসিতেই পত্রিকাটা তন্ন তন্ন করিয়া পড়ে- সারা দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পদ্মার চোখের সামনে যেন সেই আগুনের শিখাগুলি লেলিহান হইয়া উঠে। শতাব্দীর পুঞ্জিভূত বেদনা বিক্ষুব্ধ নিপীড়িত দেশবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

পদ্মা দিদি-শাশুড়ীকে জানায়, সুপ্রিয়র সঙ্গে কলিকাতা রওয়ানা হইতে চায় সে।

দিদি শাশুড়ী ভাবে—অরুণের জন্য মন কেমন করিতেছে। ছোঁড়াও এমন বেয়াদপ—এতদিনের মধ্যে একখানা চিঠিও লেখে নাই বৌকে। বধূ জীবনের একটা স্মৃতির দমকা হাওয়া বহিয়া যায় মনের প্রান্তরে।

সরকার মশাইকে ডাকিয়া পদ্মাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলে। —পাল্কীর বেহারাদের একটা খবর পাঠান।

সরকার মশাই মৃদু আপত্তি জানান—সেখানে তো এখন গোলমাল চলছে।

দিদি শাশুড়ী মেয়েমানুষের মন দিয়া পদ্মার মনের অবস্থাটা বোঝে। সরকার মশাইকে বলে—ছেলে যেমন গোলমালের মুখে পইড়া আছে, তখন ওর আর সে গোলমালকে ভয় করলে চলবে কেন?

মদন সেই যে পুলিশের ভয়ে উধাও হইয়াছিল, আর তাহার খোঁজ নাই। ছয় বছর কাটিয়া যায়, কেহ বলে, সে নাকি জাহাজের খালাসী হইয়া রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছে। কেহ বলে, কলিকাতায় বাস চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। সৌদামিনী যমুনার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু যমুনার ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বামী নিখোঁজ, সংসারের অভাব

অমটন, কিছুতেই বিষণ্ণ করিতে পারে না তাহাকে। দারিদ্রের কঠিন প্রলেপেও দেহের জ্যোতি অপাঙ্গের বিদ্যুৎ মিলাইয়া যায় না।

ঠাকুরমার পয়সার পুঁটুলি খুলিয়া চুপি চুপি চার পয়সা দামের একখানা লাল সাবান আনাইয়া লয় বলাইকে দিয়া। ঘাটে বসিয়া চোখে মুখে হাতে গায়ে সাবান মাখে। সাবানের ফেনায় পরিপূর্ণ অঙ্গে অঙ্গে পুলক জাগায়। গুনগুন করিয়া সুর টানে—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

সৌদামিনী টিকার গুঁড়ি গুলিয়া বসিয়াছে। উঠানের আরেক প্রান্তে মাটির গর্ত করা উনানে ভাত সিদ্ধ হইতেছে—ভাতের জল শুকাইয়া আসে তবু যমুনার ঘাট হইতে ফেরার নাম নাই।

—ভাত পোড়া লাগে—তবু পোড়ারমুখীর নাওয়া শেষ হয় না। বুড়ি বিড় বিড় করে। যমুনা ফেরে এতক্ষনে। ভিজা কাপড়। সাবানের গন্ধে মৌ মৌ করে।

—আবার সাবান কিনছস? পয়সা পাইলি কই?

—যেখান থেইকা খুশি পাইছি—অত নিকাশ দিতে পারি না।

সৌদামিনী আগুন হইয়া উঠে, রস আইছে শরীরে। লজ্জা নাই মাথারীর। তোর সোয়ামীর কামাইয়ের পয়সা নাকি—যে নিকাশ দিতে পারবি না।

—অমন সোয়ামীর হাতে দিছিলি ক্যান। তখন মনে ছিল না।

যমুনা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। মালো, তুই আমারে ফ্যালইয়া কই গিয়া রইছস লো।

সৌদামিনীর মনটা নরম হইয়া আসে। মা-মরা মাইয়াটা! ওর কপালে কি সুখ আছে? ঘরে ঢুকিয়া ডাকে—যমুনা, উঠ—খাবি চল।

না ভাত খামু না আর। সোয়ামীর কামাইয়ের ভাত যখন না, তখন ছাই খাইয়া থাকুম তোর ভাত আর খামু না।

—আমার মাথা খা যমুনা। চল। তুই কি বোঝস না। গন্ধ সাবান কেনার সময় পড়েছে কি এখন? ধানের দাম কত গেল গেছে হাটে খোঁজ রাখস? পরান কাঁইপ্পা উঠছে মানুষের।

এতক্ষণে একটু হুঁশ হয় যমুনার। পেটেও ক্ষুধা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আবার দিন দুই পরই চুপি চুপি ছয় পয়সা নারকেল তেল কিনিয়া আনে অশথতলা হইতে। আবার এক পশলা হইয়া যায় ঠাকুরমার সঙ্গে।

সৌদামিনীর আসল রাগ তার ছেলের উপর। যমুনাও তো ওরই সন্তান। ভাল-মন্দ এটা সেটা ছেলেপুলে খায়, এক বার এই মাইয়াটাকে একটু ডাকিয়াও লয় না। আর সে'ও তো তারই গর্ভ-ধারিণী মা। কিন্তু এখন যথাসর্বস্ব গিলিয়া বসিয়াছে ঐ ছোট বৌটা।—ঐ বৌয়ের কপালে সুখ হইবে না। ওর পেটের সন্তান ওরে এমন কইরাই জ্বালাইব। শাপ দিলাম এই ভর সন্ধ্যায়। ক্ষিষে জ্বর জ্বর হইব শরীর তোর।

ছোট বৌ জ্বলিয়া উঠে—শুনলা তো কি কইল? তুমুল লাগিয়া যায়। যমুনার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে তখন ঘরের ভিতরে আরশী লইয়া চুল বাঁধা শেষ করিয়াছে। এক মুখ পান খাইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ছোট বৌয়ের গলা রাস্তা হইতেও শোনা যায়—নাতনী কি শুধু বড় বৌয়ের মাইয়াই। তাহার হারানী ওর নাতনী না? বলাই ওর নাতি না? এই বাড়ী, ঐ বাড়ী থেইকা কত কিছু যে আনে—অগো হাতে তুলেও একখানা ভালমন্দ কিছু দেয়।

সৌদামিনী এবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।—হ কত কিছুই মণ্ডা মিঠাই খাই আমরা ঘরে খিল্ দিয়া। আজ দুইদিন ধইরা যে এক সন্ধ্যা খাইয়া আছি—খোঁজ রাখে তাই পেটের পোলা।

—পেটের পোলা খোঁজ রাখবো ক্যান। ছোটবৌ ঘরে বসিয়া উত্তর ছুঁড়িয়া দেয়, নাতনীর পীরিতের জনের কাছ থেইকা চাউল মাইগা আনতে পার না। সাবান কিনতে পার, ফুল তেল মৌ মৌ করে চুলে। আর চাউল কিনতে পার না! চাউলের বেলায় বুঝি পেটের পোলার নাম মনে পড়ে।

সৌদামিনী ডাক ছাড়িয়া যমুনার চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার করে।—মরেও না ঐ হারামজাদী।

যমুনা ঘোর সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে।—হইছে কি? এত চেঁচাইতেছিস ক্যান?

—চেঁচাই ক্যান? বুঝবি লো—বুঝবি। তুইও বুড়া হবি। বাড়ী আসনের, নাম নাই—ওদিকে কলসী যে ঠন ঠন করে, খেয়াল আছে। আমার এই বুড়া হাড়ে আর কত মেহানত সয়।

যমুনা কি জানে না তাহা। কিন্তু বেলাবেলি জল আনিতে গেলে মালির ছেলেকে মিলিবে কি টিপ-কলের তলায়। সময়ের হিসাব তাহারও আছে।

যমুনা কলসী লইয়া বাহির হইয়া যায় গর্বিত হাঁটার ছন্দে। কে বলিবে, এক বেলা ভাত খাইয়া থাকিতেছে সে। আরেক বেলা বাবুর বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা পানের রস দিয়া উর্বর রাখিতেছে শিরা-উপশিরাগুলি। সুন্দর সন্ধ্যা। যমুনা তাকাইয়া দেখে সূর্যের হাতে গড়া ফুলের বাগিচা। উন্নতবৃন্ত রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী আর অজস্র দোপাটি ফুলের রঙের বন্যা। সূর্যই তো লাগাইয়াছে ঐ সূর্যমুখীর চারাগুলি। যমুনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে।

খেলার মাঠটা খালি হইয়া গিয়াছে। শূন্য মাঠের বুকে কত অফুরন্ত কামনার মৃদু ক্রন্দন।

সূর্যের বাগানে জল দেওয়া শেষ হইয়া যায়। আরেক বার জল লইতে আসে কলে।—কিলো এত দেরি যে জল নিতে।

প্রেয়সী সাম্রাজ্ঞীর সুখ স্বপ্ন মধুর দৃষ্টি ধরা দেয়, যেন দুই জোড়া আদিম চোখে। স্কুল ঘরের পিছনে টিউব ওয়েলের পাশে আসিয়া দাঁড়ায় দুইটি নর-নারী। মাথায় উপরে গোধূলি আকাশে ধ্রুবতারা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অধূরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছে খালের জলে। স্তব্ধতা ভাঙিয়া কথা কয় সূর্য, যমুনা তোরে আমি বিয়া করুম। মদন কি আর ব্যাঁইচা আছে। ঠিক করছি কোর্টে গিয়া বিয়া করুম তোরে।

কাঁপুনি খেলিয়া যায় যমুনার বুকের ভেতরে। কি স্পষ্ট কথা! শত সহস্র ইঙ্গিত আর ইশারার অবসান হইয়া যায় ছোট কথায়।—সূর্য বিয়া করিবে তাহাকে। পথ আছে, উপায় আছে। কোর্টের বিবাহ। তাহার দুঃখের জীবনের শেষ হইল বুঝি এতদিনে।

বেদনা আর আনন্দের কি মধুর মিশ্রণ! আগুণ ধরিয়া যায় বুঝি যমুনার কুমারী রক্তের অনুপরমাণুতে। কালঠোঁটের প্রথম চুমায়। এত আনন্দ, এত আরামও আছে এই পৃথিবীতে। একটা তীব্র মধুর ভাল-লাগার স্রোত বহিতেছে তাহার সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে।

যমুনা জলভরা কলসী কাঁখে তুলিয়া লয়।

পরের দিন মধ্যাহ্নে আবার আসে যমুনা কলতলায় যেন কি এক চুম্বকের দুর্নিবার আকর্ষণে। ছুটির দিন। বোবা মাঠের বুকে বুলিহীন গাভীর ব্যাকুল ডাক ভাসিয়া যাইতেছে। বাছুরটাকে খুঁজিতেছে করুণ কাল চোখে।

সূর্য জানায়, এই মাসেই বিবাহ করিবে সে যমুনাকে।

যেদিকে তাকায়, দেখে যমুনা, কি সুন্দর সোনার বরণ রৌদ্র। দীর্ঘ স্রোতের উজান ঠেলিয়া যেন দুইজনে মিলিয়াছে, এক রৌদ্র নাওয়া সোনার চরে।

বাড়ি ফেরে যমুনা। পায়ে পায়ে মধুর শিহরণ, আনন্দ বিহ্বল পদধ্বনি যেন এই মধুর সংবাদ ঘোষণা করিতে করিতে চলে।

বাড়ি আসিয়া দেখে যমুনা, মদন আসিয়াছে। দিনে দুপুরে ভুত দেখিলেও বুঝি এমন আঁতকাইয়া উঠিত না যমুনা।

যমুনা ভীত, বিহ্বল চোখে তাকাইয়া দেখে, বহুদিনের হারাণো জামাইকে ফিরিয়া পাওয়া পরিতুষ্ট পরিজনকে। অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছে মদন। আর শ্বশুর শাশুড়ী শ্যালকবৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া শুনিতেছে তাহার সেই অফুরন্ত কথা।

মাথার সেই বাবরী চুল আর নাই। গোঁফটি এখনও আছে, তবে গোঁফের ধরণটি বদলাইয়াছে। আগের মত সজারুর কাঁটার মত গোঁফ নয় এখন। নূতন গিলবার্ট ফ্যাশনের সরু একটি রেখা ঠোঁটের ডগায়। সব চাইতে বড় বিস্ময়, সাহেবদের মত পরনে খাকি পেণ্টুলান। গায়ে বুশজ্যাকেট। বোতাম খোলা সাহেবী জ্যাকেটের ভিতর হইতে তলার নোংরা তেলচিটা গেঞ্জিটা দেখা যায় একটু। বিস্ময়নামা গ্রাম্য অবাক চোখের দৃষ্টি অতদূর পৌছায় না।

হাতে একটা রিষ্ট-ওয়াচ—এইটি চুরির সামগ্রী ; সে কথাটা অবশ্য গোপনই রাখে। এ তাক লাগানো মজলিসে।

কে বলিবে, মদনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছোঁয় ছোঁয়। কথার ফাঁকে-ফাঁকে হাসিয়া এদিক-ওদিক তাকায়। যমুনা মনে মনে বলে, ইস কি নোংরা দাঁতগুলি। উপরের পাটিতে দুইটি সোনার খিল বাঁধান দাঁত ঝক ঝক করে। আবার কথা বলিতে বলিতে অমন কাঁধ ঝাকায় কেন ব্যাটা। বোঝেনা যমুনা, মদনের এই 'শ্রান' করার মর্মার্থ।

যমুনা ঘরে ঢুকিয়া বেড়ার ফাঁক হইতে শোনে তাহার আত্মীয় পরিজনদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি রসিকতা। এতদিনে নাকি যমুনার কপাল ফিরিয়াছে। সৌদামিনী আহ্লাদে ভরিয়া ডাকে।—কইল যমুনা, আয়না। দেখুক ব্যাটা এতকাল এমন বৌরে ভুইলা ছিল কেমনে।

সূর্যও এক ফাঁকে ঘুরিয়া যায়। মদন কত মায়না পায়, কোথায় ছিল, এসব জানিবার জন্য উদগ্রীব নয় সে। যমুনা খুশি হইয়াছে কিনা মদনকে পাইয়া, তাহার আজ সেইটাই সবচাইতে বড় কথা জানিবার।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দেখা মেলে যমুনার। ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছে সে। সূর্য আজ ভুল করিয়া তাহাদের ঘাটে আসিল নাকি পা ধুইতে। বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলে সে—আমাগো ঘাটের পথে একটা গরুর ঠ্যাং আইন্যা ফেলছে কুত্তায়—তাই এই ঘাট থেইক্যা পা ধুইয়া যাই।

কিন্তু যমুনা একবার তাকায়ও না। এতই দেমাক। সূর্য খোঁটা দিয়া বলে—কিলো যমুনা, শহরে কবে চল্লি ?

যমুনা তবু কথা কয় না।

—বাসা বাড়িতে যাবি বইলা কি এতই।

যমুনা মুখ তোলে এতক্ষণে। দুই চোখ জলে ভরা। সূর্য খুশি হয়, যমুনা কাঁদিতেছে। আর কিছু জানিবার দরকার ন্যাই তাহার।

কিন্তু মদন যদি লইয়া যাইতে চায়। যমুনা চোখের জল মুছিয়া জবাব দেয়—কে যাইব ঐ ব্যাটার লগে। আমারে কাইটা ফেললেও না।

কিন্তু মদন লইতে আসে নাই যমুনাকে। বাড়ীর সকলে অবাক হইয়া যায়।

—এত টাকা করছো—এত জিনিষপত্র, তবে মাইয়ারে নিবা না কেন?

—হারাধনের পিতৃস্নেহটা আজ যেন বড় বেশী সজাগ হইয়া উঠিয়াছে প্রথমা কন্যার সুখদুঃখের চিন্তায়। মদন তার ভারিক্কি চালে জবাব দেয়, —সেখানে কি গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝিয়েরা স্বভাব-চরিত্র ঠিক রাইখ্যা চলতে পারে। সাহেবে গিজ গিজ করতাছে চতুর্দিক। আর সাহেবগুলির নজর তো শুধু ঐ মাইয়া-মানুষের উপর।—হাসে মদন। সে হাসিতে শিহরিয়া উঠে বৌ-ঝিরা। গায়ের কাপড়-চোপড় একটু টানিয়া দেয়।

মদন ধীরে ধীরে তামাক টানে।

সেকি আসিয়াছে বৌকে লইয়া যাইতে? ঐ তো চেহারা বৌয়ের। না, চেহারা এমন কিছু মন্দ নয়। তবু তাহাদের এরোড্রামের রাস্তার সুরকি ভাঙ্গার কাজ লওয়া সেই গোলাপী, সুবর্ণ, কালামিঞার বৌ—তাহাদের সেই সরস হাসির কাছে যমুনার ঐ বোকা বোকা চাউনির তুলনাই হয় না। এক রাতেই টের পাইয়াছে সে—যমুনাকে দিয়া তাহার কাজ চলিবে না। মদনের দৃষ্টি পড়ে প্রতাপের বৌয়ের উপর। বিলাতী সাহেবের মন টলাইতে না পারিলেও দেশী সাহেবের মন গলিবে নিঃসন্দেহে।

খোদ আমেরিকান অফিসার সাহেব হইতে বেয়ারা পর্যন্ত সকলেরই দরকার লাল-সাদা মদ আর উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে। একটা উন্মত্ত ক্লেদাক্ত কামনা, লালসার পুতি-গন্ধভরা উদ্দাম হাওয়া বহিতেছে মিলিটারী তাঁবুতে তাঁবুতে, এরোড্রামের খোলা ময়দানে, সুরকী ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে মোড়ে, কনট্রাক্ট লওয়া নূতন সামরিক শহরে। সে দূষিত বাতাসের কাল সর্পিল গতি পথ খুঁজিয়া লইতে বাহির হইয়াছে গৃহস্থ ভদ্রপল্লীর গলিতে গলিতে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মধুর পরিবারের প্রাণকেন্দ্রে। যুদ্ধার্ত পৃথিবীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভারতীয় সভ্যতারও অন্তিম শ্বাস উঠিয়াছে বুঝি কালপর্দার আড়ালে।

কিন্তু সে গবেষণায় চিন্তিত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না

প্রতাপের ঘরের আঙ্গিনায়। মদন সিন্ধুবালাকে এক টিন বিলাতী মাছ আনিয়া দিয়াছে; তাহা লইয়াই ব্যস্ত সকলে।

—দেখ দেখি মারভিং মাছের স্বাদ কেমন!

সকলে অবাক হইয়া শোনে মদনের মুখেও দুই-এক টুকরা ইংরাজী বুলি। মাছের টিনটা কাটিতে কাটিতে প্রতাপের যেন জিভে জল আসে। মদন অনর্গল বকিয়াই চলিয়াছে। কৌটা ভর্তি কত দুধ, চিজ বাটার! হঠাৎ সকলে ছুটিয়া উঠানে নামে—মাথার উপর দিয়া কয়টা উড়োজাহাজ যাইতেছে!

মদন গর্বিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—ঐটা লিবারেটার, আর ঐ তিনটা ফ্লাইং ক্যামেল।

সিন্ধুবালা বিস্ময়ে বিষম-খাওয়া চোখে তাকাইয়া দেখে মদনকে।
—তা জামাই বুঝি উড়োজাহাজেও চড়ছো!

—কত।—বেমালুম মিথ্যা কথাটা বিনা দ্বিধায় বলিয়া যায় মদন। উড়োজাহাজেই যদি না চড়িয়া আসিয়া থাকে এই যুদ্ধের যুগে, তাহা হইলে শ্বশুরবাড়িতে সম্মান থাকে কই। বিশেষ ঐ সুন্দর-বৌয়ের কাছে।

মদন বার বার দেখে সিন্ধুবালার গায়ের রঙটা। মনে মনে বলে, রঙ বটে। গরীবের ঘরে কি এত রূপ মানায়।

তাহাদের ক্যানটিনের পাশের রাস্তা দিয়া যে মেমগুলির কোমর জড়াইয়া আধ-মাতাল সাহেবগুলি ডিনার খাওয়ার পর ঘোরে, তাহাদের গায়ের রঙ তো ভাতের হাঁড়িকেও হার মানায়। তবে ঐ ফ্রক পরে বলিয়া যেটুকু বাহার আর ঠোঁটগুলিতে টুক টুকে লাল রঙ মাখে বলিয়া! চুলগুলিও বাবরি করিয়া ছাঁটা। একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে একদিন তাহার তো প্রায় দফা শেষ হইতে চলিয়াছিল এক মিলিটারী লরীর তলায়। সেই মদনকেও মনে মনে স্বীকার করিতে হয়, সিন্ধুবালা ফ্রক না পরিলেও কাল মেমগুলির চাইতে অনেক সুন্দরী। কোন রকমে একবার প্রতাপকে পটাইয়া শহরে নিয়া ফেলিতে পারিলেই বাজীমাৎ।

মদনের গল্প আর ফুরায় না। সিন্ধুবালার চোখে স্বপ্নকথা নামিয়া আসে। এত সুখ শহরে। সেই বাবরী-মাথা মদনও আজ সাহেব বনিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে শুইতে গিয়া প্রতাপকে জানায় মনের ইচ্ছাটা,—জামাইরে কইয়া মিলিটারীতে একটা কাজ জুটাও না।

প্রতাপের মন্দ লাগে না এ যুক্তিটা। ধানের মণ পনের টাকায় উঠিয়াছে গেল হাটে। দাম কমার নাকি আশা নাই। আরও ভয়ঙ্কর দিনই আসিতেছে সামনে।

কিন্তু সূর্যের মত হয় না। ছোট হইলেও ভাইয়ের মতামতকে সমীহ করিয়া আসিয়াছে প্রতাপ চিরদিন। আজও উহা উড়াইয়া দিতে পারে না। সুন্দর-বৌ ঝংকার দিয়া উঠে—ভাইয়ে লরবো ক্যান গ্রাম থেইকা—তার পীরিতের জনরে ফেলাইয়া।

প্রতাপ চুপি চুপি মদনের সঙ্গে পরামর্শ করে—একটা কাজ-টাজ জুটাইয়া যেন পত্র দেয়।

পদ্মা ছাদের ঘরে বসিয়া অরুণাভের শার্ট ইস্তিরি করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে সুকল্যাণের কথা। তাহার বিচারের রায় বাহির হয় নাই এখনও। মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। নিস্তেজ রোদটুকু ছাদের এক কোণায় সরিয়া গিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে যেন। স্মৃতির অবসাদমাখা স্তিমিত রৌদ্র।

অরুণাভ বাড়ি ফেরে নাই এখনও। মৃদু প্রতীক্ষমাণ মনে কাজ করিয়া যায় পদ্মা। ইস্তিরি ঠাণ্ডা হইয়া আসে। উনানের উপর আবার বসাইয়া আসে ইস্তিরিটা। নিচে পায়ের শব্দ শোনা যায়। অরুণাভের পায়ের শব্দ। পদ শব্দেও এত প্রাণ, এত উত্তাপ আছে, জানিত না সে। অরুণাভের সঙ্গে কে একটি অপরিচিত মেয়ে আসিয়াছে। অরুণাভ পরিচয় করাইয়া দেয়—আমাদের একজন কমরেড—ইরা বসু।

আগামী সপ্তাহের কর্মসূচী লইয়া আলোচনা করে দুইজনে। পদ্মা ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শোনে উহাদের আলোচনা।

একটু মন দিয়াই দেখে অপরিচিতাকে। চোখেমুখে অতি ব্যস্ততার ছবি। সুন্দর মুখখানাতে একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়িয়াছে।

পরের দিনও ইরা আসে অরুণাভের খোঁজে। হাতে এক গোছা জলপদ্ম, কাঁধে ঝুলান বর্মি থলিতে একরাশ বুকলেট। পদ্মা চেয়ারটা একটু টানিয়া দেয় বসিতে। ইরা বসে না। টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই একটা চিরকুট লেখে অরুণাভের নামে। পদ্মা জানালার পাশে বসিয়া একটা পুরানো ফরোয়ার্ডব্লক মন দিয়া পড়িতেছে। ইরা আড়চোখে একবার তাকাইয়া দেখে পদ্মার হাতের পত্রিকাটা।

চোখের পীতাভ উজ্জ্বল তারা দুইটিতে একটু অবজ্ঞামিশ্রিত সংশয়ের ছায়াপাত করিয়া মিলাইয়া যায়। পদ্মার দৃষ্টি এড়ায় না। ইরা তাহার অলঙ্কারবিহীন হাতের রিষ্টওয়াচে একটু চোখ বুলাইয়া বলে—চলি এবার। বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটা মিটিং আছে। দরদীরাও যেতে পারবে। তুমিও যেও।

পদ্মা কয়দিনেই একটা কথা লক্ষ্য করিতেছে, সে যে উহাদের দলের মেয়ে নয়, সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন উহারা।

একটা ধারাল ছুরি দিয়াই খুঁচিয়া খুঁচিয়া কে যেন তাহার বুকের ভিতরে লিখিয়া দিয়া যায় এই রূঢ় সত্য। সে উহাদের দলের কেহ নয়। পদ্মা আরও টের পায়, এ বিষয়ে শুধু যে ইরাই সচেতন তাহা নয়, অরুণাভও এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন। একটু দরদী অনুকম্পার চোখেই দেখে তাহাকে। মনের মধ্যে কেবলই বিঁধিতে থাকে অরুণাভ তাহাকে তাহার কাজের সাথী হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

অরুণাভের ঘরে একটা ঘরোয়া মিটিং ডাকা হইয়াছে। দুপুর বেলায় আজ আর বাহির হয় নাই সে। প্রায় দুইটা বাজে। অরুণাভ কাগজ-পত্র সব গুছাইয়া রাখে।

মেঝের উপর একটা শতরঞ্জি পাতা। ইরা আগেই আসিয়াছে। সে অরুণাভের সঙ্গে বসিয়া কাগজগুলি মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে একটু উসখুস করে—একটু চা দিলে মন্দ হত না।

অরুণাভ পদ্মার খোঁজে ছাদের ঘরে আসে। পদ্মার স্নান খাওয়া হয় নাই তখনও। গঙ্গার জলের ট্যাঙ্কের সামনে বসিয়া বাসন মাজিতেছে সে। অরুণাভ নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়—এখনও স্নান কর নি, পদ্মা, ছুটো যে বাজে। পদ্মা হাসে একটু, উত্তর দেয় না। মৃত্থ বিদ্রূপ-মিশ্রিত হাসি। অরুণাভও লক্ষ্য করে। মনে মনে একটু ধাক্কা খায়। পদ্মা ফিরিয়া তাকায়—কি, চা চাই ?

—না তোমাকে আর করতে হবে না। আমি নিজেই করছি। বল, কেটলিটা কোথায়।

পদ্মা হাত ধুইয়া জল বসাইতে বসাইতে ঠাট্টার সুরে বলে—ফুটন্ত জলের ধোঁয়ায় কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ আর হয় না।

—হয়, পদ্মা হয়। কিন্তু তা আর আজ টের পায় কে ?

পদ্মা এ ব্যথিত কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া অরুণাভের মুখের দিকে তাকায়। অরুণাভ কেন জানি নিজেকে অপরাধী মনে করে।

পদ্মা নিঃশব্দে চায়ে ত্থধ-চিনি মিশাইতে থাকে। অরুণাভ নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে এক নূতন মূর্তিতে দেখে আজ পদ্মাকে।—বড় রোগা হয়ে গিয়েছ পদ্মা, কি হয়েছে বলত ?

পদ্মা হঠাৎ কেন জানি একটু লাল হইয়া উঠে, চোখের পলকে আবার সামলাইয়া লয়।—চা-টা দিয়ে আসবো কি ?—ঠাট্টা মেশান আনুগত্যের সুর কণ্ঠে।

অরুণাভ ঠাট্টাটুকু হৃদয়ঙ্গম করে। চা লইয়া ঘরে আসে। ইরা খুশি হইয়া বলে—বড় ভাল-বৌ পেয়েছো তো অরুণাভ। দিনে কবার চা করাও ?

অরুণাভ আজ আর উত্তর দিতে পারে না। ইরা কথা বলিয়া চলে। কিন্তু তাহার সব কথাও কানে পোঁছায় না। কেন যেন বড় অন্যমনস্ক আজ অরুণাভ। সত্যি কি পদ্মাকে শুধু 'ভাল-বৌ' করিয়াই রাখিয়াছে সে ? আর কিছু নয় ? কিন্তু উপায়ই বা কি ? পত্রিকা অফিসের সাব-এডিটারের চাকুরীর সামান্য আয়ে আর এই যুদ্ধের বাজারে কি-ই বা সহজ গতি আসিতে পারে জীবন যাত্রায়। মিটিং আরম্ভ হয়।

অরুণাভ আবার নিজেকে তুনিয়ার চিন্তাচক্রের মাঝে ঘুরাইয়া লইয়া আসে।

হেমন্তের শেষ। শীতের হাওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বেলাও ছোট হইয়া আসিতেছে। পদ্মা ঘরের কাজ শেষ করিয়া আসিতে আসিতে পিচের রাস্তায় ছায়া নামিয়া আসে।

পদ্মা এই সময়টুকু রোজই জানালায় বসিয়া রাস্তা দেখে। চলমান পথিকের চঞ্চল আনাগোনামুখর রাজপথ। ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের গা ঘেষিয়া চলা অন্ধ ভিখারী, লুঙি-পরা মুসলমান কলাওয়ালা, স্তূপীকৃত ডাবের খোসা, লম্বা বিনুনী ঝুলানো কলেজের ছাত্রী, ব্যাফ্‌ল ওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা পোস্টার। চঞ্চল দৃষ্টি হঠাৎ থামিয়া পড়ে। বে-আইনী ফয়োয়ার্ড ব্লকের একটি গোপন ইস্তেহার! সুকল্যাণের বিচার হইতেছে। এদিকে তাহার ঘরে মিটিং বসিয়াছে—হয়তো সুকল্যাণদেরই জীবন উৎসর্গ করা চেষ্টার অপব্যাখ্যা হইতেছে ঐ পাশের ঘরে এখন। হঠাৎ কাহার মৃদুস্পর্শে চমকিয়া উঠে। অরুণাভ মিষ্টি হাসিয়া বলে—ভীরু মেয়ে, কি এত ভাবছিলে?

পদ্মা যেন একটু অপ্রস্তুত হয় নিজের চিন্তাধারায়। উত্তর দিতে পারে না। পদ্মার এ নীরবতাটুকু লক্ষ্য করে অরুণাভ। বলে—স্টাডি সার্কলে যাও না কেন পদ্মা। কত দূর দূর থেকে মেয়েরা আসে।

—সময় পাই না।—ছোট্ট উত্তর দেয় পদ্মা। যদিও সে জানে, সময় না-পাওয়াটাই কারণ নয় এই দূরে সরিয়া থাকা। বড় বেশি আত্মভিমানী মন পদ্মার। তাই কমরেড মেয়েদের মাঝে কেমন একটা একচেটিয়া স্বদেশী করা ভাব লক্ষ্য কবে সে। যেন কৃপার চোখে দেখে তাহারা নূতন সভায় আসা মেয়েদের। এ দাম্ভিকতা সহ্য করিতে পারে না পদ্মা। কিন্তু অরুণাভকে মনের এ বিরূপ ভাব জানায় না। তাছাড়া আরও অভিমান জমা আছে তাহার মনে। অরুণাভও তো ডাকে না তাহাকে তাহার কাজের মাঝে। সমাজবাদী জীবনের যে স্বপ্ন—সেও আজ মরীচিকা হইয়া উঠিতেছে।

অরুণাভ বলে—ভাবছি আর একটা চাকুরী নেব, যাতে তোমার খাটুনি কিছু কমে।

অরুণাভের কথা শুনিয়া পদ্মা ব্যথিত হয়। প্রশ্ন করে—তাহলে রাজনীতি করবে কখন ?

—যেটুকু পারি করবো, তবু দুজনে একসঙ্গে কাজ করাই ভাল। সময় কম দিলেও একজনের চাইতে দুজনের শক্তিতে জোর বাড়বে আরও অনেক বেশি।

পদ্মা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠে। মানুষও ধীরে ধীরে তাহার আদর্শ ভুলিয়া সংসারের ঘূর্ণিতে আটকাইয়া পড়ে এভাবেই নিজের অজ্ঞাতসারে। তাছাড়া জল হইতে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই এ জাতীয় মানুষ কখনও রাজনীতির পরিবেশের বাইরে নিঃশ্বাস টানিতে পারে না। তাহা হইলে তাহাকে আর জীবন্ত পাওয়া যাইবে না। শুধু অন্তঃসার শূন্য কঙ্কালটুকুই পাইবে সে।

পদ্মা কোমলস্বরে উত্তর দেয়—আমার তো এমন কিছু খাটুনি পড়ে নি, এর চাইতে কত বেশি খাটে আমাদের দেশের মেয়েরা।

—কিন্তু তারা তো শুধু ঘরের কাজই করে। আমি যে তোমাকে সে ভাবে পেতে চাই না পদ্মা।

পদ্মারও অভিমান ঐখানেই। তাহার আহত স্থানে নাড়া লাগে। চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতে যায়। মাথা নিচু করে পদ্মা। অরুণাভ পদ্মার হাতখানা তুলিয়া ধরে প্রীতি-পূর্ণ কোমল স্পর্শে। স্বরে ঝরে অনুনয়।—আমায় ভুল বুঝো না পদ্মা।

যমুনা সরষে শাক তুলিতেছে। কোমরে আঁচল জড়ান। সূর্য পুলের উপর হইতে দেখে। তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে সে। তাহার মন বড় খারাপ আজ। হেডমাস্টার মশাই আজ সকালে জানাইয়া দিয়াছেন আর একমাস পরেই তাহার আর স্কুলের কাজ থাকিবে না। স্কুলের আয় কমিয়া গিয়াছে, তাই মালী রাখা আর চলিবে না।

এত বড় দুঃসংবাদ সূর্য জীবনে এই প্রথম পাইল। শিশুবয়স হইতে সে তাহার বাপের সঙ্গে ঐ বাগিচায় নিড়ানী দিয়া আগাছা পরিষ্কার করিয়াছে, ঝাঁঝরি দিয়া জল ঢালিয়াছে ফুলচারায়। লক্ষ্মী পূজায়, কালী পূজায় ভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে ছেলেরা আসিয়াছে ফুলের সাজি হাতে তাহার বাগানে। কত খোসামোদ করিয়াছে একটি সূর্যমুখী ফুলের জন্য। সেই বাগান হইতে বিতাড়িত হইবে সে। বাগানে ফুল ফুটিবে আবার সে ফুল ঝরিয়া পড়িবে। তাহার এত যত্নের সোহাগী গাছগুলি জলের অভাবে শুকাইয়া যাইবে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সূর্য—এইবার হয়তো দেশ ছাড়িয়াই যাইতে হইবে। মদনের চিঠি আসিয়াছে প্রতাপের কাছে। তাহার জন্য কাজ ঠিক করিয়াছে সে এক কাচের ফ্যাক্টরীতে। ঠিক করে, সেও চলিয়া যাইবে প্রতাপের সঙ্গেই। হেডমাস্টারবাবুই যখন তাহাকে রাখিলেন না, তখন আর কি হইবে দেশে থাকিয়া।

কিন্তু দেশ ছাড়িলে যমুনার সঙ্গে তো আর দেখা হইবে না। মনটা দমিয়া যায়। মনকে বুঝায়, যমুনার সঙ্গেও তো তাহার চিরকালের সম্পর্ক থাকিবে না। একদিন মদন আসিয়া লইয়া যাইবে তাহাকে। যমুনাকে তো সে আর বিয়া করিতে পারে না। সধবার বিয়ের তো কোনও আইন নাই। যমুনা শাক তুলিয়া ক্ষেত হইতে ফেরে। সূর্য তাহাকে কথাটাও জানায়, দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে সেও।

যমুনা হঠাৎ এ সংবাদে বিবর্ণ হইয়া উঠে। অভিমানে চোখ ভিজিয়া আসে। তবু মুখে বলে—তুমি শহরে যাইবা, তাতে আমার কি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কইবা কি? এতকাল এক গেরামে রইছি—এই যা। তা এতো কালের গেরামের লেইগা, বাপের ভিটাটার লেইগা পরাণ পুড়বো না?

প্রতাপরা দুই ভাই-ই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। একটা দোচালা ঘরের টিন বিক্রী করিয়া গাড়ীভাড়ার টাকা সংগ্রহ করে। এই ঘরখানা ছাড়া একটি শনের ঘর ছিল শুধু। বড় ঘরের টিন আগেই বেচিয়াছে।

সিন্ধুবালার উৎসাহের অন্ত নাই শহরে যাওয়ার নামে। মদনের মুখে গল্প-শোনা স্বপ্নের দেশ! তবু শেষদিনটায় মন কেমন করে তাহারও। খানকয়েক কলাইকরা থালা, গোটা দুই পিতলের ঘটি, ময়লা কাঁথা, বহুকালের পুরানো এক ভাঙ্গা পোর্টম্যানের ভিতরে গুছাইয়া প্রতাপের মাথায় তুলিয়া দেয়। দুই মাসের ছেলেটিকে একখানি কাঁথায় জড়াইয়া হাঁটে স্বামীর পিছু পিছু নৌকাঘাটের দিকে।

যমুনা আর সৌদামিনী খালপাড়ে দাঁড়াইয়া কাতর চোখে দেখে তাহাদের জ্ঞাতি প্রতিবেশীদের শহর-যাত্রা। সৌদামিনী সিন্ধুবালার ছেলেটাকে একটু কোলে লইয়া বলে—যাও বা এ্যাদ্দিন পরে আলি, তাও ঠাকুরদার ভিটায় থাকা বরাতে রইল না।

সিন্ধুবালাকে সাবধান করিয়া বলে—পথে ঘাটে ঠাণ্ডা যেন না লাগে। ভাল করিয়া ঢাইকা ঢুইকা লইস।

যমুনা আজ তিনদিন ধরিয়া কথা বন্ধ করিয়া আছে সূর্যের সঙ্গে। রাত্রিতে ছেঁড়া পাটির উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদে সে। অভিমানে উত্তপ্ত চোখের জলে মলিন বালিশ ভিজিয়া যায়। পুরুষ মানুষগুলি এমনি মায়াদয়াহীন।

ভোরে উঠিয়া মৃদু আশা উঁকি মারে মনে, সূর্য বলিয়া গিয়াছে কিছু টাকা পয়সা হইলেই সে আবার ফিরিয়া আসিবে নিজের গ্রামে।

সূর্য ও প্রতাপের জন্য কাজ ঠিক করিয়াছে মদন। ঘরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ঘরের কাছাকাছি ছোট একখানি খোলার ঘর। সামনেই উঠানে একটা টিউবওয়েল। অন্ধকার ভোর হইতে টিপকলে জল নেওয়া আরম্ভ হয়, রাতের আগে বিরাম হয় না এ জল পাম্প করার। সিন্ধুবালা দিন ভরিয়া দেখে, বস্তীর মানুষদের বাসন-ধোওয়া, কাপড় কাচা, স্নান করা। ভোঁ পড়ার সঙ্গে হিসাব করা বাঁধা সময় সকলের।

কয়টি পেট-উঁচু নেংটা ছেলে আসিয়া দাঁড়ায় সিন্ধুবালার ঘরের সামনে। অবাক হইয়া দেখে তাহাকে। জল পাম্প করিতে করিতে

মেয়েরা বৌরাও একটু তাকাইয়া দেখিয়া যায়। মেয়েরা যাইতে না যাইতেই আসে জনা দুই হিন্দুস্থানী। ঘটি মাজিতে মাজিতে তাহারাও দেখে নূতন ভাড়াটিয়াদের।

এরই মধ্যে কি কারণে কলতলায় দারুণ ঝগড়া আরম্ভ হইয়া যায় মেয়ে-পুরুষে।

সিন্ধুবালার রঙিন স্বপ্ন, ট্রাম বাস বিজুলির আলো দেখা চোখের নেশা কাটিয়া যায় এইটুকু সময়ের মধ্যেই। পোতা-বাঁধান ঘর হইলে কি হইবে, ঘরের ভিতরে কিসের একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সামনেই পচা নর্দমা দিয়া রাজ্যের নরক যেন গলিয়া পড়িতেছে। ঘেন্নায় গা বমি-বমি আরম্ভ হয়। আগে পাশে গাছ-গাছড়া একটাও নাই। যে দিকে তাকাও শুধু খোলার ঘর। যমুনা, ঠানদি, হারানীর মা-রা এখন কি করিতেছে, তাহাদের তুলসী তলায় আজ আর কেহ বাতি দিতেছে না। মনটা কেমন কেমন করে।

এ বেলাও সিন্ধুবালা মদনের ঘরেই রাঁধে। ভাল ভাল জিনিষই জোগাড় করিয়াছে সে এই দুর্দিনেও। মাছ কিনিয়াছে একটা আস্ত ইলিশ। চিকচিক করে প্রতাপের ম্যালেরিয়া ধরা চোখগুলি। কতকাল পরে তাহারা এমন পেট ভরিয়া বৌয়ের হাতের সুন্দর রান্না মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইতেছে। খাওয়ার পর একবার রান্নাঘরে একটু উঁকি মারিয়া আসে।—বড় খাসা হইছে আজ মাছের ঝোলটা। ঘরটা ঘুপসি হইলে কি, প্রাণটাও বাঁচিবে খাইতে পাইয়া।

মদন একটা বিলিতী দুধের কৌটা আনিয়া দেয় সিন্ধুবালার হাতে। বেশী বয়সের সন্তান, বুকে কি আর কিছু আছে? ছেলেটা সারাক্ষণই ট্যা-ট্যা করে।

পরের দিন ভোঁ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মদন প্রতাপ আর সূর্যকে ডাকিয়া লইয়া যায়—তাহাদের কাচের ফ্যাক্টরীতে।

দুপুর বেলা সুন্দর-বৌ চাউল ধুইতে গিয়া দেখে, কলের নিচে একটা বালতি পাতা রহিয়াছে, সামনে দাঁড়ান বছর সাতেকের একটি মেয়ে। অতটুকু মেয়ে কি আর জল পাম্প করিতে পারে?

সিন্ধুবালা বলে—সর খুকি, আমি পাম্প কইরা দেই।

জল পাম্প করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে—কোনদিকে ঘর তোমাগো?

—ঐ তো ঘর দেখা যাচ্ছে।

—তাইলে তো আমাগো কাছেই থাক। আর কে আছে বাড়িতে।

—মা আর ভাই। বাবা কাজে গেছেন। মেয়েটি অতি কষ্টে বালতিটা টানিয়া তোলে। মাথাটা কাত হইয়া গিয়াছে জলের ভারে। সিন্ধুবালা বলে—দেও খুকি, আমি দিয়া আসি তোমার বালতিটা। কি নাম তোমার? —হাত হইতে বালতিটা সিন্ধুবালা তুলিয়া লয়।

—সিন্ধু।

—তাইলে তো তুমি আমার সই।

মেয়েটি অবাক হয় এই নূতন মানুষটির কথা বলার ভঙ্গিতে।

দুপুর বেলা ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া সিন্ধুবালা তাহার ছোট্ট সইয়ের বাড়িতে একটু ঘুরিয়া আসে।

একখানি ঘরের মধ্যে কি সারাদিন মুখ গুঁজিয়া থাকা যায়। কথা বলার জন্য প্রাণটা হাঁসফাঁস করে। তাহাদের রূপসীর উঠানে এতখানি বেলার মধ্যে কতবার মানুষের ছায়া পড়িত।

—কই গো আমার সই কই? এক জায়গায়ই থাকুম যখন একটু আলাপ করতে আইলাম দিদি।

সিন্ধুর মা কমলা ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া দেয়—বেশ ত। এস ঘরে এসে বোস।

কমলার স্বামীও কাজ করে ঐ কাচের ফ্যাক্টরীতে। শুনিয়া আরও খুশি হয় সিন্ধুবালা। রাত্রিতে স্বামীর কাছে সিন্ধুবালার গল্প করে কমলা। খুব আলাপী মানুষ। কিন্তু পরেশ খুশি হয় না বিশেষ। মদনের আত্মীয় ওরা। কেমন লোক হইবে বলা যায় না।

সিন্ধুবালা দিনে অন্ততঃ দশবার আসে কমলার ঘরে।—কি রাঁধতাছো সইয়ের মা। ওমা! পুইশাকেও আবার মিষ্টি দাও তোমরা?—হাসে সিন্ধুবালা।

বিকেল বেলা আরেকবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যায়—কলাপাতা

পাওয়া যায় না দিদি এই দেশে ? কচুর লেতি কিন্যা আনছে দেওরে। লতিপাতরি—ভালবাসে।

—কচুর লতিপাতরি ! সে আবার কেমন পদার্থ হবে ?—চোখ বড় হইয়া উঠে কমলার।

সিন্ধুবালা রান্নার প্রণালী শিখাইতে আরম্ভ করে।

—কিন্তু কলাপাতা না হইলে তো হইবে না।

—বাজার থেকে কিনে আনলেই হবে।

—কলাপাতাও কেনন লাগে।—অবাক হয় গ্রামের বৌ।

কয়দিনেই সিন্ধুবালা ছোট্ট বস্তীটুকুর প্রায় সব ঘরের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলে। কোণের ঘরের বীরুর বৌকে ডাকিয়া বলে—আস বৌ তোমার চুলটা বাইন্ধা দিয়া যাই। আমাগো গ্রামে আমার হাতের চুল বান্ধা পছন্দ ছিল সকলের।

চুল বাঁধা শেষ করিয়া সরস্বতীর মায়ের রান্নাঘরে একবার উঁকি মারিয়া আসে।—দিদির ঘরে একখান আখা পাইতা দিয়া যামু। সুন্দর বৌর একখান হাতের চিহ্ন থাকবো।

—আখা আবার কি গো মেয়ে ?

—চুলা গো চুলা। উনান না কি কয়।—হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে সুন্দর বৌ।

সুপ্রিয় আসিয়াছে। এম এ পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা। আর কয়মাস পরেই পরীক্ষা। অরুণাভ বলে—আমাদের এখানেই থাক। এই কয় মাসের জন্য আর মেসে গিয়ে কি করবি ?

সুপ্রিয় রাজী হয়। ছাদের উপরের ছোট্ট কোঠাখানা দখল করে সে—বই খাতাপত্র গুছাইয়া লয়। ছাদের অপর প্রান্তে একটা টালির রান্নাঘর। সুপ্রিয় পড়িতে পড়িতে দেখে, রন্ধনরতা পদ্মাকে। জলের ব্যবস্থা নাই উপরে। কলসী ভরিয়া একতলা হইতে জল তোলে পদ্মা।

সুপ্রিয় ডাকে—শোন, পদ্মাবতী।

পদ্মা আসে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে তখনও।—কয় কলসী জল

তুলেই এই অবস্থা। একেবারেই ঠুনকো দেহ।—ঠাট্টার সুরে বলে সুপ্রিয়।

পদ্মা বলে—ডাকলে কেন, সেটা আগে বল।

—এমনিই। বস গল্প করি।

—কি আমার আবদার! তারপর জঠরাগ্নি যখন জ্বলে উঠবে তখন।

—কি আর হবে, দোকান থেকে রুটি কিনে খাব। রান্নাটা এমন কিছু বড় কাজও নয়, কঠিন কাজও নয়। তার চাইতে অনেক বেশী জরুরী কাজ আছে পৃথিবীতে।

—সেই জরুরী কাজটা কি তোমার সঙ্গে বসে গল্প করা।

—গল্প না কর, একটা গান শোনাও।—উত্তর দেয় সুপ্রিয়।

পদ্মা ম্লান হাসি হাসে।—কোনদিন শুনেছ আমার গান, এখানে আসার পরে?

একটু যেন ভিজিয়া উঠে গলার স্বর। সুপ্রিয় লক্ষ্য করে। তবু ঠাট্টার সুরেই বলে—তাই তো ভাবছি, পদ্মাবতীর গান থেমে গেল কেন?

পদ্মা আর দাঁড়ায় না এখানে বসে গল্প করলে আমার ডাল পুড়ে কয়লা হবে।

দুপুর বেলা পদ্মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া অবাক হয়। দেখে জলের পাত্রগুলিতে সব কে জল ভরিয়া রাখিয়াছে। নিশ্চয়ই সুপ্রিয়র কাজ এসব। একটা অস্পষ্ট ব্যথায় মনটা ভিজিয়া উঠে—কেন এত ভাবে সুপ্রিয় তাহার জন্য।

কাজের এক ফাঁকে সুপ্রিয়র ঘরে ঢোকে।—জল আনতে কে বলেছিল?—স্নেহার্দ্র অভিযোগ কণ্ঠে।

—বলবার মত কেউ থাকলে তো দুঃখই ছিল না পদ্মাবতী।

পদ্মা অবাক হয় সুপ্রিয়র এ কণ্ঠস্বরে। এক মুহূর্তে মাত্র ঐ দুইটি কথা এ হাস্যকৌতুকে ভরা সুন্দর রসিক ছেলেটিরও অন্তরের ব্যথার স্থানের সন্ধান জানিয়া ফেলে পদ্মা। কেহই তো নাই সুপ্রিয়ের। মাতৃ-

পিতৃহীন, আত্মীয়-পরিজনহীন এক অশান্ত বালক আপন স্বভাবের স্নিগ্ধতায়ই আপন করিয়া ধরিয়াছিল একদিন দূরের মানুষকে।

পরদিন সুপ্রিয়র বাড়ি ফেরার আগেই সব জল তুলিয়া রাখিতে গিয়া হঠাৎ জলের কলসী লইয়া পা পিছলাইয়া পড়ে পদ্মা। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরে একটা ভীষণ টান পড়ে। মনে হয় যেন রগ ছিঁড়িয়া গেল। বাড়িতে কেহ নাই। অতি কষ্টে সামলাইয়া লয়, কাহাকেও কিছু বলে না। কিন্তু বিকেলের দিক হইতে অসহ্য বেদনা আরম্ভ হয়! কিছুতেই যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছে না সে যন্ত্রণা। চোখমুখ নীল হইয়া উঠে। অরুণাভ লক্ষ্য করে—কি হয়েছে পদ্মা, এত কাহিল লাগছে কেন তোমাকে?

পদ্মা ততক্ষণে শুইয়া পড়িয়াছে। আর নড়িবার শক্তি নাই, না জানাইয়াও উপায় নাই। অরুণাভ সুপ্রিয়কে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে পাঠায়।

ডাক্তার আসিয়া অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠে। সন্তানসম্ভবা পদ্মা। অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার অরুণাভকে আড়ালে ডাকিয়া বলে—ভয়ের কারণ আছে। সন্তান টিকবে বলে মনে হয় না। তাহলে ওরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। তার চাইতে আগেই ব্যবস্থা করা দরকার।

অরুণাভ ডাক্তারের কথায় ভীত হয়। অবাক হইয়া একটু ভাবে, তাহারই সন্তান আসিতেছে। কিন্তু পদ্মাকে যদি বাঁচান না যায়।

তখনকার মত সারিয়া উঠে পদ্মা। কিন্তু একমাসও কাটে না। তিন মাসের একটি অপূর্ণ সন্তান প্রসব করিয়া আবার অসুস্থ হইয়া পড়ে। বেশী হাঁটা চলা নিষেধ। বাড়িতে মেয়েছেলে কেহ নাই। ইরা আসিয়া বলে—যে কদিন পদ্মা ভাল না হচ্ছে, আমি এখানে থাকি।

অরুণাভ খুশি হয়। কিন্তু পদ্মা খুশি হয় না। অবাঞ্ছিত লোকের সেবা গ্রহণ করা রোগ-যন্ত্রণার চাইতেও পীড়াদায়ক মনে হয়। এ ভাবে পর-নির্ভর জীবন বড় অসহ্য লাগে। নিজেকে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। যেন জোর করিয়া উহাদের জগতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে সে।

কি মনে করিয়া হাতে বোনা একটি কুর্শির ফ্রকের শেষ বুনানিটুকু পর্যন্ত খুলিয়া ফেলে। পর মুহূর্ত্তে বালিশে মুখ গুজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। যেন একটি সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছে সে।

সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে। মেঝেতে ছড়ান লেসের টুকরাগুলি দেখিয়া অবাক হয়।—অমন সুন্দর জিনিষটা নষ্ট করলে।—তাকিয়েই দেখে পদ্মা কাঁদিতেছে।

—কি হয়েছে পদ্মা ?—কোমলস্বরে জিজ্ঞেস করে।

—কিছু ভাল লাগে না সুপ্রিয়। জীবনটাকে বড় ফাঁকি মনে হয়।

সুপ্রিয় উত্তর দিতে পারে না। বোঝে, আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রখর বলিয়াই এত কষ্ট পাইতেছে পদ্মা। খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না সে নিজেকে তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে।

কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করে সুপ্রিয়, কি একটা ঘটনা ঘটিতেছে তাহার মনে। একটা স্থায়ী অবসন্নতা চাপিয়া ধরিয়াছে মনে।

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরই চলিয়া যাইবে সে। পদ্মার বিষণ্ণ মুখখানা বারে বারে নাড়া দেয় মনে।

এমন কিছু বিশেষত্ব নাই, ওর, যা মানুষকে হঠাৎ চমক লাগায়। তবু কি এক অদৃশ্য প্রাণশক্তি লুকান আছে ভিতরে। বাহির হইতে বুঝিবার সাধ্য নাই—নিজেকে আড়াল করিয়াই রাখে অতি সাবধানে।

—তোমার পুরী যাওয়া স্থির হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, কিছুদিন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরে না আসলে শরীর সারবে না।

শুইয়া শুইয়া একটা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছে পদ্মা। সুপ্রিয় জানালার ধারে বসিয়া সিগারেট পোড়ায়। নিচে রাস্তায় মাটিওয়ালী বুড়ী ডাকিয়া চলিয়াছে—মাটি নেবে গো মাটি।

একটা অলস আবহাওয়া ঘরে এবং বাহিরে। মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন আকাশ। সুপ্রিয় আপনার চোখে দেখে একটু পদ্মাকে—তাহার ঘন পক্ষ্মাবৃত গভীর কালো চোখ দুটি।

পদ্মাদের রওয়ানা হওয়ার আগেই চলিয়া যাইবে সে স্থির করে। সে নিজেও বোঝে না পদ্মার এই চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে কি একটা ব্যথাতুর

অনুভূতি ঘন হইয়া উঠিতেছে মনে। তাহার স্বভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইতেছে না মনের এ অস্বস্তিকর অনুভূতি।

জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া হাতের আধপোড়া সিগারেটটা শেষ করে। সিগারেটের শেষ টুকরাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের অজান্তে কয়টা সুর টানে মৃদু গলায়।

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধ মম
কস্তুরী মৃগ সম।'

পদ্মার প্রবন্ধটা আর পড়া হয় না। সে গম্ভীর দরদী কণ্ঠস্বর তাহাকে কোন দূরের এক জগতে টানিয়া লইয়া আসে। সুপ্রিয় আবার আর একটা সিগারেট বাহির করে পকেট হইতে। পদ্মা বাধা দিয়া বলে—গানটা শেষই কর না বাপু, আমিও একটু মনে মনে শিখে রাখি সুরটা।

কি চিন্তা করিতে করিতে সুপ্রিয় সম্পূর্ণ সুরটা একবার গুন গুন করিয়া আওড়াইয়া লয়। তারপর গলা ছাড়িয়া গান ধরে। সে আবেগঢালা গম্ভীর সুরের উঁচুনীচু পর্দায় কড়িতে কোমলে ঢেউ খেলিয়া বহুদূরে চলিয়া যায়।

পদ্মা অভিভূত হইয়া ভাবে, মানুষ নিজেকে নিবিড় ভাবে নিকটে পায় বোধ হয় একমাত্র গানের ভিতর দিয়া।

সুপ্রিয় গান শেষ করিয়া আবার একটা সিগারেট ধরায়। পদ্মা লক্ষ্য করে সুপ্রিয়ের চোখের পাতায় নামিয়া আসিয়াছে কী গভীর ব্যথার ছায়া।

একটু বিস্মিত হয় পদ্মা। তবু মৃদু ঠাট্টার সুরে বলে—সুপ্রিয়, এত দরদ দিয়ে তো গাওনা তুমি কখনও। মনে হচ্ছে ভালটাল বেসেছো কাউকে?

সুপ্রিয় হাসে। পদ্মার দিকে ফিরিয়া তাকায় স্নিগ্ধ, দুষ্টুমি মাখা হাসি চোখে। উত্তর দেয়—ঠিক বুঝতে পারছি না পদ্মা।

পদ্মা লক্ষ্য করে, এ স্নিগ্ধ হাসির আড়ালে ছায়াপাত করছে একটি বিষণ্ন মূর্তি।

সুপ্রিয় একটু চুপ থাকিয়া বলে—পদ্মা, আমি কিন্তু কালই চলে যাচ্ছি।

সুপ্রিয়র দৃষ্টি বহুদূরে। বিষণ্ণ মৌন মধ্যাহ্ন। দূরের বাড়িগুলির আড়ালে নারিকেল গাছের মাথাগুলি নড়িতেছে মৃদু বাতাসে। ঊর্ধ্বে মেঘাচ্ছন্ন উদাস আকাশ। পাশের বাড়িতে ছাদের আলিসাতে কুজনরত কপোত-কপোতী।

অরুণাভ ঘরে ঢোকে। একটা বস্তির মিটিঙে বাহির হইতেছে সে।

পদ্মা অভিযোগের সুরে বলে—সুপ্রিয় নাকি কালই চলে যাবে।

অরুণাভ বিস্মিত না হইয়া উত্তর দেয়—ওর যদি এখানে ভাল না লাগে তবে থাকবেই বা কেন?

সুপ্রিয় হাসিয়া উত্তর দেয়—আবার বেশি ভাল লাগলে চলে যেতে হয়।

অরুণাভ সুপ্রিয়র মুখের দিকে তাকায়।—এ যে বড় বেশি কাব্যের কথা হয়ে গেল সুপ্রিয়।

অরুণাভের সঙ্গে রাস্তায় পদ্মার এক বান্ধবীর দাদার সঙ্গে দেখা হয়। কমলেশের সঙ্গে একত্র জেলেও ছিল অরুণাভ।

কমলেশ ঠাট্টার সুরে বলে—কি কমরেড, জাপানকে রোখা কতদূর? আর এক মাসের মধ্যেই যমুনার তীরে এসে পড়বে। সুযোগ আর পেলে না মনে হচ্ছে।

অরুণাভ উত্তর দেয়—এতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার খুব কারণ আছে কি? জাপানী মার্কা স্বরাজের অভিজ্ঞতা বার্মা মালয় কিছু কিছু পাচ্ছে, দেখছেন তো।

—কিন্তু এবার তো জাপানীরা আসবে না। আসবে শ্রীযুক্ত বসুর সেনাবাহিনী। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন, দেশের কি পরিবর্তন ঘটে।

অরুণাভ উত্তর দেয়—সেটা সম্ভব হতো যদি তিনি স্বাধীন সেনাবাহিনী নিয়ে আসতে পারতেন।

কমলেশ হাত ঘড়িটায় চোখ বুলাইয়া বলে—চলি, ক্লাশ আছে। একদিন আপনার বাড়ি গিয়েই এ কথার জবাব দেবো।

সুকল্যাণের বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। দশ বৎসর কারাদণ্ড। তারাসুন্দরী ভাঙ্গিয়া পড়ে। নগেন্দ্রশেখরের ভিতরটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—নতুন করে বেদনা বোধের যেন শক্তি নাই স্নায়ুতে। তাহার আজন্মের সাধনা, তাহার গ্রাম, তাহার স্কুল, আশ্রম সব চোখের উপর ধ্বসিয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষের করাল স্পর্শে গ্রামের প্রাণ-প্রদীপই নিবিয়া গিয়াছে। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কমিতে কমিতে অর্ধেকে দাঁড়াইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার মহাশয়দের মাহিনাও অর্ধেক হইয়াছে। চির অভ্যাসমত স্কুলের প্রথম ঘণ্টায় সমস্ত ক্লাসের বারান্দা দিয়া একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসেন প্রধান শিক্ষক। স্কুলের ছাত্রদের সেই কলরব আর নাই। ছাড়া ছাড়া শূন্য বেঞ্চিগুলি করুণ দীর্ঘশ্বাস ভরা।

মাস্টার মহাশয়দের চোখে দুশ্চিন্তার ঘনছায়া। কণ্ঠে নিরুৎসাহ। খাতা দেখার ফাঁকে ফাঁকে অর্ধমৃত স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কঙ্কালসার মূর্তিগুলি চোখে ভাসে। নিস্তেজ স্বরে 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়াইতেছেন ধীরেনবাবু। এককালে কত কবিতা আবৃত্তি করিয়া, কত উৎসাহের সঙ্গেই না ইতিহাস পড়াইতেন ছাত্রদের। কোথায় গেল নবীন সেনের সেই ঝংকার। রানীর কি মত—কহে কৃষ্ণচন্দ্র—কোথায় গেল সেই উদ্দীপনা, সেই বিপুল আগ্রহে শিক্ষক জীবনের আজন্ম সাধনা।

লাইব্রেরী ঘরের সামনে দপ্তরী ঝিমাইতেছে। পাঁচ মিনিট দেরী করিয়াই হয়তো টিফিনের ঘণ্টা দিল। কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই আজ। টিফিনের সময় পত্রিকার উপর ঝুঁকিয়া পড়েন মাস্টার মশাইরা—দুনিয়ার সংবাদ জানা চাই। পত্রিকার মধ্যেই আছে তাদের জীবন-মরণ সমস্যার বীজমন্ত্র।

কোন জেলায় কত টাকা চাউলের মণ, বাড়তি জেলার উদ্বৃত্ত চাউল ঘাটতি জেলায় আনবে নাকি—আশাভীরু সশঙ্কিত জিজ্ঞাসা সুরু হয় কাচের আড়ালে নিষ্প্রভ চোখের তারাগুলিতে।

—চোরাকারবারীদের ধরাইয়া না দিলে আর বাঁচবার আশা নাই।

—ধরাবি কার কাছে? চোরে চোরে মাসতুত ভাই। দারোগা পুলিসেও কি আর এই সুযোগে কম লাল হইতেছে।

পরিতোষবাবু লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া ভিজা গামছাখানি সযত্নে জানালার উপর মেলিয়া দেয়। পাঁচ মাইল দূর হইতে আসিতে হয় তাহাকে। পথে খাল সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়! বিলাসপুরের সাঁকোটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এক বছরেরর উপর। মেরামত করিবার লোক নাই গ্রামে।

একখানি গামছা কাঁধে ফেলিয়া পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া সাঁতরাইয়া স্কুলের খাতায় নামটা বজায় রাখেন বৃদ্ধ পরিতোষবাবু—পুরানো অঙ্কের মাস্টার মশাই।

ধীরেনবাবু বলেন—শুনলাম আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাইপো নাকি বেশ মোটা টাকা করছে এই যুদ্ধের বাজারে।

পরিতোষবাবু বলেন—একমাত্র ঐ তো শুধু টিইক্যা থাকার পথ। কনট্রাক্টারীতে যে নামছে, সেই আজ টিইক্যা আছে। আরেক পথ যুদ্ধে নাম লিখান। আপনাদের গ্রামের নবেন মাস্টারও যুদ্ধে গেছে না? বাড়িতে খবর টবর আসে?

ধীরেনবাবু উত্তর দেন—তার সে মিলিটারী চাকরির কি আয় আছে? তার নামে নাকি গোপন রিপোর্ট গেছে—সে কম্যুনিস্ট।

—তবে যে শুনি, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিত্রতা ব্রিটিশের। 'দেবা ন জানন্তি' আজকালকার পলিটিক্সের রহস্য।

—হেডমাস্টার মশাইকে দেখি না যে।

হেড ক্লার্ক উত্তর দেয়।—তিনি পোস্টাফিসে গেছেন, রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা ভাঙ্গাইতে। মাসের শেষ, এদিকে সব তো ফাঁকা।

—মায়না দেয় নাকি ছাত্ররা?

—মায়না দিবে কে? আসে নাকি ছাত্ররা। বাঁইচা থাকলে তো আসবো স্কুলে। ক্লাসে গিয়া বেঞ্চিগুলিরেই পড়াইতেছি না, ছাত্রদের পড়াইতেছি

নিজেরাই বুঝি না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ অঙ্কের মাস্টার। উঠিয়া গামছাখানি তুলিয়া রাখেন। টিফিনের ঘণ্টা পড়ে।

ছুটির ঘণ্টাও পড়ে। মাস্টারমশাইরা বাড়ি যান। দুশ্চিন্তায় ভারী মন। রিজার্ভ ফাণ্ড ভাঙ্গাইয়া মাহিনা চলিতেছে—এ ভাবে আর কদ্দিন ?

মাস্টারমশাইরা সবাই বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রশেখর তবু লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া থাকেন।

সামনের বাগানটা জঙ্গলাগাছে ভরিয়া উঠিয়াছে। তুলা ক্ষেতটা একেবারে ফাঁকা। দক্ষিণে তাকাইলেই চোখে পড়ে. আশ্রমের চালাগুলি। বেড়াহীন চালাগুলি শুধু পড়িয়া আছে! ভিটাগুলির ওপর পাগলা ঢেকি আর সারি সারি ব্যাঙের ছাতি ঘরে আসিতে যাইতে চোখে পড়ে। বেদনায় স্তব্ধ হইয়া যায় আহত দৃষ্টি।

মুসলমানপাড়ার মেয়েরা আসিয়া শাক তুলিয়া লইয়া যায় আশ্রমের ভিটা হইতে। কানে আসে শিশুদের ক্ষুধার্ত আর্তনাদ।—চাউল আনছে তোর বাজানে ?

—চাউল নাই আউজকা কয়দিন না ? কচু সিদ্ধ চলছে দুই সন্ধ্যা। এক সন্ধ্যা গেছে মিষ্টিআলু-পোড়া দিয়া। আউজকা একমুঠা চাউল আনছে বাবুগো বাড়ির থন—জিভটা জড়াইয়া আসে। আউসধানের ফ্যানা ভাতের স্বপ্ন ক্ষুধায় স্তিমিত চোখগুলিতে।

ছোট ছোট একপাল ছেলেমেয়ে পিতলের ঘটি রাখিয়া যায় রান্নাঘরের সামনে ফ্যানের প্রত্যাশায়।

তারাসুন্দরী একজনের মত চাউল বেশি লয় রোজই। কিছু কিছু ভাত ও ফ্যান একসঙ্গে ঢালিয়া দেয় ঐ পিতলের ঘটিগুলিতে। কোন কোন দিন নিজের ভাতটুকুও দিয়া দেয়। বুকটা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে —কি ভীষণ দুর্দিন! ঘরে ঘরে অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হাড়গিলা শিশুগুলি টিকিয়া থাকিবে কি এই ফ্যানটুকুর জোরে। ঘটিতে ফ্যান ঢালিতে ঢালিতে ভাবে তারাসুন্দরী।

ভাত খাইতে বসিয়া ভাত খাইতেও লজ্জা করে। টপটপ করিয়া চোখের জল পড়ে ভাতের থালায়। সারাদিন থাকিয়া থাকিয়া

সুকল্যাণের কথা মনে পড়ে। সুন্দর উজ্জ্বল একহারা চেহারা—তীক্ষ্ণ চঞ্চল দুটি চোখ!

কল্যাণরা বাহিরে থাকিলে হয়ত এমন হইত না, ভাবে তারাসুন্দরী। কি ব্যথা, কি অসহ্য ব্যথা বুকের ভিতরে। স্বামীর নিরানন্দ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইতে আর পারে না। ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজার আয়োজন করিতে করিতে পদ্মার কথা মনে পড়ে। নিজের গর্ভধারিণী মা আর ভাইও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নাই। প্রকাশও এমন স্বার্থান্ধ হইয়া উঠিল!

প্রকাশের ব্যবসা নাকি খুব ভাল চলিতেছে। আবার এই গ্রামেরই জমিদারদের কাচের ফ্যাক্টরীতে ম্যানেজার হইয়াছে সে।

নগেন্দ্রশেখর গম্ভীর হইয়া বলে, "তার নাম আর আমার কাছে কোর না তোমরা।"

তাহারই ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাদের চৌধুরী বাড়ির ছেলে, শম্ভুনাথের পৌত্র—আর সে করিতেছে চোরাকারবার! মাস্টারমহাশয়রা আলোচনা করেন।

নগেন্দ্রশেখর লজ্জায়, অভিমানে, ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। সুকল্যাণ ব্যথা দিয়াছে তাহাকে, তবু সে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের গৌরবে মহীয়ান।

পদ্মা আঘাত দিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আছে মানব-ধর্মের স্নিগ্ধতা। শশাঙ্ক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তবু তাহার আছে নীতির উদার বৈশিষ্ট্য। তাহারা আজ খাটিতেছে গ্রামে গ্রামে, দেশকে বাঁচাইবার জন্য অজস্র চেষ্টায়। অস্বীকার করার উপায় নাই তাহাদের এ প্রচেষ্টার সততাকে।

কিন্তু প্রকাশ? এ কি করিতেছে সে।

সহস্র শিশুর প্রাণবলি দেওয়া দানবদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে সে শুধু ধনী হওয়ার উন্মত্ত লালসায়। এ অঞ্চলের চাউল রপ্তানীর "সোল্ এজেন্সী" লইয়াছে নাকি সে ঐ বদমাইস সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে একত্রে।

পিতলের ঘটি হাতে শিশুদের ক্রমবিলীয়মান সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করেন নগেন্দ্রশেখর।—কিরে আজ যে তোরা মাত্র পাঁচজন?

—মইরা গেছে পূবের ঘরের মাইয়া-পোলা। মালো পাড়ার কেষ্টও মরছে কাইলকা।

—রাধুও মরছে।—ভয়ার্ত কণ্ঠে জানায় আর একটি শিশু।

নগেন্দ্রশেখর হঠাৎ কি কারণে গর্জিয়া উঠেন,—বড়লোক হবি। কাঠের ফারনিচার দিয়ে ঘর সাজাবি? বাড়ি করবি, গাড়ি করবি। কিন্তু তোর দেশ? দেশ যে হারাবি তাতে, তা একবারও ভাবলি না? কতকগুলি কাঠ আর ইটের স্তূপই তোর কাছে বড় হল? আর এই রক্তমাংসের নিষ্প্রাণ কচি প্রাণগুলি তুচ্ছ হয়ে গেল? পোকামাকড়ের মতই তুচ্ছ হয়ে গেল?

" বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন নগেন্দ্রশেখর। এক ভয়ঙ্কর গম্ভীর বিষাদ মূর্তি।

শিশুরা ভীত হইয়া উঠে। অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকায় ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে। ঐ ফ্যানটুকুও বোধহয় আর দিতে চায় না বাবু—তাই এত চেঁচাইতেছে।

তারাসুন্দরী স্বামীর দিকে তাকান অপরাধীর চোখে। কি লজ্জায় আবার ভাত রাঁধিতেছে সে।

উঠানে আসিয়া বলে, তোরা আজ এখানেই ভাত খাবি। বুঝলি?

একমুহূর্তে সব কটি চোখ সুহচটেপা বাতির মত জ্বলিয়া উঠে। ভাত, ভাত খাইবে তাহারা আজ বাবুর বাড়িতে। কত মিষ্টান্ন, খিচুড়ী প্রসাদ খাইয়াছে তাহারা এই বাবুর বাড়ির উঠানে বসিয়া। সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে কতকাল। মনেও পড়ে না সে সব দ্রব্যের স্বাদ।

তারাসুন্দরী চাউল বাহির করিয়া আনেন ভাঁড়ার হইতে। ভাত রাঁধেন, ডাল রাঁধেন। কলাপাতা কাটিয়া ভাত পরিবেশণ করেন শিশুদের। গরম ভাতের ধোঁয়ায় চোখেমুখে কি আরাম লাগে। নাক ভরিয়া ভরিয়া টানিয়া লয় ভাতের আঘ্রাণ। নগেন্দ্রশেখরের মুখে হাসি দেখা দেয়।

বহুকাল পরে তারাসুন্দরী দেখিলেন এ হাসি তাহার স্বামীর চোখে। এক অনাস্বাদিত তৃপ্তির স্বাদ যেন পাইলেন আজ। ঠাকুরের

প্রসাদ তো কতবার কত তিথি উপলক্ষে তাহারাও বিতরণ করিয়াছে এই দরিদ্র শিশুদের। কিন্তু আজকের এ মুহূর্তস্থায়ী আনন্দের যেন তুলনা নাই। ইহাতে নাই ধনী চিত্তের করুণার বিলাস, নাই সুপ্ত যশাকাঙ্ক্ষা, নাই দরিদ্রসেবার পুন্য। এ শুধু মুমূর্ষু মানব শিশুর চিত্তে ক্ষণিকের জন্য জীবনের আস্বাদ দান।

হাত চাটিয়া চাটিয়া এক কণা অবধি ভাত খায় শিশুগুলি। শিশুচিত্তের সে তৃপ্তির আস্বাদ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া গ্রহণ করিতেছেন নগেন্দ্রশেখর। পাগল হইয়া গিয়াছে আজ যেন পৃথিবীটা। একদল ক্ষমতার জন্য, অর্থের জন্য, জীবনের ভোগের জন্য, পাগল হইয়া গিয়াছে। এত বড় সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া না হইয়া যায়। যুদ্ধ জিইয়া থাকিতে থাকিতেই যাহা কিছু করার করিয়া লইতে হইবে। দেশ কাল সৎ অসৎ কোন বিচার শক্তি নাই এ বিকৃত উন্মাদ দৃষ্টিপথে—শুধু আছে টাকা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, শেয়ার মার্কেট আর চোরা পথ।

ম্যানেজার, ডিরেক্টার, ঠিকাদার, জোতদার হইতে আরম্ভ করিয়া কেমিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বেয়ারা, বয়—মতিচ্ছন্ন সর্বহারা কেহই বাদ যায় নাই এই উন্মাদ পাপচক্র হইতে।

আরেক চক্রের উন্মাদ যাহাঁরা তাহারাও আজ এক আত্মত্যাগের উন্মত্ততায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

তাহাদের আকুল ক্রন্দনে দিগ্‌বলয়ে কম্পিত হইতেছে—বাঁচাও —বাঁচাও। এ মহীয়ান দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা কর।

দিশেহারা ব্যাকুলতায় পাগল হইয়া গিয়াছে তাহারাও।

আবছা সন্ধ্যা। সমুদ্রের নরম বালুতটে বসিয়া আছে পদ্মা। সামনে উত্তাল তরঙ্গের একটানা গর্জন। বেলাভূমিতে ফেনিল তরঙ্গরাশি যেন কি এক ক্রীড়ামত্ততায় আছড়াইয়া পড়িতেছে। কূল নাই, শেষ নাই শুধু তরঙ্গের। লহরীর পর লহরী ছুটিয়া চলিয়াছে গম্ভীর গর্জনে।

সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসে সেই গুরুগম্ভীর সমুদ্রে। ভ্রমণ বিলাসী

নারী-পুরুষের অস্ফুট গুঞ্জন দূরে মিলাইয়া যায়। পদ্মা অরুণাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ তাহার প্রতীক্ষমাণ দৃষ্টি যেন হঠাৎ থামিয়া পড়ে। সমুদ্রের ধার দিয়া একটি অতি শীর্ণ মূর্তি তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে! অন্ধকারে অস্পষ্ট মুখটা দেখিতে পায় না, কিন্তু অনুভব করে, লোকটা যেন তাহাকে দেখিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পদ্মা বহুকাল পূর্বের এক পরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠে।

—পদ্মা না?

দাড়ি ভরা মুখের আড়াল হইতে একজোড়া অতিতীক্ষ্ণ চোখ জ্বলজ্বল করে। পদ্মা এতক্ষণে চিনিতে পারে—তাহাদের রূপসীর সেই রথীন্দ্রমাস্টার!

মাস্টারমশাই! বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে পদ্মা। যেন সেই লাল পদ্মগুচ্ছ হাতে ছোট পদ্মা ঝলমল করিয়া উঠে এই গম্ভীর বেলাভূমিতে। যেন সেই শিশু বালিকা অবাক আনন্দে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে। রথীন্দ্র মুহূর্তের জন্য কি চিন্তা করিয়া নিঃশব্দে পদ্মার পাশে বসে। মৃদুস্বরে কথা শুরু করে। দীর্ঘ কাহিনীর অতি সংক্ষিপ্তসার। পদ্মা যেন কতদূর হইতে শুনিতেছে রহস্যময় ভয়ঙ্কর এক গোপন কাহিনী! তাহাদের রূপসী গ্রামের সেই মাস্টারমশাই সুকল্যাণদের দলের রথীন্দ্র ব্যানার্জী। জাপান ফেরতা, বার্মা ফেরতা বঙ্গোপসাগরের পথে লাইফ বোটে ভাসিয়া আসা এক অতি মানুষের সম্মুখীন পদ্মা এই সমুদ্রতটে। নিশ্চল মুহূর্তগুলি স্তব্ধ বালুকণিকাতে যেন আটকাইয়া গিয়াছে।

পদ্মা শোনে তাহার সম্মুখের সেই অতি মানুষটি তাহারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। তিনদিনের অনাহারী। পদ্মা মনে একটু চিন্তা করে। সুকল্যাণের বোন্ সে, রথীন্দ্রমাস্টারের প্রিয় ছাত্রী সে, কিন্তু অরুণাভের স্ত্রীও সে।

—ভয়ঙ্কর ক্ষিধে পেয়েছে পদ্মা। গত তিনদিনে এক বেলা খাওয়াও মেলে নি সমুদ্রের লোনা জল ছাড়া!

অনতিদূরে অরুণাভকে দেখা যাইতেছে। তাহারই আশ্রয়প্রার্থী তাহারই প্রিয় শিক্ষক, অভুক্ত থাকিয়া ফিরিয়া যাইবে অনিশ্চিত পথের নিশ্চিত বিপদের মুখে? একমুহূর্তে দুঃসাহসিকতায় মরিয়া হইয়া উঠে পদ্মা। অরুণাভ আসিয়া পড়ে। পদ্মা পরিচয় করিয়ে দেয়, আমার ছোটবেলার মাস্টারমশাই। কোনারক থেকে বেরিয়ে ছিলেন পুরী দেখতে। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় এখন ফেরা মুস্কিল। তাই আমাদের ওখানে রাতটা থেকে যেতে বললাম। ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালায় পদ্মা। টেবিলের উপর হাতে আঁকা কাস্তে হাতুড়ির ছবি। জনযুদ্ধ পিপলস ওয়ার দুই এক কপি এলোমেলো ছড়ান। চোখের পলকে তীক্ষ্ণ চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায় রথীন্দ্রমাস্টারের। দাড়িতে ঢাকা রুক্ষ মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠে, আবার নিমেষে সামলাইয়া লয় পলাতক আশ্রয়প্রার্থী। অরুণাভের লক্ষ্য এড়ায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে সে রাতের অতিথিকে। কি সন্দেহ যেন ঘন হইয়া উঠে চোখে! রথীন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না। পদ্মা খাবার লইয়া আসে। তাহার চোখে স্নেহ ঝরে, আতঙ্কও ঝরে। একটা রোমাঞ্চকর নীরব উত্তেজনায় সামনে আসিয়া বসে সে।

অরুণাভ উঠিয়া যায়। রথীন্দ্র পদ্মার দিকে সমগ্র দৃষ্টিতে তাকায়। পদ্মা তাহার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া মৃদুস্বরে বলে, ভয় নেই মাস্টারমশাই। একজন বিপ্লবী যোদ্ধার প্রাণের মূল্য কত তা জানে পদ্মা।

রথীন্দ্র কথা বলে এতক্ষণে, আগে বলতে হয় বোকা মেয়ে।

—তা হলে কি আপনি আসতেন?

—আসতাম—না এসে উপায় ছিল না!

অরুণাভ ঘরে ঢুকিলে রথীন্দ্র বলে, টের তো পেয়েছই। আমার স্নেহের পাত্রীর জীবনের বড় বন্ধু তুমি। তাই তোমার আশ্রয় চাইছি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।

অরুণাভ রাতে শুইতে গিয়া পদ্মার হাতটা মৃদুভাবে ধরে। কোমলস্বরে বলে, কেন মিছে কথা বলতে গেলে পদ্মা?—পদ্মা

উত্তর দেয়, তোমাদের নীতি অনুসারে উনি তো তোমার শত্রুই নিশ্চয়। তাই সংশয় ছিল—আশ্রয় দানের মর্যাদা তুমি রাখবে কিনা।

অরুণাভ ব্যথিত হয়। উত্তর দেয়, ঠিকই নীতির দিক থেকে এঁদের চাইতে বড় শত্রু আজ আর কেউ নেই আমাদের। কিন্তু নীতিবোধও কেবল অঙ্কের ফরমুলা নয়। নীতির উপরেও আরেকটা জিনিস আছে, সেটা মানুষের শুভবুদ্ধি।

একটু চুপ থাকিয়া আবার বলে, বছরের পর বছর ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েই আজ মুক্তিপথে বেরিয়েছে এরা। আমরাও তাই। মতের বিভেদে আজ দুইজনে দুই শিবিরে গেলেও আমাদের দুজনেরই ভিতরের নিষ্পেষিত মূর্তিটি একই— অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সুরটি একই। তাই এদের আশ্রয় দিতে আমরা পারি। আমাদেরও যে প্রাণ কাঁদে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাতে এদের নির্যাতন দেখে, সেটা কেন ভাবলে না পদ্মা। আজ ভুল পথে গিয়েছে বলেই ত এরা আমাদের শত্রুর পথ সুগম করেছে।

অরুণাভ শুইয়া শুইয়া ভাবে দেশের অহিত চায় না রথীন্দ্রমাষ্টারও। জনগণের কল্যাণ কামনা করে বলেইত এ জটিলতম জীবনের প্রতিজ্ঞা তার চোখে। তবু জনকল্যাণের পথে চলছে না তারা। কিন্তু কেন? পরাধীন দেশ বলেইত? ব্রিটিশের উপনিবেশ বলেইত আজ এ ভ্রান্ত পথ ধরেছে এরা। এ এক জটিলতা উঠেছে দেশভক্তদের মাঝে। আজ স্বাধীন দেশ হলে তারা কি মিলিতভাবেই প্রতিরোধ জানাত না ফ্যাসিস্ট জাপানকে? অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি ভারতবর্ষের।

দুপুর বেলা পদ্মার কাছে গল্প করে রথীন্দ্র। যুদ্ধের গল্প! পদ্মার চোখে ভাসিয়া চলিয়াছে দূর ভারত মহাসাগরের গম্ভীর গর্জন, আড়ালে জাপানী কনভয়, মারণাস্ত্রবাহী বম্বার ফাইটার, সাবমেরিন, গুপ্তচরের নিঃশব্দ নৈশযাত্রা—কুচকাওয়াজরত নিঃস্বার্থ নির্ভীক—ভারতের মুক্তিফৌজ।

তাহাদের রণ দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে পর্বত শিখরে, পাহাড়ী উপত্যকায় পার্বত্য নদীতটে। সুদীর্ঘ বনান্তরালে পাহাড়ী টিলার

ছায়ায় ছায়ায় অগণিত তাঁবু, ছাউনি, বিশ্রামরত সৈনিকদল। ভারতীয় শিবিরে উড়িতেছে—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা।

তাঁবুতে তাঁবুতে নিস্তব্ধ প্রান্তরে ট্রান্‌সমিটারের কণ্ঠহীন কণ্ঠে গম্ভীর সুরে গর্জিয়া কাঁপিয়া উঠে নেতাজীর বাণী। সে উদাত্ত কণ্ঠস্বর শিলাস্তরে স্তরে কাঁপিয়া যায় দূর বাতাসে।

উত্তেজনায় বুক কাঁপে পদ্মার। চোখের পলক পড়ে না। লাজুক বাঙ্গালী কন্যার মনে বিপ্লবের সুর বুনিয়া চলেন রথীন্দ্র এই অলস মধ্যাহ্নে।

প্রকাশের বিবাহ হইয়াছে একবছর হইল। কিন্তু এ পর্যন্ত ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে দেখা হয় নাই পদ্মার। প্রকাশের মতের অপেক্ষা না করিয়াই নগেন্দ্রশেখর পদ্মাকে বিবাহে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। কিন্তু পদ্মা আসে নাই। সে বিবাহে উপস্থিত থাকিলে সমাজের কেহ তাহাদের বাড়িতে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে না—পদ্মার কানেও যায় এ সংবাদ। তাছাড়া তাহার মা কিংবা দাদা কেহই তাহাকে যাইতে লেখে নাই। সে অভিমানও ছিল। তাই জ্যেঠামণিকে তাঁহার অনুরোধ রাখিতে না পাবায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া চিঠির উত্তর দেয়।

তারাসুন্দরী আক্ষেপ করেন—বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। সে যে আসবে না জানতাম।

তবু বধূ বরণের কুলা-পিঁড়ি চিত্রিত করিতে করিতে দুঃখ করিয়া বলেন, পদ্মা আসলে এসব অমন আমাদের করতে হত না।

সুহাসিনী নিজের মোতি মুক্তার অলঙ্কার দিয়া বধূকে আশীর্বাদ করে।

বিবাহ উৎসব মিটিয়া গেলে সুহাসিনী বধূকে লইয়া কলিকাতায় নূতন সংসার পাতে। নববধূ ঊর্মিলা পছন্দ করিয়া হাল-ফ্যাসানের ফারনিচার অর্ডার দিয়া আসে দোকানে। জানালায় সরু নেটের পর্দা ঝুলায়। দামী দামী কাচের বাসন পিয়ালা-পিরিচে ঠাসা হয় নূতন কেনা ডিনার কাবার্ড। খাবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে ক্রিসেন-থিমামের গুচ্ছ গৃহলক্ষ্মীর প্রাচুর্যকে সম্ভাষণ জানায়।

কিন্তু বৎসরান্তেই সুহাসিনীর ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। এ তাহার স্বামীর সংসার নয়, পুত্রের সংসার—প্রতিপদে মর্মস্থলে আঘাত করে এ রূঢ় সত্য। স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও স্বাধীনতা নাই এ সংসারে, টের পায় সুহাসিনী।

চিত্রিতা ও প্রসাদ দুইজনেই কলেজে পড়িতেছে দাদার কাছে থাকিয়া। তাহার সন্তানদের এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যেন তাহাকেই অনুগ্রহিতারূপে থাকিতে হইতেছে আজ প্রথম সন্তানের কাছে। এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ তাহার মাতাকে জানাইয়া দেয়, এক জনের সন্তানকে আরেকজনের প্রতিপালন করার এ জঘন্য প্রথা নাকি একমাত্র এ দেশেই আছে। শিউরিয়া উঠেন সুহাসিনী। বাহিরের আদব কায়দায় বিদেশী অনুকরণ করিলেও তাহাদের মনের ভিত্তিতে পৌঁছাইতে পারে নাই ইয়োরোপের শিকড়। আজ এমন করিয়া অপদস্ত হইবে যে তাহার সন্তানের কাছে, এ যে তাহার কল্পনারও অগোচর। ছোট বোন ছোট ভাইকেও গলগ্রহ মনে করিতেছে নাকি আজ প্রকাশ। এক উপায়হীন অসহায়তায় একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায় সুহাসিনী। প্রকাশের ব্যবসার উন্নতির জন্য তাহার সব কিছুই সে ঢালিয়া দিয়াছে। হয়তো প্রকাশ উহা তাহার অধিকার হিসেবেই গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপর প্রসাদ স্বদেশী করে দাদার মতের অপেক্ষা না করিয়াই, প্রকাশ উহা পছন্দ করে না। দায়িত্ব নিতে হলে সম্পূর্ণভাবেই নিতে চাই! না হলে যার যার ব্যবস্থা সেই যেন নিজে করে নেয়।

প্রসাদের মনে কম বয়সের উত্তেজনা। সেও উত্তর দেয়, তার অর্থ, —নিজের মতামত বলে কিছু থাকতে পারবে না।

থাকবে না কেন? তবে আমার বাড়িতে আমার মতটাই সর্ব প্রথম চালু হবে।

বলতে চাইছ, তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে তোমার বাড়িতে থাকা চলবে না। আচ্ছা আমি অন্য জায়গায় থাকারই ব্যবস্থা করবো।

দিন দুইয়ের মধ্যেই প্রসাদ তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া আসে। সেই দিনই চলিয়া যাইবে সে। কিন্তু তাহার কথাবার্তা শুনিলে বোঝা সাধ্য নয়, ভাইয়ের সঙ্গে কোনও মতান্তর ঘটিয়াছে। দিব্যি খাওয়া দাওয়া করিয়া একটা ঘুম দেয়। 'বৌদি শেষ দিনের মত একটু আরামে ঘুমিয়ে নেই কি বল? যে যায়গাটা ঠিক করে এলাম, চিত্রিতা সে দুয়ার দিয়েই ঢুকতে পারবে না, যা একখানা দেহ করেছে ও। আর তুমি যদি বা ঢুকতে পার, গা বমি বমি করা মাথা ঘুরুনি সুরু হবে কয়েক মিনিটের মধ্যে।' প্রসাদ বৌদির সঙ্গে হাসি তামাসা করে। কিন্তু সুহাসিনী চোখের জল মোছে, প্রসাদ, চল্লিই তবে?

'তবে কি এখানে থেকে হিটলারের সৈন্য বনবো?'

প্রসাদ চা খাইয়াই চলিয়া যাইবে। চায়ের টেবিলে বসিয়া আবার দুরন্ত হইয়া উঠে, বা, চমৎকার টেবিলক্লথটা ত! তোমার হাতের বোনা নিশ্চয়।'

ঊর্মিলা খুশি হইয়া বলে, 'দেখো আবার চা ঢেলে শোধ করো না।'

'তা একটু শোধ করে যাইও না, তবু রোজ চা খেতে খেতে মনে পড়বে দেবর লক্ষ্মণকে।'

'এমনিতেই যথেষ্ট মনে পড়বে। দেবর লক্ষ্মণের পোস্টার লিখবার দৌরাত্মে কম জিনিস আর নষ্ট হয় নি আমার।'

প্রসাদ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

সুহাসিনী দিন দিনই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সেই তেজস্বিনী সুহাসিনীর আজ যেন নবজন্ম লাভ হইয়াছে। চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌয়ের সে সম্মানটুকু যুদ্ধের ঢেউয়ে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। যুদ্ধপূর্ব বিলাতী আদব কায়দায় শিক্ষিত সুহাসিনীও ম্লান হইয়া গিয়াছে যুদ্ধের যুগের কনট্রাকটার পত্নীর অন্তঃসার শূন্য আদব কায়দায়। এ যেন জীবনের আরেক পর্ব। এ নূতন অধ্যায়ে মানুষকে আর নিজেকে পালিশ করিয়াও রাখিতে হয় না। সুহাসিনী ছেলেকে বলে, 'পূজো আসছে, তোর জ্যেঠামণি জ্যেঠিমাকে কিছু টাকা পাঠালে হত ঠাকুরের ভোগ দিতে।'

প্রকাশ পরিষ্কার জবাব দেয়, 'ঐ ওল্ড স্কুল মাস্টারের কতকগুলি ইডিওলজী চরিতার্থ করতে টাকা নষ্ট না করে বরং একটা ছোট খাট টি পার্টি দিলে আমার কাজে আসবে টাকাটা।'

সুহাসিনী ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা বাহির হয় না মুখ দিয়া!

এক মুহূর্ত সময় নাই প্রকাশের একমাত্র রবিবার ছাড়া। সেই দিন রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলা হয়। ঊর্মিলা স্বামীর মন প্রসন্ন রাখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাসের কল দেয়।

সুহাসিনী ঘুমভরা চোখে রাতের খাবার লইয়া বসিয়া থাকে। সকলের খাওয়া হইয়া যায়—প্রসাদ ঘরে ঢোকে ঝড়ের মত। 'বাঃ বেশ সময় মত এসেছি। মায়ের হাতের পর চিত্ত হরণী পিঠা! খুব ভাল দিনে এসেছি ত।'

প্রসাদ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়ে। প্রকাশ গম্ভীর হইয়া থাকে। ঊর্মিলা তাকাইয়া বলে, 'যা চেহারা হয়েছে, আয়না দিয়ে দেখো মাঝে মাঝে।'

'তা আর হবে না।' এমন ভাল ভাল খাবারও মেলে না আব আয়নাও নাই যে চেহারাটা দেখেও হুঁশিয়ার হবো একটু। আজকের রাতটা কিন্তু এখানেই থাকবো, বৌদি। দেখো চিন্তা করে, না হলে এখনই বিদায় হই।'

রাত ভরিয়া মায়ের সঙ্গে গল্প করে প্রসাদ। মায়ের বিশীর্ণ চেহারা লক্ষ্য করিয়া বলে, 'এভাবে মরবে নাকি তুমি। তার থেকে দেশে চলে যাও।'

'দেশে যে যাব, তোর জ্যেঠামণির আয়ে তাদেরই সংসার যে কিভাবে চলছে এই বাজারে। সেই বোঝার উপর শাকের আঁটির ভার কি আর সইবে এ বুড়ো হাড়ে?'

তিন তলার ঘরে তখনও বাতি জ্বলিতেছে। 'সিদ্ধেশ্বর এসেছে দেখলাম।

গ্লাস ফ্যাক্টরীতে আমাদের ইউনিয়ানটা ভাঙ্গার মৎলবে এই সিদ্ধেশ্বর-

কেই লাগান হয়েছে। সাকরেদ জুটেছে কজন। সেই আমাদের গ্রামের ভূইমালী বাড়ির যমুনাকে মনে আছে। তার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল।

এদিকে রূপসী স্কুলের মালী সেই সূর্য আর তার ভাই প্রতাপ—খুব ভাল ওয়ারকার।' প্রসাদ রাত ভরিয়া কথা কয় মায়ের সঙ্গে। সুহাসিনীর কানে পৌঁছায় না। তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে—তাহার শ্বশুর গৃহের উঠান ভরা রৌদ্র। আজ নূতন চোখে স্বপ্ন দেখে সে গ্রামের। তাহার ভাশুর, দেবর, জা ও ননদ কেমন আছে তাহারা যে খোঁজও রাখে নাই এতকাল। আজ অনুতাপে পুড়িয়া মরে।

প্রসাদের আশংকা ঠিকই হয়। অনভ্যস্ত সুহাসিনীর দেহ এত অপ্রত্যাশিত মানসিক অশান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

প্রসাদ আসিয়া দিনরাত সেবা করে মায়ের। চিত্রিতার পরীক্ষা সামনে। সুহাসিনীর রোগের লক্ষণ খারাপের দিকেই চলে। প্রকাশ এক পরিচিত বড় ডাক্তার 'কল' দিয়া আনে। ডাক্তার ওষুধ আর পথ্যের লম্বা চার্ট লিখিয়া দিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসে। ঊর্মিলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ডাক্তার আসা অবধি শাশুড়ীর মাথার কাছে পাখা হাতে বসা। ডাক্তার চলিয়া যাইতেই চিত্রিতাকে ডাকিয়া বলে, 'তুমি এসে বস—আমার আবার একটা নিমন্ত্রণ আছে এক বন্ধুর বাড়িতে জলসায়।'

সুহাসিনী সারিয়া উঠে—কিন্তু মন আর জোড়া লাগে না।

ঊর্মিলার দিদিমা সস্নেহে নাতনীর গায়ে হাত বুলায়, 'কি চেহারাই হয়েছে। তা হবে না! চোটত আর কম গেল না শাশুড়ীর অসুখে। রোগীর সেবা যত্ন, তার উপর এত বড় এক সংসার ঘাড়ে। ও ত আর আজকালকার মেয়েদের মত না। দেওর, ননদ, শাশুড়ী-জ্যেঠশ্বশুর শাশুড়ী সব নিয়েই ঘর করতে হয়। জামায়ের উপরই ত সব নির্ভর। তোর পিশশাশুড়ী তো তোদের সংসারেই থাকে তাই না? দেওরও তো উপার্জন করে না শুনি। শ্বশুরও তো কিছু রেখে যায় নি। তার উপর বিয়ের যোগ্যি ননদ। ভাবনা কি কম জামাইয়ের।'

সুহাসিনী শোনে সবই। নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে মা হইয়া কিই বা বলিতে পারে সে কুটুম্বের কাছে। ভিতরটা পাথর চাপা হইয়া থাকে,

তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলার উপায় নাই। তাহার প্রথম সন্তান, তাহার প্রকাশ। মূক হইয়া গিয়াছে সে।

রাত্রি অনেক। পদ্মা কল্যানীদের বাড়িতে বসিয়া গোপন বেতার কেন্দ্র হইতে তাহাদের বীর নেতার বক্তৃতার শোনে। রহস্য পথে উধাও হওয়া শত সহস্র তরুণ প্রাণের বীর সেনাপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর গর্জিয়া উঠে ঘরের ভিতরে ঃ—

"ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় অভিশাপ মানুষের জীবনের আর কিছু নেই। একথা কখনও ভুলো না। একথা কখনও ভুলো না, অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোস করে চলার মত ঘৃণা পাপ আর কিছু নেই।—

দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া রেডিওর সামনে সবাই চেয়ারে বসে। নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। গভীর আশায় মন দিয়া শোনে বৃদ্ধ গৃহ-স্বামী, দূর বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসা প্রতিটি স্বর প্রতিটি ধ্বনি। বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চোখের তারায় জ্বলিয়া উঠে কিশোর পৌত্রের সেই রক্তাক্ত দেহখানা ; জীবনে ভুলিবার নয়। সে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে শীঘ্রই আসিতেছে এক বিপুল সেনাবাহিনী।

রেডিওতে সংবাদ শোনা হইয়া গেলে পদ্মা উঠিয়া পড়ে। কল্যানীর মেজদা কুমারেশ পদ্মার সঙ্গে আসে, 'চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।' পদ্মাদের বাড়ির প্রায় কাছাকাছি একটা পরিত্যক্ত জমি। উল্টোদিকে কতকগুলি লোহার দোকান। দোকানের ভিতরে এখনও লোহাপিটানোর শব্দ চলিতেছে। পদ্মা হঠাৎ কি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠে। গ্যাস পোস্টের আধ ঢাকা আলোর তলায় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে এক ভয়াবহ দৃশ্য। একটা কঙ্কালরূপী মৃত স্ত্রীলোকের নগ্ন বক্ষের উপর পড়িয়া আছে অর্ধমৃত একটি ক্ষুদ্র জীব। মানুষ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয়।

পদ্মা থমকাইয়া দাঁড়ায়। জীবনে এমন ভীষণ দৃশ্য আর সে দেখে নাই। দাঁত বাহির করা কঠিন চোয়ালটা দেখিয়া বোঝা দুঃসাধ্য উহা একটি স্ত্রীলোকের মূর্তি। যেন নরক হইতে এক প্রেতাত্মা উঠিয়া

আসিয়াছে। শিশুটর শেষ শ্বাস উঠিয়াছে। ছোট্ট দেহটুকুতে খিঁচুনি আরম্ভ হইয়াছে।

পদ্মা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'এখনও প্রাণ আছে।'

কুমারেশ দেরি করিতে চায় না। ধরা পড়িয়া যাইবার ভয় আছে। পলাতক সে। মৃদুস্বরে বলে, 'আর মিনিট তিন। এইতো আমাদের মিত্র শাসনের স্বরূপ।'

খোঁচাটা লক্ষ্য করে না পদ্মা। কিছু ভাবিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে সে এই মুহূর্তে। পদ্মা চোখ ফিরায়। এ দৃশ্য আর দেখা চলে না। তাড়াতাড়ি পা চালায়—মুক্ত বাতাস চাই। না হইলে তাহারও বুঝি নিঃশ্বাস আটকাইয়া যাইবে।

পথের আরেক প্রান্তে একটা সিপাহী টহল দিতেছে—কুমারেশ আরেকটা গলির ভিতর দিয়া ঢুকিয়া যায়।

পদ্মাদের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়াইয়া আস্তে কড়া নাড়ে। অরুণাভ আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দেয়। পদ্মার বিবর্ণ চোখমুখ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হয়। কি হয়েছে পদ্মা?

পদ্মা উত্তর দেয় না। শোবার ঘরে গিয়া আলো জ্বালায়। অরুণাভ লক্ষ্য করে, কি যেন গোপন করিতেছে পদ্মা। কি যেন করিতে চায়। মনে মনে ব্যথিত হয় সে। পদ্মা তাহার প্রেমের মূল্য কি এইভাবেই দিতেছে। তাহার নীতিকে, তাহার আদর্শকে অবিশ্বাস করিয়া। কিন্তু জবরদস্তি পছন্দ করে না সে। ভাবে, তাহার এ ভুল একদিন ভাঙবেই। দুয়ারটা বন্ধ করিয়া ঘরে চলিয়া আসে। পদ্মা শাড়ি বদলাইয়া অরুণাভের ঘরে আসিয়া দেখে, অরুণাভ কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে। ঘরে পা দিয়াই এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অনুভূতিতে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে সে। পরিচয় না জানিলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সশ্রদ্ধ চোখে দ্বিতীয় বার তাকায়। বুদ্ধিস্নিগ্ধ ললাটে সংস্কৃতির তীক্ষ্ণ ছাপ।

অরুণাভ পরিচয় করিয়া দেয়, এই যে পদ্মা, ইনি আমাদের বিশ্বদা। আর কোনও পরিচয় দেবার নিশ্চয়ই দরকার নেই!

বিশ্বরূপ অরুণাভের কথায় সন্দেহে পদ্মার দিকে চোখ তুলিয়া তাকায়। পদ্মা খুব সুন্দর নাম। অরুণাভের দিকে ফিরিয়া বলে, আমাদের দেশের মেয়েরা সত্যি যেন পদ্মা তুহিতা। পদ্মা কথাটা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে রান্নাঘরে চলিয়া আসে। রান্নাঘরে ঢুকিয়া বসে, অরুণাভ চা তৈয়ার করিয়াছে—ঘরময় ছড়ান পেয়ালা, পিরিচ দানি, চিনির কৌটা, তুধের কৌটা। চা করা ত নয়—যেন রান্নাঘরে কেহ ফুটবল খেলিয়া গিয়াছে।

খাইতে বসিয়া রান্নার সুখ্যাতি করে বিশ্বরূপ। অরুণাভেব দিকে তাকাইয়া বলে, খুব সুন্দর রান্না। কিন্তু এযে কয়েদীর জীবন।

পদ্মা পরিবেষণ করিতে করিতে মনে মনে চমকিয়া উঠে। এই মানুষটি মানুষের ব্যথার স্থানের এত গোপন সংবাদ জানিল কি করিয়া!

অরুণাভ হালকা সুরে উত্তর দেয়, এ কয়েদ জীবন তো স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছে।

বিশ্বরূপের মনে সায় দেয় না এ উক্তি। নিরুত্তরে কি একটু চিন্তা করিয়া আবার রাজনীতির আলোচনায় মন দেয়।

পদ্মার মনে হয় মানুষের দেহেব শিরা উপশিরায় যেমন রক্ত চলাচল করে, এদেরও মনের শিরা উপশিরায় সর্বক্ষণের জন্য রাজনীতির চিন্তা বহিয়া চলে। এ চিন্তা থামিয়া যাওয়া উহাদের মৃত্যুরই সমান

অরুণাভ খাওয়ার পর ছাদের ঘরখানায় একবার ঘুরিয়া যায়। এই ঘরখানাই একমাত্র দক্ষিণ খোলা ঘর। হাওয়ায় উডাইয়া লয়। পদ্মাকে ডাকিয়া বলে, এ ঘরেই বিশ্বদার থাকার ব্যবস্থা করছি। ঘরটা ছোট হলেও আলোবাতাস বেশি।

স্যানিটোরিয়ামে থাকাকালীন অবস্থায় বিশ্বরূপ মুক্তি পাইয়াছিল। তখন তাহার প্লুরেসিতে শয্যাশায়ী অবস্থা। একটু সুস্থ হইতে না হইতেই আবার কি সন্দেহে পুলিসের নজর বন্দী করিয়া রাখে তাহাকে। দীর্ঘকাল বাদে মুক্তি পাওয়ার পর এই প্রথম কলিকাতায়

ফিরিয়া আসে বিশ্বরূপ। পদ্মা শ্রদ্ধানম্র চোখে বারবার চাহিয়া দেখে বিশ্বরূপকে। এককালে সুদর্শন ছিল, বোঝা যায়।

অন্তর্দর্শী চোখ দুটিতেও প্রখর দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যটুকু সবার আগে চোখে পড়ে! কিন্তু আগের সেই সুদৃঢ় দেহ ভঙ্গি আর নেই। প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতা স্পর্শ করিয়াছে যেন আজই ললাটের ছায়ায়।

পদ্মা রান্নাঘরের কাজ সারিয়া বিশ্বরূপের জন্য বিছানা পাতিতে ঘরে ঢোকে। তক্তপোষ নাই, মেঝেতেই মাদুর বিছাইয়া তোষক পাতিয়া দেয়। বালিশে ওয়াড় পরাইতে পরাইতে একটু মন দিয়া শুনে বিশ্বরূপের কথা। দাগেস্তানের কোন এক কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। নিজের খ্যাতিতে তলিয়ে যেও না—আগে দাঁড়ানোর মতো মাটি দেখে নাও। কোন এক কবির এ উক্তি।

পদ্মা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে একটু চাহিয়া দেখে বক্তাকেও। কথার স্বরে এতটুকু অবজ্ঞা নাই।

বিশ্বরূপ কথা বলিতে বলিতে পদ্মাকে একটু দেখে। স্নেহস্নিগ্ধ বিছানায় চাদর পাতাটুকুও যেন কথা বলিতে বলিতে মন দিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লয়।

পদ্মার মনের তলায় আবার যেন অভিশাপ লইয়া দাঁড়ায় রাস্তার সেই ভীষণ দৃশ্য। রাতে শুতে গিয়া কোন গলির ভিতর হইতে কানে আসে—ফ্যান দাও ফ্যান দাও। সে করুণ আর্তনাদে অন্ধকার রাস্তাগুলি অভিশপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

পদ্মা তাহার বালিশের তলা হইতে ছোট একটি বে-আইনী পুস্তিকা বাহির করিয়া পাতা উল্টায়। চোখের সামনে ছোট ছোট অক্ষরগুলি স্মরণ করে, খাদ্য সংকট যতই জোরদার হইয়া উঠিবে, জনগণের জীবন যতই দুঃসহ হইয়া উঠিবে, ততই তাহারা মরিয়া হইয়া বিদ্রোহ করিবে। আর সত্যিকারের বিপ্লবীরা সেই বিদ্রোহকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইবেন।

কিন্তু পদ্মার মনের জিজ্ঞাসা এ যুক্তিতে তৃপ্ত হয় না। এই কঙ্কাল

মূর্তি মানুষগুলি এমন ভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইবে পৃথিবী হইতে। তাহা হইলে মানুষের শুভবুদ্ধির কি কোনই মূল্য নাই।

ঘুম আসে না চোখে। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরিয়া একটি করুণ বিলাপ ভাসিয়া আসিতেছে দূরের কোনও বাড়ির বন্ধ দুয়ারের নিকট হইতে।

মাগো, দুটি পায়ে পড়ি, দুটি খেতে দাও গো মা। সমস্ত রাজধানীর বাতাসে বাতাসে কাঁপিয়া বেড়াইতেছে যেন নিশীথিনীর অতি ক্রন্দন—মাগো দুটি খেতে দাওগো, একটু ফ্যান দাওগো মা।

পদ্মা শুইয়া শুইয়া ভাবে, জ্যান্ত মানুষগুলি এমন করিয়া না খাইয়া মরিতেছে, এ পাপের অংশীদার তো সেও। এ অপমৃত্যুর নিক্রিয় দর্শক হওয়াও পাপ। সমস্ত জীবন ভরিয়া এ পাপের গ্লানি বহন করিতে হইবে তাহাকে, তাহাতেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না কোনদিন।

এক সপ্তাহ পরে বিপাশা মাদ্রাজ হইতে ফেরে। অরুণাভের চিঠিতে বিশ্বরূপের মুক্তির সংবাদ আগেই পাইয়াছে। সারাদিনভরিয়া ঝড়ো হাওয়া বহিতেছে সেদিন। বিপাশা যেন সেই দুরন্ত হাওয়ার মতোই উড়াইয়া লওয়া আনন্দ সঙ্গে করিয়া ট্রেন হইতে নামিয়া আসে। মুঠিবদ্ধ হাত তুলিয়া লাল সেলাম জানায় বিশ্বরূপকে। হাতে দেয় একটি পাতায় ঢাকা কেয়াফুল! চোখেমুখে ফাটিয়া পড়িতেছে অভিনন্দন।

অরুণাভ বোনের কাঁধে হাত রাখে, আমার চিঠি পেয়েছিলি?

চিঠি পেয়েই তো এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

বিপাশা খুশি-ভরা কণ্ঠে উত্তর দেয়।

ঝড়ো হাওয়ায় শাসনে থাকতে চাহিতেছে না শাড়ির আঁচল, চুল উড়িতেছে কপাল ছাড়াইয়া—সব কিছু ছাড়াইয়া উড়িয়া চলিয়াছে এক জীবন্ত খুশি।

ট্যাক্সী হইতে নামিয়াই অরুণাভ কোন এক মিটিংএ চলিয়া যায়। বিপাশা স্নান করিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢোকে। পদ্মাকে বলে, রান্না করে করে চেহারাখানা তো রান্নাঘরের হাঁড়ির মতো করে তুলেছো। আমি যে কদিন আছি, তোমার ছুটি।

পদ্মা বিপাশার আনন্দ পরিপূর্ণ মুখখানার দিকে তাকাইয়া হাসে, তার চাইতে বলে দাও, ভদ্রলোকটি কি খেতে ভালবাসেন।

বিপাশা পদ্মার কথায় উত্তর দেয় না, তবু চোখভরা হাসিতে যেন আপনি ভাসিয়া উঠে উত্তর। উনানে কেটলি বসাইয়া দেয়। সারা চিবুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে স্নিগ্ধ আভা। তবু মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা ব্যথার আমেজ জমিয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ অপেক্ষার বুঝি শেষ অবসাদ।

বিপাশা চা লইয়া ছাদের ঘরে আসে। বিশ্বরূপ কি একখানা বই নিঝুম হইয়া পড়িতেছে। পায়ের কাছে মুখ তুলিয়া তাকায়। বিপাশা শুধু চোখভরা হাসি দিয়াই দ্বিতীয় বার অভিনন্দন জানায়—কথা বলে না। বিশ্বরূপ বইখানি বন্ধ করিয়া চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লয়। পাটির উপরে ছড়ানো বইগুলি একটু সরাইয়া দেয়। চোখে নম্র হাসি। বোস। পড়াতো শেষ হল, এখন কি করবে ঠিক করেছ? স্কুলের কাজ?

বিপাশা যেন অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, কাজ তো করতেই হবে। তবে কোথায় এখনও ঠিক করিনি।

চাহিয়া চাহিয়া কেবলই দেখিতেছে সে বিশ্বরূপকে। সেই ছোরা খেলা, লাঠিখেলা শেখানো বিশ্বদাকে কোথায়ও খুঁজিয়া পায় না সে বিশ্বরূপের মাঝে।

পুঁথিমগ্ন মন যেন বড় বেশি অধ্যয়নে পাণ্ডিত্যে কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে কিশোরী বিপাশার সেই প্রথম দ্রোণাচার্যকে।

বিশ্বরূপও চা খাইতে খাইতে স্নেহমাখা চোখে দেখে বিপাশাকে। এক সুন্দর লালিমায় স্নিগ্ধ দুটি কপালের গ্রীবা, অপটু বেশ বিন্যাস।

বিপাশা বিশ্বরূপের চোখ দিয়া নিজেকে দেখে একবার। হঠাৎ কিসে যেন চোখমুখ আরক্তিম করিয়া দিয়া যায়। এ অস্বস্তিকর অভিসারী রক্তাভাকে ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি কথার আশ্রয় নেয়। পেয়ালায় দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া দিয়া দুধচিনি মিশাইতে মিশাইতে বলে, ট্রেনে বসে বসে আপনার শেষ উপন্যাসখানা পড়লাম।

পড়ে মনে হল, এ উপন্যাসে সবই আছে, কিন্তু আসল জিনিসটিই নেই। এর চাইতে আপনার প্রথম বই 'দুরাশা' আমার অনেক বেশি ভাল লেগেছিল। অনেক বেশি প্রাণ ছিল তাতে।

বিশ্বরূপ ব্যথিত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, আসল জিনিসটি কি জিনিস শুনি ?

বিপাশা উত্তর দিবার আগেই পদ্মা লুচির রেকাব লইয়া ঘরে ঢোকে। বিশ্বরূপের জন্য খাগিনা তৈয়ার করিয়াছে।

বিপাশার প্রিয় খাবার।

বিপাশা রেকাবটা সামনে দিয়া দুষ্টামীর সুরে বলে, এই হচ্ছে আসল জিনিষ।

বিশ্বরূপ বোঝে, উত্তরটা এড়াইয়া গেল বিপাশা।

বিপাশা পদ্মাকে ডাক দেয়, কই তোমার চা কই ?

চা ছেড়ে দিয়েছি।

দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে ? কোয়ালিটিভ চেঞ্জ বুঝি আর হয় না আজকাল

বিশ্বরূপের সামনে এ প্রগল্‌ভতায় লজ্জা পায় পদ্মা। আস্তে মৃদু ধমক দেয়, কি যে বলছো, বিপাশা ?

বিশ্বরূপ বিপাশার কথাটা উপভোগ করে। পদ্মার সলাজ শাসন-টুকুও লক্ষ্য করে। বড় সুন্দর লাগে জীবনের রঙ মাখা এই হাসিটুকু। কিন্তু মনে মনে আর একবার চিন্তা করে তার বই সম্বন্ধে বিপাশার কঠিন মন্তব্য।

রাত্রে লিখিতে লিখিতে আবারও মনে পড়ে বিপাশার মন্তব্য।

বিপাশার কথাটা চিন্তা করিতে করিতে তাহার রাঙাইয়া উঠা মুখখানা অর্থময় হইয়া চোখের সামনে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। মনের প্রান্তে এক স্বতন্ত্র চিন্তার ছায়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসে। বিপাশা আজও ভুলিতে পারে নাই তাহাকে ? আজও তারই অপেক্ষায় সে। কিন্তু তাহার এই রুগ্ন স্বাস্থ্যের কথা কি বিপাশা অরুণাভের কাছে কখনো শোনে নাই।

বিশ্বরূপ কয়দিন ধরিয়াই বিপাশাকে লক্ষ্য করিতেছে।

বিপাশাকে স্নেহ করিত সে। কিন্তু সেই অঙ্কুরিত স্নেহের বীজ হইতে যে এমন ছায়াময় মহীরুহ সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে, জেলখানার কুঠুরীতে বসিয়া ভাবিতেও পারে নাই সে। আজ দূর অতীতে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া ভাবিতে চেষ্টা করে, বিপাশাকে কি কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছিল সে। কোনও প্রেমের ইঙ্গিত।

না কি শুধুই রোমান্টিক কল্পনার ছবি সামনে রাখিয়া এতগুলি যৌবনোচ্ছল দিন রাত্রি পাড়ি দিয়া আসিয়াছে এমন স্রোতোধারার মত প্রাণশীলা মেয়ে

বিশ্বরূপ ভাবিয়া পায় না, কেমন করিয়া বিপাশাকে জানায় তাহার অক্ষমতার কথা। সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অত্যাচারে শুধু স্বাস্থ্যই তাহার ভগ্ন-জীর্ণ নয়, তাহার জীবনের বাসর ঘরকেও পুড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে এ অসাম্য বাস্তব। চতুষ্পার্শ্বের এই শত শত মৃত্যুমুখী যৌবন শৃঙ্খলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই, সুখ নেই।

এই কর্কশ বাস্তব তাহাকে চক্ষুষ্মান করিয়া তুলিয়াছে। সে চোখে স্বপ্ন দেখিবার অবসর নাই। জীবনের সামনে একমাত্র তপস্যা —সে তপস্যা সাম্যবাদের

তবু এই ইস্পাতশাণিত মনের কোণে কোণে কোমল বেদনা অনুভব করে। কেবলই মনে হইতেছে, বিপাশাকে কেমন করিয়া বুঝাইবে সে। তাহার এ রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণা বুঝিবার পক্ষে এখনও বড় ছোট রহিয়াছে বিপাশা।

বিপাশা পদ্মাকে বলে, একটা ভাল ছবি এসেছে—গর্কির বাল্য-কাল। চল দেখে আসি। গর্কির জীবনীর নামে পদ্মা একবাক্যে রাজী হয়।

আসিয়া দেখে, কমরেডরা আর কেহ বাদ নাই। পদ্মাকে দেখিয়া এক পরিচিত পুরোনো কমরেড বলে, কই আপনাকে আর আজ-কাল মিটিং-এ দেখি না।

বিপাশা ঠাট্টার সুরে উত্তর দেয়, উনি এখনও দোটানায় দুলছেন কিনা। পদ্মা মৃদুভাবে হাসে—কথা বলে না। বিপাশাকে ইসারায়

কাহাকে দেখায়। বিপাশা তাকাইয়া দেখে, ঊর্মিলা একজন প্রগতিশীল লেখকের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছে ছবিটার। আমিও এবার নিয়ে তিনবার দেখছি। এমন চমৎকার বই। এ দেখে মনে হচ্ছে, আর্টের কত বড় একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে।

লেখক বন্ধুটি খুশি হইয়া সমর্থন করে কথাটা।

ঊর্মিলাকে ভালভাবেই চেনে বিপাশা।

মনে মনে একটু হাসে। প্রগতি আর্টের সমঝদার হতে না পারলে বর্তমান দুনিয়ায় চলবার আবরণে ছিদ্র থেকে যায়। ঊর্মিলাও বুঝতে পেরেছে তা। ঊর্মিলার লালপাড় সাদা শাড়িখানায় চোখ বুলায় বিপাশা। লেখক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে এলে হয় তো চটকদার সাজে সাজলে চলে না—বাঙালী লক্ষ্মী-শ্রী মূর্তিটি ধরানো চাইত লেখকের চোখে।

সঙ্গে আসতো যদি কোন বিজনেসম্যান—ঊর্মিলাও দেখাতে জানতো ত্রুটিহীন সাজসজ্জা। সেই ভাগ্যবানের কোম্পানিতে ছোটখাট একটি শেয়ার কিনবার যোগ্যতা আছে কি না তার স্বামীর।

প্রেক্ষাগৃহে দুয়ার খুলিয়া যায়।

ছবি দেখিয়া দুই বন্ধু হাঁটে পাশাপাশি। পদ্মা আচ্ছন্ন হইয়া আছে নিজের ভিতরে। কিন্তু গম্ভীর জীবন-ছবির ভাবাচ্ছন্ন রেশটুকু লাগিয়া আছে চোখেমুখে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের জনবিরল রাস্তা।

রাস্তার মৌন ভঙ্গ করিয়া বছর এগার বারোর একটি বিড়ি হাতে অপরিচ্ছন্ন ছেলে পাশ কাটাইয়া যায়। মৃদু মন্তব্য কানে আসে, একটা চুমো দিবি?

বিপাশা হাসিয়া ফেলে, আয় তো কাছে। চট করিয়া একটির হাত ধরিয়া ফেলে। বাকি সব পালাইয়া যায়। ছেলেটির ভয়ে মুখ শুকাইয়া উঠে, আমি না। ঐ ওরা বলছিল। পালাইবার জন্য হাতটা টানিতে থাকে।

খবরদার হাত ছাড়াবি না। চল তোর বাড়িতে। বিপাশা গম্ভীর ধমকে বলে।

আমার ত বাড়ি নাই।

তবে কোথায় থাকিস সারাদিন?

ছেলেটি আর উত্তর দেয় না। একেবারে নিরুত্তর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিপাশা। জবাব নাই। বিপাশা বলে, চল তবে আমাদের বাড়িতেই। সেখানেই থাকবি। ছেলেটার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে। ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।

পদ্মা স্নেহের সুরে বলে, ভয় নেই। কিছু বলবে না তোকে কেউ। নাম কি তোর?

পচু!

বাড়ি আসিয়া একটা পুরান কাপড় আর সাবান দিয়া বলে, কলতলা থেকে বেশ করে স্নান করে আয়। তারপর খেতে দেবো।

পচুকে সারাসন্ধ্যা নজর বন্দী করিয়া রাখা হয়। আস্তে আস্তে তাহার ভয় কাটিয়া যায়। বহুদিন পর ভরপেটে আহার মিলিয়াছে। খাওয়ার পর মেঝের উপরই ঘুমাইয়া পড়ে।

পদ্মা আসিয়া একটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া যায় ঘুমন্ত পচুকে। থাকিয়া থাকিয়া শিশু গর্কির মুখখানা ভাসিয়া উঠে মনে। পরের দিন গল্পে গল্পে পচুর পরিচয় বাহির করে পদ্মা।

পচুর বাবা জোগান খাটিত গ্রামে, গেল আকালের বছর তাহারা সহরে আসে। তাহার বাবা ও আরও দুইটি ভাই বোন না খাইয়া মারা গিয়াছে। মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাকে রাস্তায় একা ফেলিয়া। সেই হইতে সে ঐ ছেলেদের সঙ্গে কখনও ভিক্ষা করিয়া, কখনও চুরি করিয়া খাবার জুটাইয়াছে। রাত্রিতে বাড়ির রোয়াকে রোয়াকে ঘুমাইত এতকাল।

পদ্মা চমকিয়া উঠে, এমন মাও হয়?

বিপাশা উত্তর দেয়, সভ্যতার উপর দিয়ে যুদ্ধের রোলার চলেছে, সভ্যতার হাঁড়-পাঁজর সব গুঁড়িয়ে যাবে নয় তো কি?

পদ্মা পচুর জন্য শ্লেট, পেনসিল, বর্ণমালা কিনিয়া আনে।

অরুণাভ ঠাট্টার সুরে বলে, বিপাশা, তোর ছাত্রের বিদ্যে যে

সমস্ত দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটে বের হচ্ছে। যেদিকে তাকাই দেওয়ালের গায়ে শুধু অ, আ, ক, খ, এই দেখছি।

একখানা লেনিনের ছবি হাতে বিপাশা বিশ্বরূপের ঘরে ঢোকে। ছবিখানা কোথা হোতে জোগাড় করিয়াছে সে। দেওয়ালের উঁচু পেরেকটায় হাত যায় না—বিশ্বরূপ উঠিয়া বলে, দাও আমি টাঙিয়ে দিচ্ছি।

বিশ্বরূপ ফোটোখানা টাঙ্গাইয়া আসিয়া দুষ্টুমীর সুরে বলে, এত দিনেও কাউকে ভালবাসতে পারলে না বিপাশা? এত ভাল ভাল ছেলে বাইরে থাকতে?

বিপাশা কথা শেষ করিতে না দিয়া একই সুরে জিজ্ঞাসা করে, বাইরে কাউকে ভালবাসলে কি সত্যি খুশি হতেন আপনি?

বিশ্বরূপ উত্তর দেয়, সত্যি খুশি হতাম, বিপাশা। এভাবে তোমার জীবনকে অপূর্ণ রাখায় খুশি হতে পারিনি আমি। তোমার এই সুন্দর প্রাণনির্ঝর চোরাবালিতে শেষ হয়ে যায়, আমি তা চাইনা।

বিপাশার বুকের ভিতরে কে যেন এক অপ্রত্যাশিত চাবুক মারে—একবিন্দু রহস্য নাই সে চোখে। কণ্ঠস্বরে সুচিন্তিত প্রত্যাখান। মুখ নীচু করে বিপাশা। জীবনের এতবড় লজ্জার মুখোমুখী হয় নাই সে। তবু চোখে জল আসে। এমন কঠিন নির্মম মানুষের জন্য মুহূর্ত গুনিয়া গুনিয়া এত দীর্ঘ বছর পাড়ি দিয়াছে সে। বিশ্বরূপ অশ্রুসিক্ত সে আঁখিপল্লব লক্ষ্য করিয়া বেদনা বোধ করে। উঠিয়া আসিয়া স্নেহস্পর্শ করে কাঁধে।

বিপাশা, আমাকে ভুল বুঝো না। আমার রুগ্ন স্বাস্থ্যের কথা তো তুমি জান। মানুষের জীবনের একটা সামাজিক দিকও আছে। তার সামাজিক দায়িত্ব উপেক্ষা করার নয়। শুধু ব্যক্তিগত সুখের জন্যও এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে সমাজের অকল্যাণ হয়।

বিপাশা বোঝে এ শুধু যুক্তির শৃঙ্খল। আর কিছু নয়!

সে যদি জানিত, এ কঠিন যুক্তির আড়ালে দাঁড়াবার মত এতটুকু মাটিও রহিয়াছে, বাকী জীবন মুখ উঁচু করিয়াই চলিতে পারিত সে।

তীরবিদ্ধ পশুর মত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে সে! নিজের ঘরে আসিয়া নিজেকে কান্নার আশ্রয়ে সঁপিয়া দেয়। বার

বার নিজেকে শু একই প্রশ্ন করে, এত বড় ভুল কি করিয়া করিল সে ? কিন্তু উত্তর খুঁজিয়া পায় না। সারা দুপুর লুকাইয়া কাঁদে।

একটা অসহ্য জ্বালায় ভিতরটা জ্বলিয়া যায়। তবু এক বিন্দু অভিযোগ জানায় না সে কাহারও কাছেই। এক দুর্বার কর্মস্রোতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ভাসাইয়া দেয়। আবার সেই বস্তিতে বস্তিতে ঘোরা দুর্বার বিপাশা !

কিন্তু বিপাশার এই উচ্ছল কর্মনেশার আড়ালেও ঠোঁটের কোণায় বিদ্রূপ হাসির কণাটুকু অরুণাভের নজর এড়ায় না। বিপাশাকে বুঝিতে না দিয়াও লক্ষ্য করে সে বিপাশার ভিতরের এই ঝড়ে দুমড়ানো মূর্তিখানি। ব্যাপারটা অনুমান করে।

বিশ্বরূপের আর একখানা বই ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। অরুণাভ পদ্মাকে বলে, বিশ্বদার এ বইটার প্রুফগুলি তোমাকেই দেখে দিতে হবে।

সারাদিনের ক্লান্ত দেহ ইজি চেয়ারটায় এলাইয়া দেয় সে। শুইয়া শুইয়া বিপাশার কথাই ভাবে। জীবনকে উপভোগ করাই যার জীবনের ধর্ম, তার পক্ষে এ যে কতখানি দুঃসহ দুঃখ, হৃদয়ঙ্গম করে অরুণাভ।

কয়দিন পরেই বিপাশা জানায়, সে সাঁওতাল পরগনায় একটা অরফেনেজ স্কুলে চাকরি ঠিক করিয়াছে। আর দুই দিন পরেই রওয়ানা হইবে।

বুকের ভিতর রক্ত ঝরিতেছে সারাদিনের কাজের আড়ালে, কখনও বা নিজেরও অলক্ষ্যে। কিন্তু সে কোণঠাসা বেদনার এতটুকু ছায়া পড়ে না চোখের আকাশে।

প্রসন্ন হাসি দিয়াই বিশ্বরূপের যত্ন করে বিপাশা।

যাইবার দিনে কোথা হইতে একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল পাড়িয়া আনিয়া ছাদের ঘরে রাখিয়া যায়। যেন তাহারই বুকের রক্তে রাঙা এ কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটিকে একটু দেখিয়া লইয়া বিপাশা হাল্কা সুরে বলে একদিন ছোরা খেলা শেখাতে গিয়ে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন, মনে পড়ে ?

বিশ্বরূপ চমকাইয়া বিপাশার মুখের দিকে তাকায়।

এ রক্তবর্ণ ফুলের উপহারের সঙ্গে সেই ঘটনার উল্লেখে যেন এক বিচিত্র বেদনাব সুতা দিয়া. গাঁঠ ছড়া বাঁধিয়া দিয়া যাইতেছে বিপাশা। বিপাশা যে তাহাকে কবে হইতে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ এই প্রথম জানিতে পারিয়া বিশ্বরূপ সেই অতীতের দিকে থমকিয়া তাকায়।

বিপাশা বিশ্বরূপের এই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসে। বড় করুণ, কিন্তু ক্ষমায় স্নিগ্ধ সে হাসি। মনে মনে বলে, গাছে ফুল ফুটলো না বলে গাছকে অপরাধী করা যায় না।

তবু চাহিয়া চাহিয়া দেখে বিপাশা, মহাকাব্যের বিশালতায় কোথায় হারাইয়া গিয়াছে গীতিকাব্যের মাধুরী। তাহারও জীবনের সুর এখন হইতে মহাকাব্যের সুরেই গাঁথা হইবে।

যাইবার মুহূর্তে বিপাশা তাহার বাক্সেব শাড়ি ব্লাউজের তল হইতে একটা ছোরা বাহির করিয়া আনে।

—দেখুন ত চিনতে পারেন কি না!

বিশ্বরূপের মনে পড়ে, তাহার নিকট হইতেই এ ছোবাখানা বিপাশা একদিন চাহিয়া লইয়াছিল। বিশ্বরূপ ছোরাটা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বিপাশার মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ রাখে। অনুরোধেব সুরে বলে, বিপাশা ছোরাটা আমাকে দিযে যাও।

বিপাশা মৃদু হাস্যে বলে, গুরুদক্ষিণা? হাসিব আড়ালে অশ্রু ছল ছল করে।

—ফিরিয়ে নেবেন জানতাম, তাই ওটা বের করে আনলাম। —মনে মনে বলে, নিষ্ঠুরতায় আপনি দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণাকেও হার মানাতে জানেন।

দুয়ারে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া। বিপাশা ছোরাটা বিশ্বরূপেব কাছে রাখিয়া আজ পা ছুঁইয়া প্রণাম করে। শেষ অশ্রু গোপন রাখাব জন্য তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া আসে।

বিশ্বরূপ যেন আজ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামিবার শক্তিটুকুও

হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবু ছোরাটাকে বালিশের তলায় রাখিয়া নীচে নামিয়া আসে।

অরুণাভ একাই চলিয়াছে বিপাশার সঙ্গে স্টেশনে।

বিশ্বরূপের চোখে স্মিত হাসি। মনে মনে বলে, প্রেয়সী রূপে গ্রহণ করতে পারলাম না তোমাকে। কিন্তু তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, বিপাশা।

বিপাশা চলিয়া গেলে বিশ্বরূপের লেখায় যেন ঝড় বহিয়া চলে। দিবারাত্রি লেখার মাঝে ডুবিয়া আছে। মাঝে মাঝে চোখের উপরের শিরাগুলি টান হইয়া উঠে কি একটা অস্পষ্ট ব্যথায়। বাতাসে ভাসিয়া আসে যেন কোন অশ্রুমতী কন্যার দীর্ঘশ্বাস। নিশ্বাসে টানিয়া টানিয়া গ্রহণ করে হিমস্তব্ধ রাত্রির গন্ধ। মোমবাতি পুড়িয়া শেষ হইতেছে। বিশ্বরূপ রাত ভরিয়া লিখিয়া চলিয়াছে—সেই দ্রুত কলম ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অতিকায় আদিম মানুষ উপলখণ্ডে ছায়া ফেলিয়া চলিয়াছে জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত্রির নৈঃশব্দ্যে।

সূর্য দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে কতকাল। আর কি সে দেশে ফিরিবে না। যমুনা টিপকল হইতে জল লইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে সূর্যের সাধের বাগিচা।

কলসী ভরিয়া জল উপছাইয়া পড়িয়া যায়, যমুনার খেয়াল নাই। তাহার চোখের তারাদ্বয় স্থির হইয়া থাকে দূরের বনরেখার দিকে। আগের সে চঞ্চলতা আর নাই। লক্ষ্যহীন অবলম্বনহীন জীবন। সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া আসে, তবু নূতন করিয়া সিন্দুরের টিপ পরার আগ্রহ নাই।

সূর্যের কথা আজও ভুলিতে পারে না যমুনা। নিজের ঘর ছাড়িয়া ভিটা ছাড়িয়া কেমন আছে সে কে জানে!

কলসী কাঁখে তুলিয়া অনিচ্ছুক পায়ে হাঁটে বাড়ির দিকে। জঙ্গলে ঢাকা অন্ধকার বাড়িটায় ঢুকিলে আরও যেন মনটা খাঁ খাঁ করে। এঘর ও ঘরের ভিটা খালি। একটা বছরের মধ্যে কি মরণই লাগিল গাঁয়ে। মড়কে ঘরকে ঘর খালি করিয়া দিয়া গিয়াছে। অথচ এই গ্রামেই নীল পূজার সময় কত অমোদই না হইয়াছে তাহাদের বাড়িতে। কত ভিন

গ্রামের দল আসিয়া রাত কাটাইয়া গিয়াছে উঠানে। ঢাকের শব্দে অন্ধকার রাত হইতে গ্রাম মাতিয়া উঠিত। কাক পাখিরা পর্যন্ত তটস্থ হইয়া যাইত ঢাকের শব্দে। আর আজ চালাহীন বেড়াহীন মাটির ভিটাগুলি শুধু উঠানের উপর উঁচু হইয়া আছে।

শুধু তাহার ঠাকুরমার ঘরখানি কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে এই এত বড় বাড়িটায়। যমুনা, তাহার ঠাকুরমা আর হারানীর ছেলেটা এই তিনটি মাত্র প্রাণী তাহারা। আর সবাই শ্মশান ঘাটে ছাইয়ের তলায়।

প্রতাপ কাকার বাড়িটার দিকে তাকান যায় না। গা ছমছম করে। আগাছা আর জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে ভিটাগুলি। বড় বড় গুইসাপগুলি দিনদুপুরে ভিটার উপর দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্ধকার বাঁশ ঝোপে কাঠ ঠোকরার একটানা শব্দে আরও যেন খাঁ খাঁ করে বাড়িটা।

সৌদামিনী একলা একলাই ঘোরে সূর্যদের খালি বাড়ির উঠানে। গরুর গামলাটা মাটি মাখা অবস্থায় কাত হইয়া পড়িয়া আছে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বুড়ী।

যমুনা স্কুলের মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটে। গরু চরাইবার মাঠে ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে—মাথার উপরে আকাশ। যমুনা নিরাসক্ত চোখে সামনে তাকায়। মাঠের শেষে কিসের যেন ভিড়। কে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জোরে জোরে কি বলিতেছে। বাতাসে চুলগুলি কপাল ছাড়াইয়া উড়িতেছে। প্রতিটি কথায় যেন দেহের সবটুকু জোর ঢালিয়া দিতেছে ছেলেটি।

বড় ভাল লাগে কেন জানি যমুনার আজ তার সুন্দর কথাগুলি। কথা বলার ধরনটিও বড় সুন্দর লাগে, সামনেই একটা লাল নিশান পোঁতা। হালকা নিশানটা দক্ষিণের উদ্দাম হাওয়ার টানে পত পত করিয়া উড়িতেছে।

দুই হাত দিয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লয় বক্তা।—যমুনা অবাক হইয়া দেখে। এক পা এক পা করিয়া সভার সম্মুখে আগাইয়া যায়। একটু দূরে দাঁড়াইয়া শুনিতে চেষ্টা করে, কি বলিতেছে মানুষটি এমন জোর দিয়া।

'আবার তোমরা গ্রামে ফিরে এস—ঘর বাঁধ, ঘর !—আবার বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা কর।'

যমুনার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গ্রামে ফিবিয়া আসিবে তবে সকলে। ধোপাবাড়ির, কুমারবাড়ির, মিঞাবাড়ির যে যে বিদেশে গিয়াছে সবাই ফিরিয়া আসিবে? তাহার সূর্যও ফিরিয়া আসিবে। প্রতাপ কাকা, সুন্দর বুড়ি—সকলেই? তার ছেলেটা কত বড় হইয়াছে এতদিনে। বুকের মধ্যে কাঁপুনি খেলিয়া যায় যমুনার।

যমুনা চমকিয়া উঠে সকলের চীৎকারে—'ইন ক্লাব জিন্দাবাদ।'

সবাই বলিতেছে ঐ কথাগুলি।—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' যমুনা অর্থ বোঝে না। তবু, বোঝে, হয় তো কল্যাণের কথাই বলিতেছে উহারা সবাই মিলিয়া একসঙ্গে। বক্তৃতা দেওয়া মানুষটির গায়ের শার্টটা ঘামে চুপসাইয়া গিয়াছে। এক গ্লাস জল চাহিতেছে সে।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে যেন চেঁচাইয়া বলে, 'যা এক গ্লাস জল লইয়া আয় দৌড়াইয়া।'

যমুনা কলসী লইয়া আগাইয়া যায়।

কলসী দেখিয়া একজন কৃষক সামনে আসে, 'জল আছে? এই বাবুরে একটু জল খাওয়াও দেখি।'

যমুনা কলসী হইতে জল ঢালিয়া দেয় সুন্দর মানুষটির হাতে। অঞ্জলি ভরিয়া জল খায়। যমুনা স্নেহের চোখে তাকাইয়া দেখে। মনে মনে ভাবে আহা কলিজাটা ঠাণ্ডা হউক ঠাণ্ডা জল খাইয়া। অমন চেঁচাইলে গলা শুকাইয়াই যায়।

জল খাওয়া শেষ হইলে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের বাড়ি বুঝি কাছেই। কে কে আছে বাড়িতে?' যমুনা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'ছিল তো অনেকেই—অকালে সবই গেছে।'

ছেলেটি খোঁজ নেয় খুঁটিনাটি সবই। তাহারা একটা হাসপাতাল করিবে গ্রামে। আবার আরেক গ্রামে যাইতে হইবে এখুনি। পুলের আর প্রান্তে নামিয়া যায় দেবতার মত মানুষটি।

কি সুন্দর উড়া উড়া ফুলগুলি। যমুনা তাকাইয়া থাকে আরও

কিছুক্ষণ—অলস হাতে কলসিটা তুলিয়া লয়। আবার সেই অন্ধকার ছায়ায় ঢাকা জনহীন ভিটার দিকে পা চালায় আস্তে আস্তে।

ঢাকা মেলে বাড়ী পৌঁছায় শশাঙ্ক—বাড়িতেই থাকবে সে এখন। আনন্দে উন্মাদ হইয়া উঠে নগেন্দ্রশেখর। রিলিফ কেন্দ্র খুলিবে তাহারা এই আশ্রমে।

তাহাদের কাজের পরিকল্পনা শুনিয়া খুশিতে অধীর হইয়া উঠে। দেখি দে ত একটু টিনের দুধ। চেখে দেখি। জীবনীশক্তি আছে ত এ কৌটার দুধে? দুধের ফ্যাক্টরীগুলিতে আবার চোরাপথ নেই ত? শশাংক লক্ষ্য করে অগ্রজের চোখেমুখে যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব। বোঝে, এ শুধু সুকল্যাণের জন্য নয়। তাহার অন্তরাত্মাতেই টান পড়িয়াছে আজ।

রাত্রিতে অগ্রজের সঙ্গে আলোচনা করে শশাংক। তাহাকেই রিলিফ কেন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট করিতে চায় তাহারা। নগেন্দ্রশেখর সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতই পড়াশুনা করিতেছে, ততই তাহার শ্রদ্ধা বাড়িতেছে। কিন্তু সে সমাজ ব্যবস্থার আড়ালের ফিলজফি মানিতে পারে না তাহার মন। নগেন্দ্রশেখর বলে, শ্রমের বন্ধনই একমাত্র বন্ধন, আমি তা মানতে পারি না। যীশু, বুদ্ধ, সক্রেটিস এঁরা কেহ আর শ্রমের বন্ধন জনহিত কাজে আসেন নি। বুদ্ধ রাজার ছেলে, রাজসিংহাসন ছেড়ে এসেছিল কি শ্রমের বন্ধনে? এসেছিল প্রেমের বন্ধনেই। সোভিয়েটেও এই ত্যাগ বরণ করেছে আজ ছেলে-মেয়েরা, এও প্রেমের দ্বারা। মানব প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তারা এত ত্যাগ স্বীকার করেছে। শুধু রুটির তাগিদে এ লড়াই নয়। মানবতার তাগিদেই এ লড়াই।

শশাঙ্ক উত্তর দেয়, প্রেমের বন্ধনেই বেরিয়ে এসেছেন মহানুভবরা ঠিকই। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিই তাঁদের টেনে এনেছে মাটির মানুষের কাছে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মত তাঁদের প্রেমেরও শিকড় রয়েছে মাটির তলায়ই।

সকালে বিকালে আশ্রমে দুধ বিতরণ আরম্ভ হয়, খিচুড়ি বিতরণ হয় দুপুরে। যমুনা ভোরে উঠিয়া বিলাতী গুঁড়া দুধের সঙ্গে ফুটন্ত

জল মিশাইয়া বালতি বালতি দুধ তৈরি করে যমুনা। পরম উৎসাহে দুধ ঢালিয়া দেয় সে তাদের ঘটিতে বাটিতে।

"আরও কিছুদিন আগে যদি আসিত এ দুধ, তাহা হইলে তাহাদের হারাণী, আপুছি, ক্ষ্যান্ত পিসি—কেহই হয়তো মরিত না।

যমুনা সযত্নে দুধ ঢালিয়া দেয়—সাবধানে বাড়ি যাইস্—ফ্যালাইয়া দিস না। এই কানাই, তোর মার লেইগা পিল্ লইয়া গেলি না ?

পিলের প্রতি আসক্তি নাই শিশুদের। তবু অমান্য করিতে সাহস পায় না দুধ-দেওয়া বাবুদের কথা। কিন্তু বুড়োদের আগ্রহ প্রচুর। হয়তো এ যাত্রা বাঁচিয়াও যাইতে পারে ঐ পিলের জোরেই। কাঁপিতে কাঁপিতে রোগজীর্ণ দেহটা টানিয়া তোলে, তারপর গ্লাসভর্তি জল লইয়া পিলগুলি গিলিয়া ফেলে। আয়ু বাড়াইবার পিল! ক্ষীণ আশার ঝিলিক খেলিয়া যায় মনে।

সূর্য মাথার উপর উঠিতে না উঠিতেই ভিড় জমে আশ্রমের প্রাঙ্গণে। ক্ষুধার্তের ভীড়। খিচুড়ির প্রত্যাশায়।

গ্রাম ছাড়িয়া যাহারা শহরে গিয়াছিল, তাহাদের জীবনের অবসান কি ভীষণ ভয়ঙ্কর ভাবে ঘটিয়াছে তাহা আর অজানা নাই কাহারও।

ভাতের অভাবে, চাউলের অভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে তাহারা। আর ওদিকে হাজার হাজার মণ চাউল পচা স্তূপে পরিণত হইয়াছে তালা-আঁটা গুদামে। সরল গ্রামবাসীরা অবাক হইয়া শোনে এ মর্মস্পর্শী সংবাদ। তাহাদের বুদ্ধিতে নাগাল পায় না, এ রহস্যের কূল কোথায়! চাউল পচিতেছে, তবু তাহারা চাউল পাইবে না! আশ্চর্য বিস্ময়!

ইউনিয়নের শ্রমিকরা কেহ কেহ পিকেট করিতেছে ফ্যাক্টরীর সামনে। প্রসাদ, সমীর আর তাহারই কলেজের ছাত্রী পার্বতী আসিয়াছে পিকেটারদের সঙ্গে।

মদন একটু দমিয়া যায় ভিতরে ভিতরে। মনে মনে ভাবে, এখন হইতেই টাল সামলানো দরকার। সন্ধ্যার পর কয়েকজন গুণ্ডা দোস্তকে ডাকিয়া কি পরামর্শ করে।

—কি ভাই পারবে ত ?

—এ সামান্য কাজ পারবো না ? তবে আর জেলখানায় লালটুপী পরেছিলাম কেন ?—সগর্বে উত্তর দেয় দাগী আসামী তিনু।

তিনু মদের আড্ডায় মদনের বড় দোস্ত। রাত ভরিয়া মদ খায় দুইজনে। ভোর বেলায় সূর্যের কাছে আসিয়া বলে, কি আজও কাজে কামাই নাকি ?

মুখ দিয়া মদের গন্ধ ভুরভুর করে। সূর্য বিরক্তিতে কথার জবাব দেয় না।

দুপুর বেলা মদনের সাকরেদ ফ্যাক্টরীতে ঢুকিতে যায়। পিকেটাররা বাধা দিতেই কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া যায়। একজন চড় বসায় এক পিকেটারের গালে। সেও পাল্টা চড় বসায়। তিনু প্রস্তুতই ছিল। সে একটা ইট তুলিয়া মারে সূর্যের কপালে। রক্তে ভাসিয়া যায় গেটের সামনেটা।

পার্বতীরও কপালে আঘাত লাগে। ইউনিয়ানে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়—মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—দেখিয়া লইবে তাহারাও।

প্রসাদ আসিয়া বুঝায় এ সবই দালালের চক্রান্ত। অরুণাভের পত্রিকাতে একটা রিপোর্ট দিয়া আসে। অরুণাভই নিউজ এডিটার। তাই সত্য রিপোর্টই ছাপান হয়।

অরুণাভ যে কাগজে কাজ করিতেছে সে কাগজের মালিক দত্তগুপ্ত, প্রকাশের শ্বশুরবাড়ীর লোক।

উর্মিলা পত্রিকাটা পড়িতে পড়িতে বলে—তোমাদের ফ্যাক্টরীর

কথাও উঠেছে, দেখেছো ? দালালের গুণ্ডা দিয়ে নাকি স্ট্রাইক ভাঙ্গার চেষ্টা চলেছে।

প্রকাশ পত্রিকাটায় চোখ বুলায়। অফিসে গিয়াই ফোন করে দত্তগুপ্তকে ঃ

—ইমারসন ওষুধের কোম্পানীর অ্যাড্‌ভারটাইজমেণ্টের বিষয়ে আমি কথা বলছি। হয়তো বছরে হাজার ইঞ্চি বিজ্ঞাপন পেতে পারেন আপনি। অবশ্য এখনও কথা পাকা হয় নি। আপনি আসবেন একদিন আমার এখানে। নমস্কার। ওঃ আরেকটা কথা। আপনার পত্রিকায় দেখলাম, আমাদের ফ্যাক্টরীর স্ট্রাইক সম্বন্ধে রিপোর্ট উঠেছে। কিন্তু ওটা তো ভুল খবর। আসল সংবাদ শ্রমিকে শ্রমিকেই সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে কাল। একজন শ্রমিক কাজ করতে চাইছিল, পিকেটাররা বাধা দেওয়ায় মারপিট হয়। আর সব কাগজে তো ঠিক বিবৃতি ছাপিয়েছে। আপনাদের রিপোর্টার সম্ভবতঃ নিজে রিপোর্ট দেয় নি।

দত্তগুপ্ত চিন্তিত হয়। মিঃ চৌধুরীকে চটাইলে ইমারসন কোম্পানির এত টাকার বিজ্ঞাপনটা হাতছাড়া হইয়া যায়। নিউজ এডিটারকে সে ফোন করে ঃ

—মিঃ চৌধুরীর গ্রাম-ফ্যাক্টরীর ঐ স্ট্রাইক সংক্রান্ত খবর আজকের রিপোর্টে ভুল বেরিয়েছে আমাদের কাগজে। ওটা আপনি একটু খোঁজ নেবেন।

অরুণাভ বলে—ভুল খবর তো নয়! আমি বিশেষ ভাবেই জানি, এ সংবাদ এতটুকু ভুল ছাপা হয় নি।

—তা যাই হোক। এর পর এদের ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে কিছু ছাপাতে হলে আমার সঙ্গে কনসাল্ট করবেন।

অরুণাভ অপমানিত বোধ করে। মনে মনে ভাবে, এই তো বর্তমান গণতন্ত্রের রূপ। রুলিংক্লাস জনমত প্রকাশের সব ইন্‌স্ট্রু-মেণ্টগুলি এভাবেই চেপে ধরে আছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে কি ভাবে ধনিক শ্রেণী সমস্ত পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করেছে তা তো চোখের

উপর আজ দেখছি, গণতন্ত্রের নামে কি প্রহসনই চলছে ছুনিয়াব্যাপি।

পত্রিকা অফিসে বসিয়া একটা রিপোর্ট লিখিতেছে অরুণাভ। বেয়ারা আসিয়া জানায়, ফোনে কে ডাকিতেছে। অরুণাভ উঠিয়া ফোন ধরে। বিশ্বরূপ ফোন করিতেছে—পদ্মার মেয়ে হইয়াছে হাসপাতালে। অরুণাভ রিসিভারটা রাখিয়া ঘরে আসিয়া আবার কলম লইয়া বসে। কিন্তু লেখা আর হয় না। অজানা বিস্ময়ের শিহরণ।—এ মুহূর্ত হইতে নূতন পরিচয় লাভ করিয়াছে সে। পিতা হইয়াছে সে একটি শিশুকন্যার।

একটু তাড়াতাড়িই বাড়ী ফেরে সে। বিশ্বরূপের চোখে খুশির অভিনন্দন। মৃহু তিরস্কার করে—কিছু আগে ব্যবস্থা কর নি। ওদিকে কন্যা তো আর বাইরের আলো না দেখে পারছিল না। অগত্যা ইমারজেন্সী কেস হিসেবে ভর্তি করা হল হাসপাতালে।

অরুণাভ লজ্জিত হয়।

বিশ্বরূপ জামা গায়ে দিয়া বলে—চল এবার, চারটে তো বাজে। শ্রীমতীকে লাল সেলাম দিয়ে এসো।

পটুও জামা পরিয়া হাজির হয়—সেও যাইবে। তিনজনে এক সঙ্গে যায় প্রসূতি হাসপাতালে।

ছোট্ট শিশুর খাটে ঘুমাইতেছে নরম একটি তুলতুলে শিশু। অরুণাভ যেন চোখ ফিরাইতে পারে না—স্নেহে কৌতুকে পুলকে ভেজা সে দৃষ্টি।

তাহারই প্রাণশক্তির অংশ ঐ সুন্দর শিশুটি।

পদ্মা শুইয়া আছে পার্শ্ববর্তী লোহার খাটে। একটু কৃশ দেখাইতেছে তাহাকে। তবু যেন চোখেমুখে আনন্দের জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

বিশ্বরূপের চোখে স্নেহ ঝরে।

পটু অরুণাভের হাতটা ধরিয়া আব্দারের সুরে বলে—দাদাবাবু আমি ওর নাম রাখলাম—পরী।

বিশ্বরূপ হাসে—সারা দুপুর রোদে পুড়ে রাস্তায় লাট্টু ঘুরালে কি হবে, কলকাতার মনটি ঠিক তাজা আছে।

ভিজিটারদের যাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। বিশ্বরূপ উঠিয়া দাঁড়ায়—চলি পদ্মা, ভালই ত আছ। আবার কাল আসবো।

পদ্মা হাসপাতাল হইতে বাড়ী আসিয়া দেখে, পটুর উন্নতি হইয়াছে প্রচুর। সারাদিনের মধ্যে একটিবারও বই ছোঁয় না—সম্ভবত খাতার পাতা দিয়া ঘুড়ি বানান হইয়াছে। সারাদিন রাস্তায় একপাল ছেলের সঙ্গে লাট্টু খেলে। ধূলামাখা শরীর, স্নান নাই, সময় মত খাওয়া নাই—নেশার মত পাইয়াছে যেন উহাকে লাট্টু খেলা।

এদিকে ঘরময় বিশৃঙ্খলা। অরুণাভের টেবিলের উপর জুতার কালি, অ্যাশট্রেতে খুচরা পয়সা, তাহার একখানা ব্লাউজ দিয়াই ঘর-মোছার কাজ চলিতেছে। সোপকেসে গায়ে মাখার তেল, তরকারির সাজিতে একরাশ ডিমের খোলা—

পদ্মা যেন আর তাকাইতে পারে না। পদ্মা আগুন হইয়া উঠে, —এমন অপদার্থ হলে এখানে থাকা চলবে না।

বিকেলবেলা অরুণাভ ঘরে ফিরিতেই পটু এক কাপ চা আনিয়া হাজির। অরুণাভ খুসি হইয়া বলে—এত সুবুদ্ধি আবার তোর কবে থেকে হোল ?

পটু সে কথায় কান না দিয়া বলে—দাদাবাবু, আমাদের পরীর জন্য একটা ঠেলাগাড়ী কিনে দিন।

—সর্বনাশ, তুই যে আমাকে ডুবাবি দেখছি। অত টাকা কোথায় পাব ?

—আপনার ব্যাগে ত অনেক টাকা আছে, আমি দেখেছি।

—ঐ টাকা দিয়ে পরীর গাড়ী কিনলে খাব কি ?

পটু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। পার্কে দেখিয়াছে সে, ছোট ছোট

বাচ্ছাদের প্যারামবুলেটারে ঠেলিয়া লইয়া যায়। সেই হইতে তাহারও শখ—পরীকে ওরকম একটা গাড়ীতে করিয়া ঠেলিবে সেও।

অরুণাভ পদ্মাকে সংবাদ দেয়, সুপ্রিয় কমলাদের কলেজে কাজ পাইয়াছে। কলেজের হোস্টেলে উঠিয়াছে সে।

—আমাদের এখানে উঠলো না কেন ?

পদ্মা কি একটু চিন্তা করিয়া সুপ্রিয়র সঙ্গে হোস্টেলে দেখা করিতে যায়। তেতলার উপর আলো বাতাসে ভরা একখানা পরিচ্ছন্ন ঘর। কাচের জানালা দিয়া বহু দূরের আকাশ দেখা যায়। মেঘে ভরা ভারী আকাশ। পদ্মা অভিযোগের সুরে বলে—অদ্ভুত মানুষ ত তুমি! এদ্দিন ধরে এসেছো, তাও একবার গেলে না দেখা করতে ?—পদ্মা বিছানার সুজনীটা একটু টান করিয়া লইয়া বসিয়া পড়ে।

সুপ্রিয় কৈফিয়তের সুরে বলে—এসেই এত কাজের চাপে পড়েছি—

পদ্মা কথা কাড়িয়া লইয়া ধমকের সুরে বলে—ভীতু কোথাকার। সময় পাও নি বলে যাও নি তুমি ? বললেই বিশ্বাস করবো ? না হয় প্রেমেই একটু পড়েছিলে, সে জন্যে এত কঠোর সাধনা ? হোস্টেলে থাকছো—কেন আমাদের বাড়ী কি অপরাধ করলো শুনি ?

পদ্মা বাধা দিয়া বলে—আরেক দিন এসে চা খাব। আজ চলি। দু ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছি। আমি গেলে বের হবেন তোমার অরুণদা।

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে—তাই নাকি—ছুটি মঞ্জুর করিয়ে বের হতে হয় নাকি আজকাল পদ্মাবতীর ?

সুপ্রিয় উঠিয়া দাঁড়ায়—একটু চা আনতে বলি।

—তাছাড়া উপায় কি ? একজন নূতন প্রাণী এসেছেন আমাদের মাঝে, জান না !

—এ মধুর সংবাদটা এতক্ষণ দাও নি ? অরুণদাও সেদিন বললো

না কিছু। খুসি হইয়া সেও বাহির হয় পদ্মার সঙ্গে—চল, আগে অরুণদাকে পাকড়াও করি।

রাস্তায় আসিয়া ট্রামলাইন পর্যন্ত আসিতেই বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে। জানালা-বন্ধ একটা দক্ষিণমুখী ট্রামের কাছে যাত্রীদের ভীড়।

বৃষ্টি ক্রমেই জোরে পড়িতে থাকে।

—মহা মুস্কিলে ফেললো ত ?

সুপ্রিয়র চোখ পড়ে তাহারই এক বন্ধুর প্রতি। একটা শৌখিন বর্ষাতি গায়ে ট্রামে উঠবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে সে যাত্রীদের পেছনে। সুপ্রিয় বন্ধুটির কাছে গিয়া বলে—এই বিমল, তোর ওয়াটারপ্রুফটা দিয়ে যা তো একটু। তুই তো যাবি ট্রামে, তোর আর ওটা লাগবে কিসে।

বন্ধুটি হাসিয়া বর্ষাতিটা তার হাতে তুলিয়া দেয়। সুপ্রিয়র স্বভাব জানে সে। ট্রাম ছাড়িয়া দেয়। সুপ্রিয় বিনা দ্বিধায় বর্ষাতিটা আনিয়া দেয় পদ্মাকে—নাও এটা গায়ে জড়িয়ে ফেল। অত ভেজা সইবে না শরীরে।

পদ্মা অবাক হইয়া যায় সুপ্রিয়র কাণ্ড দেখিয়া।—এভাবে খুলে আনলে একজনের গা থেকে! ওর কত দরকার ছিল।

সুপ্রিয় একটুও উদ্বিগ্ন না হইয়া বলে—ওর এসপ্লানেডে যেতে যেতে বৃষ্টি থেমে যাবে।

—কিন্তু একটা ওয়াটারপ্রুফে আর কি লাভ হল ? তুমিও তো—ভিজছো।

সুপ্রিয় কব্জিখানা দেখাইয়া বলে—এভরিথিং প্রুফ এ দেহ। এ সামান্য জলে কিচ্ছু আসে যাবে না।

বাড়ী আসিয়া পড়ে। পদ্মা মিনতির সুরে বলে, এবার দয়া করে ভেজা শার্টটি বদলে নাও আগে।

সুপ্রিয় মন দিয়া দেখে পদ্মার মেয়েকে, পরী নামটি দিয়েছেন যিনি, তাঁর দুরদৃষ্টি আছে বলতে হবে। পদ্মাবতীকে ছাড়াবে এ মেয়ে।

পদ্মা পটুকে ডাক দেয়। চায়ের জল বসাইতে বলে।

—উঁহু, শুধু একটু গরম জলে চলবে না। এদিকে শুনে যাও পটু।

সুপ্রিয় অরুণাভের ব্যাগ ঝাড়িয়া টাকা বাহির করে—মাত্র এক টাকা!

—দেখিস বাসে যাওয়ার পয়সা একটু রাখিস। —অরুণাভ ফিরিয়া তাকায়।

—এই অবস্থা টাকার থলির। নিজের ব্যাগটা তা হলে খুলতে হয়। এখন থেকে মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জমাতে থাক অরুণদা।

বাহিরে জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

পদ্মা লজ্জিত হইয়া বলে—ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার সাতপুরুষ উদ্ধার করছেন এখন।

—সাতপুরুষের উদ্ধারই তো করছে। আমার তো আর নয়। কাজেই খুশি বা অখুশি হওয়ার কি আছে আমার!

অরুণাভ শুনিয়া বলে, তোর আর স্বভাব কোনদিন শুধরাবে না।

সুপ্রিয়ের সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াই মনে হয়, ট্রাম-বাসের ঘড়-ঘড় শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙার চাইতে গ্রামের বাড়ীর পাখীর ডাক শুনিতে শুনিতে ঘুম ভাঙার মধুরতা অনেক বেশী। চরের এক মুসলমান মাতব্বরের বাড়ীতে কিছুকাল কাটাইয়া ছিল সে গোপন যুগে। ভোর রাত্রি হইতে মুরগীর ডাক শুরু হইত। ঘুম জড়ান মনের মধ্যে সেই কুক্কুরু কুঁ ডাক বেশ একটা অলস রেশ বুলাইয়া দিয়া যাইত। আর এখানে ঘুম ভাঙ্গিলেই মনে পড়ে কলেজের রুটিন।

কি একটু ভাবিয়া লইয়া সুপ্রিয় চা খাইয়াই বাহির হইয়া যায়। এবং বেশ বেলা করিয়া ঘরে ফেরে—দুই হাতে দুইটা হৃষ্টপুষ্ট মুরগী। মুরগী দুইটাকে লোহার খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া কিছু চাউল খাইতে দেয়। তারপর বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানিতে

টানিতে মনে মনে কল্পনা করে, কি ধরণের 'প্যাস্টোরাল' আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে আগামী ভোর হইতে তাহার খাটের তলায়। বিকেল বেলা খুশির সুরে গুন গুন করিতে করিতে বাহির হইয়া যায়।

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিয়া দেখে, মুরগী দুইটার একটাও নাই ঘরে। চাকরের নিকট খোঁজ লইয়া শোনে, সেই মুরগী দিয়া কাবাব রান্না হইতেছে পাশের ঘরে। পাশের ঘরে গিয়া করুণ চোখে তাকাইয়া দেখে, স্টোভের উপর এলুমিনিয়ামের পাত্রে ফুটিতেছে তাহার সখের প্রাণী দুইটি।

কলিগ বন্ধুটি খুসির সুরে বলে—পাকা দুই সের মাংস দুটো মুরগীতে। ডিমও ছিল। খুব টেষ্টফুল হবে।

সুপ্রিয় মনে মনে ভাবে, এ তো আর খাবার জন্য চালানী মুরগী নয়। দস্তুর মত ট্রেণে করে নিয়ে আসে গ্রাম্য মুরগী। সুপ্রিয় বন্ধুটির রান্নার উৎসাহ দেখিয়া কিছু আর বলিতে পারে না।

তিনতলার ঘরে শুইয়া শুইয়া যমুনার চরের আবহাওয়া উপভোগ করার এই ঐকান্তিক চেষ্টার কথা গোপনই রাখে সে। নিজের ঘরে আসিয়া আবার এক মনে সিগারেট পোড়ায়। মনে মনে ভাবে, এখানে আর মন টিকিতেছে না। এর চাইতে গ্রামে গিয়া স্কুলের মাস্টারী লইলে কেমন হয়!

বিপাশা ছুটিতে আসিয়াছে। সুপ্রিয়র মতলব শুনিয়া বলে—এবার তোমার একটা বিয়ে দিতে হয়। না হলে পাগলামী ছাড়বে না।

সুপ্রিয়র মন্দ লাগে না ভাবিতে, সর্বক্ষণের জন্য একটি সঙ্গিনী পাওয়া!

সে উত্তর দেয়—যদি পনের দিনের মধ্যে মেয়ে ঠিক করে দিতে পার, তবে বিয়ে করতে রাজী।

পদ্মা তাহারই এক কলেজের বান্ধবীর ছোট বোনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করে। —তা হলে একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করি আমাদের বাড়ীতে। শুভ পরিচয়টা হয়ে যাক।

সুপ্রিয় ঘাবড়াইয়া যায় উহাদের কাণ্ড দেখিয়া। ভীতকণ্ঠে বলে—পদ্মাবতী বিয়ে-টিয়ে আমার পোষাবে না। ও ভাবতেই কেমন ভয় করছে। এই বেশ আরামে আছি। বিয়ে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

পদ্মা ফোড়ন কাটে—তার চাইতে প্রেমটা অনেক সহজ ব্যাপার, না?

সুপ্রিয় হাসে—না সেটাও এমন কিছু সহজ নয়। সব চাইতে সোজা হচ্ছে—সিগারেট আর কফি হাউস।

পদ্মা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ছাদের ঘরে ঢোকে। বিশ্বরূপ, অরুণাভ রাজনীতির আলোচনা করিতেছে। চা-দানি হইতে চা ঢালিতে ঢালিতে একটু মন দিয়া শোনে বিশ্বরূপের কথা। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় পঞ্চাশ বছর সমাজের শুধু ভাঙ্গনই চলে। রামমোহন রায়ই প্রথম অগ্রগতির রাস্তা খুলে দেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র শেখান শিক্ষাকে কি করে স্বদেশের সংস্কৃতি ও সৃষ্টির কাজে লাগান যায়। আর এক দিকে বিবেকানন্দের জনসেবা আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে নূতন দেশাত্মবোধের বীজ বপন করলো। আবার রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আরব্ধ কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টিপ্রতিভা কাব্যে সঙ্গীতে চিন্তায় বিশ্বমানবতা ও স্বদেশ-প্রেমের যোগ স্থাপন করে ভারতকে এক নূতন সম্পদ দান করলেন।

পদ্মা চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া দেয়। বিশ্বরূপের ভাল লাগে দীর্ঘকাল পরে পাওয়া এই মধুর গৃহ পরিবেশ। এ ভাল লাগার প্রতিচ্ছায়া পড়ে পদ্মার মনে। তাহারও ভাল লাগে প্রাণের স্পর্শে উর্বর এ রাজনীতির আলোচনা। এমন প্রাণের সঙ্গে মেশান দরদী সুরের রাজনীতির আলোচনা শোনে নি সে কখনও। কাল-প্রবাহের মাঝেও যে একটা প্রাণ আছে, এতকাল কোনও কমরেডের

কাছে থেকেই জানে নি সে। কমরেডদের চালচলন সবই যেন স্প্রীংয়ে চাবি দেওয়া চলনশীলতার মতন আর্টিফিসিয়াল মনে হত তার। ঠিক প্রাণরসপুষ্ট পায়ে চলা বলে মনে হয় নি।

আজ বিশ্বরূপকে দেখিয়া মনে হয়, এতদিনে যেন সত্যিকারের সাম্যবাদীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। অত্যাচারিতের জন্য যার প্রাণ সত্যই কাঁদে।

রূঢ় বাস্তবের আঘাতে কঠিন হইয়া উঠা পদ্মার মনে যেন একটা স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শ লাগে।

মাঝে মাঝে মনে হইত তাহার, সে যেন প্রিয়জনের প্রতি প্রিয়জনের সহজাত ভালবাসাটুকুও হারাইয়া ফেলিতেছে সংসারের এ ঘূর্ণিটানে। কোন উত্তপ্ত বালুর আড়ালে হারাইয়া গিয়াছে তাহার প্রেমের স্নিগ্ধধারা খুঁজিয়া পায় না পদ্মা।

বিশ্বরূপ আজ আবার তাহার মনে এক স্নিগ্ধ রেখা রাখিয়া যাইতেছে। যেন নূতন করিয়া আবার জাগিয়া উঠিতেছে ঘুমন্ত মন। পদ্মা মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া যায় নিজের মনের দর্পণে নিজেরই এ নূতন প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া।

বিশ্বরূপের উপস্থিতি কামনায় প্রতীক্ষমাণ হইয়া থাকে মন। সারা মন জুড়িয়া এক অশান্ত চঞ্চল উত্তেজনা!

পদ্মার সংস্কারের চেতনায় টান পড়ে, আত্মচেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নীতির আঘাত লাগে। তবু এ-সত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না—বিশ্বরূপ আজ অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছে মনে। কিন্তু পদ্মার বিবেক উহা মানিতে চাহে না। সে তাহার স্বামী ও সন্তানকে লইয়া পরিপূর্ণ থাকিতে চায়। তাহার অরুণাভ সে তো আজও জ্যোতির্ময় হইয়া আছে তাহার অন্তরে। তবু কেন এ তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে মনে! কেন এ উত্তেজনা? এ চাঞ্চল্য?

পদ্মা তাহার জ্যেঠিমার, পিসিমার, কাকিমাদের কথা ভাবে। কোন অতীত যৌবনের স্মৃতিপূজায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া যাইতেছেন তাঁহারা।

কিন্তু সে তাহার স্বামীকে ভালবাসে, তবু কেন আচ্ছন্ন হয় মন এ নূতনের প্রখরতায়। কোন এ অন্তর্জ্বালা।

সে তো চাহে না একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে। তবু কেন এত অসহনীয় হইয়া উঠে তাহার প্রতীক্ষা কামনা।

মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরে পদ্মা। যদি এ কোমল স্পর্শে, রহস্যময় শিশুর এ হাসি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে পারে তাহার মনের এ অস্থিরতা।

কোনও কাজে উৎসাহ পায় না পদ্মা। মনের তলায় বহিতেছে অহর্নিশি এক অসহ্য ঝড়। অসহ্য—অসহ্য এ কষ্ট। বড় অসহায় বোধ করে, এ নিঃসঙ্গ দিনের ভারে। বড় অবসন্ন সে আজ এই একলা পথ চলার শ্রান্তিতে।

প্রেম, প্রীতি আর নীতির সংঘাতে দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে সে। পদ্মা স্থির করে অরুণাভকে জানাইবে তাহার মনের এ নূতন পরিচয়। অরুণাভের মনে দুঃখ দিতে চায় না সে। গোপনতা দিয়া বিশ্বাসকে মধুর করিয়া রাখিতে আনন্দ থাকে না, থাকে গ্লানি।

অরুণাভ এক মনে লিখিতেছে। পদ্মা কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। মনের তলায় বিষণ্ণ অবসাদ, তবু আধা ঠাট্টার সুরে বলে—আমি যদি আর কাউকে ভালবাসি তুমি কষ্ট পাবে তাতে ?

অরুণাভ এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হয়। কিন্তু কলম না তুলিয়াই একই ঠাট্টার সুরে বলে—কেন, কাউকে সত্যি ভালবাসছো নাকি ?

পদ্মা আর উত্তর দিতে পারে না। চোখ ভিজিয়া উঠে। অরুণাভ মনে মনে বিস্মিত হয়। কলম রাখিয়া উঠিয়া আসে। পদ্মার হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়া বলে—এত কষ্ট কেন পাচ্ছ পদ্মা ? সত্যিকারের ভালবাসায় কোনদিন পাপ হয় না—পাপের সৃষ্টি ভালবাসতে না পারা থেকেই।

পদ্মা কোনও কথা বলতে পারে না। ভাবে, মাত্র পাঁচ বছর।

এরই ভিতর কত ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে অরুণাভের মনে। আবার সে ক্ষত মিলাইয়াও গিয়াছে। কিন্তু ক্ষতের দাগ ? সে তো চিরদিনের মত আঁকা থাকিবে। বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে কি যেন বিঁধিতে থাকে মনে কাঁটার মত অনুক্ষণ।

বিশ্বরূপের প্রতি তাহার এ গোপন প্রেম, এও চিরস্থায়ী হইবে না সে জানে।

শোভনকে ভালবাসিয়াছে সে, অনুপমকে ভালবাসিয়াছে। হয়তো বা সুপ্রিয়কেও ভালবাসিয়াছে। কিন্তু তাহারা আজ এ জনাকীর্ণ পৃথিবীর মাঝে হারাইয়া গিয়াছে। হয়তো বিশ্বরূপ ধীরে ধীরে বহু মানুষের অন্তরালেই মিলাইয়া যাইবে। পদ্মা বসিয়া বসিয়া ভাবে, কেন এমন হইল। একি তাহার মনের স্বভাবজাত অস্থিরতার পরিচয়। এ তাহার জীবনের ব্যর্থতারই প্রতিক্রিয়া। এ দ্বিচারিণী মন। সে নিজেই দায়ী ? না তাহার রূঢ় পরিপার্শ্বিকতাই দায়ী এজন্য।

তবুও মধুর বেদনাভরা মুহূর্তগুলিকে অস্বীকার করিতে পারে না সে।

সে চাহিয়াছিল বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি সৌন্দর্যানুভূতির প্রেমমধুর ছায়া প্রতিচ্ছায়ায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে তাহাদের দায়িত্ব-সুদৃঢ় জীবনকে। হৃদয়ের স্পর্শ পাইতে চাহিয়াছিল সে তাহার হৃদয়ের ব্যথায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল সে পরম আগ্রহে। কিন্তু তাহার কামনা পূর্ণ হয় নাই।

ভাস্কর রশ্মির প্রখরতায় হারাইয়া গিয়াছে মধু-রজনীর সেই ধ্রুবতারা—তাহার প্রিয় অরুণাভ। অরুণাভর দৃষ্টি আজ সম্পূর্ণভাবে কর্মনেশায় আচ্ছন্ন। এ নেশায় বিভোর বিমুখ তাহার অন্তরাত্মা। সে যেন এক বিরাট সম্ভাবনার সোনালী ইঙ্গিতে ছুটিয়া চলিয়াছে বহুদূরের এক দুর্নিবার আকর্ষণে; দূরে—বহু দূরে—পদ্মার ধরা-ছোঁওয়ার বহুদূর পথে।

পদ্মা বিনিদ্র রজনী ভরিয়া ভাবে, কেন এমন হয়। কেন

এত ক্ষণস্থির তাহার মন ? বালুভূমিতে দাগ যেমন অতি সহজেই স্পষ্ট হইয়া ওঠে, আবার অতি অল্পক্ষণেই মিলাইয়া যায়, তাহার প্রেমও ঠিক এ বালুচরের মতই স্পর্শাতুর আবার বালুতট রেখার মতই ক্ষণপ্রভ।

পদ্মা ভাবিয়া পায় না, তাহার এই চির চঞ্চল, চিরমধুর প্রেমের রহস্য কোথায়। তাহার কল্যাণপিপাসু প্রশান্তপ্রিয় মন গ্রহণ করিতে চায় না এ অস্থির প্রেমের তরঙ্গকে। একটি রাগিনী দিয়াই বাঁধিয়া রাখিতে চায় সে তাহার সমস্ত জীবনকে। তবু তাহার মন এ সুরের সপ্তলহরীতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে কেন ?

স্ট্রাইক মিটিয়া গিয়াছে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইয়াছে। সূর্যের চোখে জয়ের আনন্দ। সবাই মনে মনে স্বীকার করে একজোট হওয়ার মূল্য আছে।

ইউনিয়নের কাজ পুরা দমেই চলিয়াছে। এমন কি মদনও মেম্বর হইয়াছে ইউনিয়নের। একস্থানে যখন কাজ করিতেছে, সুখে দুঃখে বিপদে আপদে যখনই এক সাথেই আছে, লড়াইয়ের সময়ও একসাথেই থাকা উচিত। মদনও নাকি এ খাঁটি কথাটা টের পাইয়াছে এতদিনে। উপরওয়ালার এ নবাবী-মেজাজ আর সহিতে পারিতেছে না সে। তাহার উৎসাহ সকলের চাইতে বরং একটু উগ্রই। একটা কুস্তির আখড়াও করিয়া ফেলে সে ইউনিয়ন ঘরের পাশেই। শরীরে জোর না করিলে ঐ হাড়-সর্বস্ব দেহে কি লড়াই করা চলে বড়লোকদের বিরুদ্ধে। অনেকেই মদনের ভক্ত হইয়া উঠে। মদনের মহাবীর আখড়ায় বেশ কিছু মেম্বার হইয়া যায়।

প্রসাদ মনে মনে প্রমাদ গণে—লক্ষণ ভাল নয়। কিন্তু মদনের পপুলারিটি যে রকম, তাহাতে তাহাকে ইউনিয়ন হইতে সরানোও চলে না। সূর্যকে সতর্ক করে, দেখো সাবধান।

ইতিমধ্যেই অনেকের মধ্যে মিটিংএ বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা

শরীরচর্চার আগ্রহ বেশী দেখা যায়। মিটিংএর শ্রোতাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতে চায়।

দিল্ খোলসা মদন, বিড়িটা, সিগারেটটা ছেলেদের অসুখে বিসুখে বিলাতী দুধের গুঁড়ো, বিপদে-আপদে দু-একটাকা ধার হামেশাই দিতেছে ফ্যাক্টরীর মজুরদের। এতটুকু উপকার মানুষের করিতেই হয়—না হইলে আর মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছে কেন? কিন্তু টাকা পায় কোথায় মদন? প্রতাপ যেন এ-রহস্যের কূল পায় না।

উত্তর দেয় সূর্য, না পাওয়ার কি। মদন তো শুধু ঐ ফ্যাক্টরীর আয়ের ওপর নির্ভর করে না। আজ কয়েক সের চিনি, কাল কয়েক টিন কেরোসিন, পরশু গ্যালন খানিক পেট্রল আনিয়া চোরাকারবার করিতেছে সে এই বস্তির ঘরে বসিয়াই। কোথা হইতে যে এসব সংগ্রহ করে, সে সংবাদ অবশ্য সূর্যও জানে না।

তাছাড়া মদনের কোনও সংসার নাই। মদের খরচ আর দু-চার জন মেয়েমানুষের মন রাখার খরচ শুধু। সুখেই দিন কাটে মদনের।

সেই মদনেরও ইদানীং এক দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গিয়াছে। সিন্ধুবালাকে চাইই ছোটবাবুর। এ জন্য আগাম পঞ্চাশটি টাকাও সে তাহার নিকট হইতে লইয়া উজাড় করিয়া বসিয়াছে মদ খাইয়া।

সিন্ধুবালা যে এত তেজী মেয়েমানুষ সে জানিত না পূর্বে। তাহা হইলে আর এত করিয়া কাজ জুটায় সে প্রতাপ-সূর্যের।

একদিন একটু আভাস তুলিতেই তাহার সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া দিয়াছে সুন্দরবৌ। কি ভীষণ অগ্নিমূর্তি তাহার। যেন একটা কেউটে।

—আসে যেন একদিন তোমার ছোটবাবু। ঝাঁটা মারুম মুখে। ছোট লোক বইলা আমাগো মান ইজ্জত খোয়ান অত সোজা না। কইও তোমার বাবুরে—এইটা বেশ্যাপাড়া না।

কোনমতে মানে মানে সরিয়া আসিয়াছে সে সেদিন তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া। শ্রমিকদের মধ্যেও আবার অসন্তোষ ঘনাইয়া উঠে। স্ট্রাইকের দাবী মানিয়া লওয়া হইবে—এই সর্ত দেওয়া

সত্ত্বেও কার্যত উহা আংশিক ভাবেই পূর্ণ করা হয়। অসুস্থ শ্রমিকদের মধ্যে কেহ কেহ মাহিনা পায়—কেহ কেহ পায় না। মাগ্‌গি ভাতার বেলায়ও এই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়।

আবার স্ট্রাইক করিতে যায় মদন। কিন্তু প্রসাদরা এত ঘন ঘন স্ট্রাইক করা সমর্থন করে না। মদন কিছুতেই প্রসাদের যুক্তি মানে না। মদনকে অনেকেই সমর্থন করে।

অগত্যা অনিচ্ছাতেই সূর্যও রাজী হয়। আবার স্ট্রাইক আরম্ভ হয়।

সিদ্ধেশ্বর চিন্তিত হয়—এই সেইদিন ওদের দাবী মানিয়া লওয়া হইল, আবার ধর্মঘট?

কিন্তু প্রকাশকে উদ্বিগ্ন দেখায় না। তিন দিন চলিয়া যায় - পূর্ণ হরতাল। চতুর্থ দিনের দিন কিছু কিছু অসন্তোষ দেখা দেয় নিজেদের ভিতর। কিছু শ্রমিক কাজে যোগ দেওয়াই ঠিক করে। —একবার দাবী মেনে নিয়েছে বলে, বার বারই যে মালিক দাবী মেনে নেবে—তার ঠিক কি?

মদনকে এখন আর উহাদের ঠেকাইতে দেখা যায় না। সেও একটু চিন্তিত সুরেই সায় দেয়—আমারও মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয় নাই।

কিন্তু আরেক দল কিছুতেই কাজে যোগ দিতে রাজী হয় না।

—একবার যখন স্ট্রাইক করতে নেমেছি তখন আমাদের দাবী মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কাজে যাব না। দুই ভাগ হইয়া যায় শ্রমিকরা। একদল কাজে যোগ দেয়। স্ট্রাইক ভাঙ্গিয়া যায়। সূর্যও বুঝিতে পারে মদনের চাল। কিছু দিনের মধ্যেই মদনের সুর পরিষ্কার হইয়া উঠে। মদন তাহার মহাবীর আখড়ার দলকে জড়ো করিয়া বুঝায়—আমরা বুঝি কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতারা যখন নিষেধ করছে, তখন কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্ট্রাইক করা উচিত নয় আমাদের। আমাদের যা ব্যবস্থা করার তারাই করবে! ছেলের জন্য যা কিছু ভাবে মা বাপেই। আমাদের মা বাপ

কে? না এই নেতারা। তারাই তো ভাববে আমাদের জন্যে। সত্যি কি না।

শ্রোতারা ভাবে, মদনের কথাই ঠিক। নেতারা যখন আছে—বড় বড় জ্ঞানী মানুষ তাঁরা, এতকাল জেল খাটছেন, সে তো দেশের স্বার্থে, দশের জন্যই। তাঁরা নিশ্চয়ই একটা বিহিত করবেন।

সূর্য দেখে, ক্রমেই তাহাদের ইউনিয়নের সভ্য কমিয়া যাইতেছে। মদনের মহাবীর আখড়া চুম্বকের মত টানিয়া লইয়া যাইতেছে ইউনিয়নের সভ্যদের। যে কটি সভ্য টিকিয়া আছে, তাহাদেরও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে স্ট্রাইক ব্যর্থ হওয়ায়। তাহারা বুঝিয়া উঠে না—কোন ইউনিয়ান সত্যিকারের বাঁচার পথ ধরাইয়া দিবে।

প্রসাদের চোখে স্বচ্ছ হইয়া ধরা দেয়—মহাবীর আখড়ার স্বরূপ। তাহাদের ইউনিয়ান ভাঙ্গাই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মনটা দমিয়া যায়। ইউনিয়ানকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করে। এই তো তাহাদের জীবন। এক একটি ইউনিয়ন তাহাদেরই দেহের রক্তচলাচলের শিরা উপশিরা। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এই ইউনিয়ানগুলিকে। কিন্তু তাহার চোখের সামনেই উহাতে ভাঙ্গনের চিড় ধরিতেছে। অথচ এ ভাঙ্গনের মোড় ফেরানো যে কত কঠিন জানে সে। বিষণ্ণ ছায়া পড়ে কচি মুখখানাতে, ইউনিয়নের ঘরে বসিয়া একটা রিপোর্ট লেখে। সূর্য আসিয়া পাশে বসে।

—কাগজে রিপোর্ট পাঠিয়েই বা কি, একটা কাগজেও ছাপে আমাদের কথা?

প্রসাদ আশার সুরে উত্তর দেয়—আর বেশীদিন নয়—এই তো আমাদের কাগজও বের হল বলে। এ অবিচারের জবাব খুঁজে পাবে সে কাগজে।

আরও কয়েকজন সভ্য আসিয়া জড়ো হয়।—সত্যি আমাদের নিজেদের কাগজ বের হচ্ছে!

পরেশ নিজ কানে শুনিয়া আসিয়াছে মদনের ইউনিয়ান ভাঙ্গার ফন্দি। বলে—এদের একমাত্র শায়েস্তা করা যায় মার দিয়ে।

সূর্যের মনেও ছাই চাপা আগুন জ্বলিয়া উঠে, বলে—মদনের শয়তানী জন্মের মত ঘুচান দরকার।

একা মদনই তো নয়। চোরা গলির মোড়ে মোড়ে অগণিত শয়তানের প্রহরী। প্রত্যেকটি শয়তানের জন্যই শান দেওয়া হইতেছে ছুরি।

বিশ্বরূপের রোগ যন্ত্রণা কয়দিন যাবৎ আবার বাড়িয়াছে। প্রাণ ঢালিয়া সেবা করে পদ্মা। বেহুঁশের মত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বিশ্বরূপ। শ্বাসনালী যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে মনে হয়। মাঝে মাঝে চোখ মেলিয়া দেখে, পদ্মা তখনও বসিয়া আছে পায়ের কাছে গরম জলের ব্যাগ হাতে। নিচে শিশুকণ্ঠের কান্না শোনা যায়। অস্পষ্ট স্বরে বিশ্বরূপ অনুরোধ জানায়—যাও পদ্মা। অনেক রাত হল। এবার শুতে যাও।

পদ্মা নিচে চলিয়া যায়।

বিশ্বরূপ ভাবে, পদ্মার কথা। পদ্মা তাহাকে এমন করিয়া ভালবাসিতেছে কেন এ জীবন-সন্ধ্যায়।

একটা অসহায় বেদনানুভূতিতে আবিষ্ট হইয়া থাকে বিশ্বরূপের রোগক্লিষ্ট মন। ধীরে ধীরে শ্বাসের কষ্ট উপশম হয়। দূরের স্নিগ্ধ আকাশে ভোরের আরক্ত সূর্য দেখা দেয় জ্যোতির্ময় দেবতার আবির্ভাবের মত। মৃদু রৌদ্রের উত্তাপ লাগে রক্তহীন দেহে। পদ্মা দুধ লইয়া আসে ঘরে। বিশ্বরূপ চাহিয়া দেখে, পদ্মার চোখেমুখে একটা তীব্র ক্লেশের ছায়া পড়িয়াছে। কচি মুখখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে কি এক দুঃসহ দুঃখের তাপে।

মনের ভিতরে একটা মমতামিশ্রিত সমব্যথার কাঁটা বিঁধিতেছে তাহারও। এমনিভাবে সকলের অজান্তে আর কতকাল এ কষ্ট সহিবে পদ্মা।

অরুণাভকে বলে—পদ্মার শরীরটাও ভেঙ্গে পড়েছে, ওকে নিয়ে দেশে গিয়ে থাক না কিছুদিন।

মনে মনে ভাবে সে, দূরে গেলে হয়তো পদ্মা তাহাকে ভুলিতে পারিবে। বিশ্বরূপ একটু অবাক হইয়া লক্ষ্য করে। পদ্মাও আজ তাহার অনেকখানি চিন্তা জুড়িয়া বসিয়াছে। স্তম্ভিত হইয়া ভাবে, একি দুঃসহ পরিহাস। জীবনের দিগন্ত রেখায় পৌঁছিয়াও মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতি নাই মানুষের। এক বিপাশার সমস্যাতেই ভারাক্রান্ত সে। কোন বিগত যৌবনের সুন্দর তিথিতে বিপাশা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাকে মনের একান্তে। পুলিশের কৃপাদৃষ্টিতে না পড়িলে হয়তো ঘটনার চক্র অন্যদিকে মোড় ফিরিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। তবু সেই বিপাশাই আজ বিশেষভাবে জড়িত তাহার জীবনের সঙ্গে।

তাই সে আজ বড় বিব্রত নিজের এই রুগ্ন জীবনের ভার লইয়া। তাহার উপর আবার পদ্মা এক বিরাট পর্বতপ্রমাণ সমস্যা লইয়া দেখা দিয়াছে তাহার দুয়ারে। এ ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত পৃথিবীকে সহ্য করার পক্ষে বড় বেশী কোমল, বড় বেশী ভাবপ্রবণ মন পদ্মার। বিপাশার মত প্রাণের সজীবতা দিয়া দুঃখকে উড়াইয়া দিবার ক্ষমতা নাই ওর। এজন্যই নিজেকে এত নিঃসঙ্গ ভাবিতেছে আজ পদ্মা। ভিতরের মন সান্ত্বনা, সঙ্গী, সমব্যথী খুঁজিয়া বেড়ায়, ভালবাসে, ব্যথা পায়। ভিতরে ভিতরে সংগ্রাম করে। তাই এত চিন্তাক্লিষ্ট দেখায় পদ্মাকে। পথ না পাওয়া স্রোতধারার মত ভিতরের প্রাণশক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পায় না।

একটা দুঃখবোধ নাড়া দেয় মনের গভীরে। জীবনকে ঠিকমত কাজে লাগাইতে পারিতেছে না পদ্মা। তাই এত বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছে সে। লক্ষ্য করে, অরুণাভ ও পদ্মার মনের মূল গঠনে পার্থক্য প্রচুর। হয়তো শুধু বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পদ্মাও টের পাইয়াছে, সমাজের পরিবর্তনশীলতার মূল রহস্য কোথায়। তাই হয়তো আসিয়াছে অরুণাভের কাছে। কিন্তু অরুণাভের কর্মসাথী হওয়ার

মত, তাহার আদর্শে জীবনশক্তিকে কাজে লাগাইবার মত মনের বলিষ্ঠ প্রস্তুতি পদ্মার নাই।

বিশ্বরূপ শুইয়া শুইয়া ভাবে, বহু সমস্যা ভরা এ প্রেম-পরীক্ষার মীমাংসার প্রয়াস চলিতেছে পৃথিবীর একাংশে। কিন্তু উহার সমাধান মিলিয়াছে কি সেখানেও? জটিল প্রশ্ন জালে ঘেরা পৃথিবীর প্রেম-ইতিহাস।

কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে যাওয়া ঠিক হইয়াছে বিশ্বরূপের। আজই রওয়ানা হইবে। পদ্মা পরিবেশন করে ব্যথাতুর আবেগ লইয়া।

বিশ্বরূপ ইজিচেয়ারটায় দেহ এলাইয়া দিয়া গল্প করিতেছে অরুণাভের সঙ্গে। পদ্মা কাজ সারিয়া আসিয়া বসে।

বিশ্বরূপ একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে লক্ষ্য করে পদ্মার স্বপ্নালু চোখের কি গভীর আকুলতা!

অরুণাভ বাধা দিয়া বলে—সিগারেটটা ছাড়ুন এবার বিশ্বদা। এত কষ্ট পান।

বিশ্বরূপ একটু হাসে—ছেড়েই তো দিয়েছি। আজ অনেকদিন পর একটা ধরালাম!

পদ্মা কথা বলে না, কথা শোনেও না। বিশ্বরূপ আর অরুণাভের টুকরো টুকরো কথাগুলি কানে স্পর্শ করে যায় মাত্র। এক মনে চিন্তা করে সে, এমন করিয়া ভালবাসিতেছে সে কেন বিশ্বরূপকে। বিপাশা তাহার আবাল্যের বান্ধবী, তাহার প্রিয় অরুণাভ, শিশু কন্যা সকলেরই স্নেহ-প্রেম-প্রীতিমাখা স্পর্শ ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় চিন্তার কুহেলীতে।

বিশ্বরূপের হাতের সিগারেট পুড়িয়া যাইতেছে। আর কয়টি মুহূর্ত মাত্র। তারপর চলিয়া যাইবে সে হয়তো দীর্ঘদিনের জন্যই। কিন্তু তাহার মনে আঁকিয়া যাইতেছে একটি চিরন্তনী ব্যাথার রক্ত-মঞ্জরী।

ছাইদানিতে সিগারেটের টুকরাটা নিঃশব্দে পুড়িয়া চলিয়াছে

পদ্মা করুণ চোখে দেখে জ্বলন্ত টুকরাটাকে। ঠিক ঐ জ্বলন্ত অগ্নি কণাগুলির মতন কি সেও পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছে আজ!

বিশ্বরূপ আবার আর একটা সিগারেট ধরায়। পদ্মা অবাক হইয়া শোনে, তাহাকেই যেন বিশ্লেষণ করিতেছে বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ বলিয়া যায়—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান মনগুলির বিপদ দুদিক থেকেই! যা করতে চায় তারা, তা করার পথে এদের বিঘ্ন প্রচুর, নানা দিক থেকেই। এ সমাজে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পায় না এরা। তার ফলে আসে ফ্রাস্ট্রেসান! এ আত্মপীড়ন থেকে, একদল যাদের অহমিকার অন্ধ চশমা ভেদ করে সমাজের প্রাণশক্তি ধরা পড়ে না—তারা চোরা বালিতেই আটকে পড়ে। ধীরে ধীরে সেই আত্মক্ষয়ী ধ্বংসের মুখেই পা বাড়ায় নিজেদের অজান্তে!

আরেক দল ইনডিভিজুয়ালিষ্ট যারা, টের পেয়েছে সমাজের প্রাণ শ্বাস কোনদিকে বইছে, তাদেরও বিপদ কম নয়। কারণ প্রতিকূল বায়ুব বিরুদ্ধে নৌকো চালিয়ে নেবার মত বৈপ্লবিক প্রস্তুতির অভাবে ভিতরের উপছে পড়া সৃজনশক্তিকে কাজে লাগাবার পথ খুজে পায় না। শুরু হয় আত্মনির্যাতন। এরা জনকল্যাণ চাইলেও ঠিক কল্যাণপ্রসূ পথে চলতে সক্ষম হয় না। এর জন্য দায়ী অবশ্য—যে পরিবেশ থেকে বড় হয়ে এসেছে এরা, সে পরিবেশই।

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে বিপাশার চাকুরির জীবন। পাহাড়ী আবেষ্টনীর মাঝে ছোট্ট এক অরফ্যানেজ স্কুল। চারদিকে ঘিরিয়া আছে পর্বত-লহরী।

শালগাছের তলায় শ্লেট আর পেনসিল হাতে ছোট্ট ছোট্ট পড়ুয়াদের তন্ময় হইয়া পড়ায় বিপাশা।

স্নেহকাতর অনাথ শিশুদের মনে এক যাদুর জাল ফেলিয়াছে বিপাশা। তাহাদের দুরন্তপনা থামিয়া গিয়াছে—গাছপালা, পশুপক্ষী পর্বতচূড়া আঁকার আনন্দে। ভাইবোনদের সঙ্গে রোদে বসিয়া

পান্তাখাওয়া সোনালী সকালগুলির অবসান হইয়াছে কবে, দিদিভাইয়ের কাছে বসিয়া গল্প শোনার আগ্রহে তাহারা টেরও পায় নাই! বিপাশাও তাহার শিশুশিক্ষার ট্রেনিংকে চটকদার একটি জ্ঞানের বাক্সে ধরিয়া রাখে নাই।

গাছের ছায়ায় বসিয়া লালফিতা দিয়া বেণী বাঁধিয়া দেয় বিপাশা। ছোটমেয়েগুলি শান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ছেলেরা বশ মানে না অত সহজে।

চুল আঁচড়ানোর চাইতে বল খেলাটাই বেশী প্রিয় তাহাদের। বিপাশার আনাড়ী হাতের সেলাই করা ছুই রঙের খেলার শার্ট পরতে পরতে তাহারাও কোন ফাঁকে যে শান্ত হইয়া যায়—টের পায় না নিজেরা। বোর্ডিংএর মেট্রন যামিনী। সেও দুর্ভিক্ষের জোয়ারে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছে এই স্কুলে। যামিনী খুশি হইয়া বলে—দেখছেন, ঐ হনুমান ছিটাটাও আজ ছুদিন হল কেমন বাধ্য হয়ে গিয়েছে। আর প্রথমদিন ঐ ছোঁড়া কি কামড়ই বসিয়ে দিয়েছিল আমার হাতে।

বিপাশা খেলার বাঁশী বাজায়। ছেলেমেয়েরা সারি দিয়া দাঁড়ায়। চোখেমুখে আত্মপ্রতিষ্ঠার কৌতুকময় পিপাসা।

সুপ্রিয় আসিয়াছিল কতকগুলি জিনিষ পৌছাইয়া দিতে বিপাশার স্কুলে। সে ফিরিয়া গিয়া গল্প করে—কে বলবে এ মেয়ে মিটিংয়ে যাওয়া স্টাডিসারকল নেওয়া, প্রসেশন লিড করা, সেই বিপাশা। রঙ বেরঙের কাপড় জোড়া দিয়ে খেলার শার্ট সেলাই করা থেকে ছুই বছরের মেয়েকে মাছের কাঁটা বেছে দেওয়া কিছুই বাদ নেই।

বিশ্বরূপ মন দিয়া শোনে। দীর্ঘদিন পর বিপাশাকে চিঠি লেখার জন্য চিঠির কাগজ খুলিয়া বসে। লেখে:

কল্যাণীয়া বিপাশা, পাহাড়ী শিলার শান্ত মৌন পরিবেষ্টনীর মাঝে তুমি তোমার জগৎকে খুঁজে নিয়েছো। রসঘন জীবনের মাধুরী দিয়ে ঘিরে রেখেছো মুহূর্তগুলিকে। শুনে খুশিই হয়েছি।

ছোট্ট নদী, বালুর চর, পাহাড়ী বন, আর শান্ত সন্ধ্যার বুকে তোমার মমতাভরা জীবনে জোয়ার এসেছে। তোমার শিশু-দোসরদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার দুরন্ত ছবিগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আমার এই লেখনীর বন্ধনে বাঁধা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে

তবু হুঁশিয়ারী জানাই সাহসী মেয়ে। ভুলে যেও না সংগ্রামের দীর্ঘ যাত্রার সবে মাত্র শুরু। দীর্ঘতম জটিল বন্ধুর পথ ভেঙ্গেই এগিয়ে যেতেই হবে সামনে। না, সন্দেহ আমি করছি না। তোমার সুন্দর শুভ্র হাত দুখানার অনমনীয় শক্তির পরিচয় আমি পাচ্ছি আমার এই অক্লান্ত শয্যায় শুয়ে শুয়ে। তাই কৃপণ স্বাস্থ্যের অভিশাপ আমাকে ক্লান্ত করতে পারে নি। আমাকে দ্বিগুণ শক্তিমান করে তুলেছে এক নির্ভীক মেয়ে।

আমার চতুষ্পার্শ্বে ছড়ান রয়েছে দৃঢ় লেখনী আর লেখার বলিষ্ঠ সাধনা। অনলস লেখনীতে বাঁধভাঙ্গা বন্যার গতি ফিরে এসেছে। আমি অনুভব করছি তোমার আশা-নিবিড় উজ্জ্বল সন্ধ্যা-গুলিকে।

সৃজন মধুর শ্যামল বসুন্ধরার প্রতীক্ষায় প্রাণের বীজ বুনে চলেছো, স্রোতস্বিনী কন্যা! কিন্তু তার আগে সন্ধ্যার আকাশের রক্তমেঘের দিকেও তাকিও—ভীরু চোখে নয়—ঝড়ের পূর্বাভাসকে ভয় পাবে না তুমি। আমি জানি—প্রস্তুতির সঙ্কেত আঁকা সাবধানী দৃঢ় চোখে তাকিয়ে দেখো ঈশান কোণের কুটিল মেঘকে।

চার-পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসে পিয়নের হাত হইতে চিঠি লইয়া। দিদিভাইয়ের চিঠি!

এনভেলাপের উপর প্রিয় হস্তাক্ষরে লেখা তাহারই নাম—বিপাশা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, লক্ষ্য করে যামিনী। ফিসফিস করিয়া বলে, দিদিমণির বরের চিঠি বুঝি।

বিপাশা এনভেলাপটা খুলিয়া চিঠিখানায় চোখ বুলাইয়া চলিয়াছে। তাহার রক্তে যেন এক মধুর সৌরভ মিশাইয়া দিয়া গিয়াছে কে—কে যেন কানে কানে গুণগুণ করিয়া যায়—বিশ্বরূপের অন্তরে আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে সে। বিপাশাও যেন কানে কানে বলিয়া পাঠায়—না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই সে।

পাশের রান্নাঘরের বারান্দায় বিকালের খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের চিহ্নিত বাটি লইয়া বসে চাটাইয়ের উপর। যামিনী পরিবেশন করিতেছে। বিপাশা এই ফাঁকে চিঠিখানা আর একবার পড়ে। দূর-মহাসঙ্গীতের মত ভাসিয়া আসে যেন কি এক গম্ভীর সুর। সম্মুখে শালতরুশ্রেণী। দূরে রৌদ্রে-নাওয়া পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। আরও বহুদূরে দেখা যায় প্রকাণ্ড অটল গম্ভীর পর্বতলহরী।

গম-ভুট্টার ক্ষেতের গা-ছোঁওয়া আদিবাসীদের মাটির উঠানে ধোঁয়া দেখা যায়। দিন ভরিয়া বুড়ীরা শুকনো ঝরা পাতা ঝাঁট দিয়া যায়—শীতের সন্ধ্যার একমাত্র সম্বল। লাউ সিমের ডগায় ঘেরা উঠানে উঠানে শীতের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শীতার্ত অনাদৃত শিশুরা গোল হইয়া বসিয়া গিয়াছে সেই আগুনের চারপাশে।

পাহাড়তলীর শিশুদের এই অশ্রু-ঝরা জীবনই শেষ যবনিকা নয়। ইতিহাসের পাতায় আরও বহু দৃষ্টান্ত বাকী আছে এখনও। আরও বহু আগুনেরই প্রয়োজন উলঙ্গ শিশুদের এ শীত মিটাইতে। ঐ পাতার আগুনের উত্তাপটুকুই শেষ উত্তাপ নয়।

রাত্রি নামিয়া আসে। ছোট ছোট খাটিয়ার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অশান্ত শিশুরা। বিপাশা শোওয়ার ঘরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া যায় পা টিপিয়া টিপিয়া। একটি দুষ্টু ছেলে ঘুমায় নাই এখনও—চোখ পিট পিট করিতেছে।

বিপাশা নিজের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করে। আধঘণ্টা পরে আবার দেখিয়া যায়—ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সেই দুরন্ত ছেলেটিও। বিপাশা ঘুমায় না। চিঠির জবাব লেখে।

ভোর হয়, বেলা বাড়ে। রৌদ্র প্রখর পাহাড়ী পথ ভাঙ্গিয়া হাঁটে বিপাশা চিঠি ডাকে দিতে। উঁচুনিচু ঢেউ খেলান পথ। একাই হাঁটে বিপাশা। মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য। রৌদ্রে ডুব দিয়া উঠিয়াছে পাহাড়ী শহরটুকু। বিপাশা মাথায় কাপড় টানিয়া দেয় পিছনের দৃশ্য আড়াল করিতে। সম্মুখে লাল কাঁকর বিছানো পথে তাহারই দেহভঙ্গির ছায়া পড়ে। একলা পথচারী একটি নারীমূর্তির কায়াহীন ছায়ায় এক হারানো সুরের বেদনা জাগায় মনের গভীরে। এক অপরিচিত অনুভূতি সাড়া দেয় আজ এ অনিন্দ্য সুন্দর দেহছায়া।

রূপসী কন্যা বিপাশা। কিন্তু রূপের চেতনায় আত্মসচেতন হইয়া উঠে নাই সে কোনদিনই।

বিপাশা করুণ চোখে দেখে আজ নিজেরই দেহছায়া। সঙ্গীহীন এ পথশ্রান্তিকে সজাগ করাইয়া দিতে চায় উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন। পাশ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যায় কোলের উলঙ্গ শিশুদের স্তন দিতে দিতে সাঁওতাল রমণীযুগল। মসৃণ অনাদৃত যৌবনপুষ্ট স্কন্ধ খোঁপায় গোঁজা মহুয়া ফুল। হাস্যমুখরা সাঁওতালিনীর দৃষ্টির কটাক্ষে স্বামী সোহাগেরই বাসনা। নারীচিত্তের রহস্যময়ী সুপ্ত চেতনা সচেতন হইয়া উঠে ঘুমন্ত মনের তলদেশ হইতে। ধীরে ধীরে হাঁটে বিপাশা। সম্মুখের পাহাড়শ্রেণী ঝাপসা হইয়া যায় স্বপ্নাতুর দৃষ্টির আড়ালে। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—রোগশয্যায় শায়িত এক প্রশান্ত মূর্তি। রোদের আড়ালে উঁকি মারে বিশ্বরূপের চিঠির দীপ্ত অক্ষরগুলি—হুঁশিয়ারী জানাই সাহসী মেয়ে।

পদ্মার শিশুকন্যার মুখে বুলি ফুটিয়াছে, লিখিয়াছে অরুণাভ। অরুণাভ-পদ্মার সন্তান! কেমন হইয়াছে দেখিতে, মনে মনে একটু কল্পনা করে!

দূরে স্কুলবাড়ীতে ঘণ্টা শোনা যায়। দ্রুত পা চালায় বিপাশা।

গভীর রাত্রি। পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিপাশা বাতির সলতেটা একটু চড়াইয়া দিয়া অসমাপ্ত বইখানা

খুলিয়া বসে। বোরখাপরা লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নারীর মুক্তির ইতিহাস—সমরখন্দের নবপ্রভাত। চোখের সামনে ভাসে অসংখ্য বিপ্লব। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলি জ্বল জ্বল করে। ব্যাণ্ডে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা পারাঞ্জা বোরখা চাদর খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে পারাঞ্জা চাদরের পাহাড় জমে উঠলো। তাতে প্যারাফিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। হাজার বছরের গোলামির পর্দা ধূ ধূ করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।…

বিপাশা আবিষ্ট হইয়া পড়ে, এদেশেও জ্বলবে ওরকমই লক্ষ ফণার আগুন। মেয়েদের দাসত্বের লৌহশিবির এখানেও পুড়ে ছাই হবে।

পাশের ঘরে একটি ছোট মেয়ে স্বপ্নের ঘোরে আর্তনাদ করিয়া উঠে। বিপাশা ছুটিয়া যায়।—কি হয়েছে রে আহ্লাদী।

—মাকে শিয়ালে খেয়ে ফেলছে।—স্বপ্নের ঘোরেই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে পাঁচ বছরের মেয়েটি। বিপাশার বুকের ভিতরে আহ্লাদীর মতই অসংখ্য ক্রন্দন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। দুর্ভিক্ষে মারা গিয়াছে আহ্লাদীর মা। হয়তো তাহার চোখের সামনেই শিয়াল শকুন ছিড়িয়া খাইয়াছিল তার মায়ের গলিত দেহখানি।

সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দুঃস্বপ্নময় করিয়া তুলিতেছে শিশুটির প্রতি রাত্রির ঘুমকে।

বিপাশা শিশুটিকে বুকের কাছে টানিয়া লয়, আস্তে আস্তে হাত বুলায় মাথায়। ধীরে ধীরে বুকের কাছে নিবিড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে আহ্লাদী। বিপাশা পরম স্নেহে উচ্চারণ করে নামটা, হয়তো কত আদর করিয়া এ নাম রাখিয়াছিল তাহার মা-বাবা! তার কি করুণ পরিণতি।

মাতাপিতাহীন অনাথ শিশুর উষ্ণ নিঃশ্বাস বুকের কাছে। আর চোখের সামনে—লক্ষ লক্ষ পারাঞ্জা আর বোরখার ধূমায়মান

অগ্নিশিখা কি অনির্বাণ উত্তেজনা মস্তিষ্কের স্নায়ুতে। দূরে জমিদার বাড়ীতে প্রহরে প্রহরে পেটা ঘণ্টা বাজে। এক—দুই। বিপাশার নিদ্রাচ্ছন্ন চোখের পাতায় ভাসিয়া উঠে—ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরের লেখা ছোট্ট একটি ছত্র—হুঁশিয়ারী জানাই সাহসী মেয়ে।

পদ্মা তাহার ঘরে বিশ্বরূপের বইখানার প্রুফ দেখিতেছে। অরুণাভ সকাল সকাল বাড়ী ফেরে অত্যন্ত ক্লান্ত, যেন ভয়ার্ত মূর্তি।

পদ্মা অরুণাভকে এ অসময়ে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া অবাক হয়। সে তপ্ত চেহারা লক্ষ্য করে উঠে আসে।—এত শীগগীর ফিরলে যে, অসুখ করেছে নাকি ?

—শরীরটা ভাল লাগছে না, মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে—তাই চলে এলাম।

পদ্মা পাশে আসিয়া বসে—একটু লেবুর রস দিয়ে দেই মাথায়।

অরুণাভ বাধা দিয়া বলে, কিছু করতে হবে না। ও এমনি সেরে যাবে। তুমি বরং যা করছিলে—তাই কর। বইটা এমাসের ভেতরেই বের করা চাই।

অরুণাভ অভ্যস্ত নয় কাহারও সেবা গ্রহণ করায়। পদ্মার নিকট হইতেও নয়। পদ্মার অভিমানী মন ব্যথিত হয়। অরুণাভের এই নিঃসঙ্গ মূর্তিটি তাহার সমস্ত মনকে সিক্ত করিয়া তোলে। কপালে হাত দিয়া বলে, জ্বরও তো হয়েছে।

পদ্মার এই কোমল আচরণে দীর্ঘ অতীতের পর্দা ভেদ করিয়া এক মধুর স্মৃতির ছোঁয়া লাগে—অরুণাভ পদ্মার হাতটা আরও একটু চাপিয়া ধরে কপালে। গভীর আবেশে যেন কোন দূর অন্তস্তল হইতে ডাকে অরুণাভ—পদ্মা !

পদ্মার চোখেও প্রেম ঝরে। হাতের স্পর্শে ধরা দেয় হৃদয়। তবু কি একটা ব্যথার ইঙ্গিত যেন রাত্রির অন্ধকারে। দূরে কোন বাড়ী হইতে শিশুর ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। রাত্রি ঘন হইয়া আসে। অরুণাভ চিন্তিত হয়—বিপাশা এখনও ফিরছে না কেন ?

রাজনৈতিক অপরাধে বিপাশার চাকরী গিয়াছে। আবার সেই আগের বাড়ীতে কাজ আরম্ভ করিয়াছে সে। সেই রোদে পোড়া রুক্ষমূর্তি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিপাশা ঘরে ঢোকে। চোখে মুখে উত্তেজনা। সংবাদ দেয়, ছাত্ররা সত্যাগ্রহ করিয়া বসিয়া আছে রাজপথে। প্রসাদও আছে সেখানে।

উৎকণ্ঠা জড়ানো স্বরে বলে—মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে আজ। গুলি-টুলিও চলবে হয়তো। পুলিশ সার্জেণ্টেরা ঘিরে আছে যে ভাবে, মনে হল তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

অরুণাভ উঠিয়া পড়ে—জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া যায়। বিপাশাও বাহির হয় আবার।

পদ্মা দুয়ারটা বন্ধ করিয়া আসিয়া ঘুমন্ত মেয়ের পাশে বসে। বুকের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে এক অজানা স্তব্ধতা।

ক্ষুদ্র শিশুটির দিকে নিবিড় চোখে তাকায়—চোখ দুটি আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে যেন ঐ শিশুর কাছেই। চোখে ভাসে প্রসাদের বন্ধুদের, দৃঢ়তাব্যঞ্জক কচি মুখগুলি।

এখনও সাবালকত্বে পৌঁছায় নাই তাহারা। তবু তাহাদের দৃষ্টি সাবালকত্বের চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এই শীতের রাতে ঐ কচি কচি ছেলেরা খোলা রাস্তার বুকে বসিয়া আছে। হিম ঝরা আকাশের তলায়। জানালা দিয়া দেখা যায় দূরের স্তব্ধ আকাশ। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আনিতেছে কি এক শঙ্কিত সংবাদ।

রাত গভীর! নিচের রাস্তা দিয়া একটি ভারী জুতাপরা মানুষের পদশব্দ মিলাইয়া যায় দূরের নিস্তব্ধতায়। গ্যাসবাতির আলোয় আর ঘন ঘন দীর্ঘ ছায়া পড়ে আবছা কালো। পদ্মা অধীরপ্রতীক্ষায় কান পাতিয়া থাকে।

প্রসাদের বন্ধুদের রৌদ্ররুক্ষ দীপ্তমুখগুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসে চোখের সামনে। জ্যোতির্ময়, সমীর, বিপ্লব আরও অনেকে। নামও জানে না সকলের।

কতদিন আসে না প্রসাদ। সেই একদিন কয়জন ছাত্রবন্ধুদের লইয়া তর্ক করিতে করিতে ঘরে ঢোকে। পাশের ঘরে বসিয়া সে কি তুমুল তর্ক তাহাদের! জ্যেতির্ময় কিছুতেই মানিয়া লইতে রাজী নয় কম্যুনিস্টদের এই অ-বিপ্লবী বড় বেশী কংগ্রেস-ঘেঁষা, খিচুড়ী বিলানো নরনারায়ণ সেবার নীতিকে।

বিদ্রূপ করে আরও একটি ছেলে—তোমাদের দৃষ্টি তো ঐ পশ্চিমের দিকে। একটু সুর করিয়া ব্যঙ্গ করে—পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। তাই না? পশ্চিম থেকে ধার করা বুলি নিয়ে কতকাল আর চালাবে তোমরা?

প্রসাদের পক্ষও মানিতে রাজী নয় এ মিথ্যা অপবাদ। তাহারা উত্তেজিত হইয়া জবাব দেয়, কাজে আর কাগজে মিলিয়ে দেখ, কাদের রীতি আর নীতিতে মিল বেশী। তোমাদের তো যা কিছু ঐ গরম গরম থিসিসেই সীমাবদ্ধ।

কি ভীষণ তর্ক করিতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ছোট ছোট ছেলেরাও—পদ্মা অবাক হইয়া শোনে। চোখে মুখে ঠিকরাইয়া পড়ে যেন বারুদকণা।

পদ্মা পটুকে দিয়া গরম সিঙ্গাড়া আনায় ঠোঙ্গা ভর্তি। চা আসে —এইবার তর্কটার একটু জিরানী পড়ুক।

জ্যোতির্ময় আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে আন্তরিকতায়।—থ্রি চিয়ারস ফর আওয়ার লিটল কমরেড।

বিপাশা ঝড়ের মত ঘরে ঢোকে—জানায়, ছাত্রদের উপর গুলি চলছে। একটি ছাত্র মারা গেছে।

আর একটাও প্রশ্ন করতে পারে না পদ্মা।

পদ্মার স্তব্ধ নির্বাক দৃষ্টি আর্তনাদ করিয়া উঠে।

চোখের সামনে জ্বলিয়া ওঠে রক্তে ভেজা শার্টের আড়ালে হিমশীতল প্রাণহীণ কচি একটি নির্ভীক চেহারা। কোন মায়ের হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া সংবাদ। পদ্মা আর ভাবিতে পারিতেছে না—

ভোর বেলা উৎকণ্ঠিত চিত্তে পত্রিকার অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণের মধ্যে পত্রিকা দিয়া যায়। আহতদের তালিকায় সব কয় জোড়া চোখ ঝুঁকিয়া পড়ে। পরিচিত নাম সব। প্রসাদের সঙ্গে বহুবার তাহারা এ বাড়ীতে আসিয়াছে। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

মতামতের অসহিষ্ণুতা যতই থাক, দলের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকুক—তবু তাহাদের আরও একটি পরিচয় আছে তাহারা ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত। নির্ভীক তরুণ প্রাণ। বিপাশা, বিশ্বরূপ বাহির হইয়া যায়—ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতিবাদ সভা ডাকা হইয়াছে। পদ্মার বাহির হওয়ার উপায় নাই—ঐ কোলের শিশুটার অর্থহীন করুণ দৃষ্টির মতই অসহায় লাগে নিজের এ অবস্থাকে। ঐ ক্ষুদ্র শিশুটার মুখখানাই যেন তাহার শক্তির উৎস

সারাদিন ঘরে বসিয়া ছটফট করে। কি ভীষণ এ অন্যায়, কি অসহ্য অন্যায়!

এভাবে মানুষকে গুলি করিয়া মারা—মুহূর্তগুলিও যেন বিক্ষোভে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। দূর হইতে মিছিলগামী জনতা চিৎকার করিয়া যায়—নেতাজী জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই।

রৌদ্রদীপ্ত রাজপথে সহস্র পদধ্বনি বিপ্লবের ঘোষণা জানায়। দূরে বড় রাস্তায় মিছিলের পর মিছিল চলিয়াছে।

লাল সবুজ তেরঙ্গা পতাকার মিলিত প্রতিবাদ। পদ্মার ইচ্ছা হয়, সেও ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়—ঐ মিছিলের সঙ্গে মিলিত হয়। সাত-আট বছরের ছেলেরাও নামিয়া পড়িয়াছে আজ খোলা রাস্তায়। বিদ্রোহ জানায় তাহারাও।—চলো চলো দিল্লী চলো। কচি কণ্ঠে বিপ্লবের ডাক। কলিকাতার প্রতিটি মানুষের মনে আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ঘন ঘন গুলির শব্দ শোনা যায়। ভয়ের লেশ নাই কোথায়ও। মানুষের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রতিহিংসায় চাপা আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—ধূমায়িত রাজপথ। গলিতে গলিতে যত দূর চোখে পড়ে, তাকিয়ে দেখে পদ্মা, প্রতিটি দোকানে, গলির মোড়ে বাড়ীর ছাদে, ব্যালকনিতে নেতাজীর ফটো সাজানো। ফুলের মালা আর তেরাঙ্গা পতাকার লহরী।

পদ্মা তন্ময় হইয়া ভাবে, জনসাধারণের এই বিপুল শ্রদ্ধাকেও কি অরুণাভেরা লক্ষ্য করিতেছে না। সাধারণ মানুষের এই অপূর্ব সাড়াকে উপেক্ষা করে তাহারা কি করিয়া!

উদ্বিগ্ন মনে বাড়ী ফেরে অরুণাভ।—প্রসাদ আহত হয়েছে। কারমাইকেলে আছে সে।

—আর কে কে আহত হয়েছে? প্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? -এক নিশ্বাসে প্রশ্ন করে পদ্মা। বিপাশাও হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসে। তাহাদের চেনা শুনা কাহারও প্রাণের ভয় নাই। তবে দুইটি ছাত্র ও একটি রিকসাওয়ালার অবস্থা খারাপ। পদ্মা লক্ষ্য করে, বড় চিন্তাক্লিষ্ট দেখাইতেছে অরুণাভকে। পথ না-পাওয়া শ্রান্ত পথিকের ম্লান অবসন্নতা চোখের গভীরে।

রাত্রিতে অরুণাভের এক সংবাদিক বন্ধু আসে, পত্রিকার রিপোর্টার সে। সারাদিন সে জনস্রোতের পিছু পিছু ঘুরিয়াছে—ঘটনা-মুখর পথে পথে, দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদে প্রাসাদে। পদ্মা আসিয়া বলে, এখানেই এবার খান। খাইতে বসিয়া আলাপ হয়। রিপোর্টারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিখুঁত সংবাদ। বন্ধুটি মৃদু হাসিয়া বলে—শুনে রাখ, তোমাদের কাজে লাগবে। তোমাদের কাগজেই একমাত্র এসব ছাপা হতে পারে। আমাদের ঘুরেই বা লাভ কি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্থান কতটুকুই বা জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিতে। চাকরি করি পেটের দায়ে। উপায় নেই, তাই লিখতে হয়, লিখি। তা না হলে চাকরি থাকবে না। কিংবা

হয়তো সারাদিনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে রিপোর্ট লিখি, ভোরের কাগজ খুলে অবাক হই নিজেদেরই রিপোর্টের বড় নির্ভুল বিকৃতি দেখে। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শীর নাম করে এসব বেমালুম মিথ্যা ছাপাও হয়। আমাদের ও গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। পর পর কয়টা কাগজেইতো চাকরি নিলাম। প্রথম প্রথম অসুবিধা হত। এতটা মিথ্যাকে বরদাস্ত করে তোলা ছোটবেলায় পড়া বোধোদয়ের নীতিজ্ঞানে আটকাতো। এখন দেখছি সর্বত্রই ঐ একই দশা—দিনকে রাত, রাতকে দিন।

পদ্মার এ এক নূতন জন্মলাভ। এতকাল জানিত, পত্রিকায় যা লেখা হয়, সবই সত্যি। পত্রিকা পড়িয়া অবাক হইয়া যায় সে। পাতায় পাতায় শুধু দিনগত ক্ষমতাব রাজনীতি!

প্রসাদের গুলিবিদ্ধ পা-টা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। কাঠের পা দিয়া চলাফেরা করে সুন্দর বলিষ্ঠ একহাবা ছেলেটি। পদ্মা যেন আর তাকাইতে পারে না।

মাত্র কয়টি দিন। কিন্তু কয়টা দিন পদ্মাব মনের কঠিন কোণে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়া গিয়াছে। তাহাব জীবনারম্ভ হইতে সযত্নে প্রতিপালিত অন্ধ শ্রদ্ধা, অন্ধ বিশ্বাস ভীরু মমতা সবই।

প্রসাদ ও পদ্মা একটা মিটিং হইতে ফিরিতেছে। পথে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়। কল্যাণী পদ্মার হাতটা টানিয়া ধরে, স্বর নামাইয়া আগ্রহের সুরে বলে — একদিন যাস আমাদের বাড়ী, অনেক খবর আছে। তারপর আর একটা খবর জানিস তো? একেবারেই মুখ ডুবলো তোর কর্তার।

একটা পাণ্ডুর ছায়া নামে পদ্মার চোখেমুখে। বোঝে কল্যাণী মন হইতেই বিশ্বাস করিতেছে এ অপবাদ। তাহাকে বলাও ভুল, এসবই যে দলগত কারসাজি।

পদ্মা বিদায় লইয়া চলিয়া আসে। দ্রুত পা চালায়।

প্রসাদ অপেক্ষা করিতেছে হেঁদোর মোড়ে। কিন্তু এ কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে প্রসাদ? রূপক না?

প্রসাদ কাছে আসিতে জিজ্ঞেস করে পদ্মা—আমাদের রূপসীর সেই দীপুর বড় ভাই রূপক ব্যানার্জী না?

প্রসাদ হাসে—যা মোটা হয়েছে চিনতে একটু কষ্টই হয়। মদের মেদ তো।

পদ্মা চমকাইয়া উঠে—মদ ধরেছে না কি? এই বয়েসেই?

—ধরা মানে? চুর মাতাল!

পদ্মা দূর হইতে আর একবার তাকাইয়া দেখে রূপককে। রূপসী স্কুলের ছিপছিপে সুন্দর ছোট্ট রুপুর আজ এই পরিণতি?

মাংসল দেহের উপর আদ্দির জামাটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে স্থানে স্থানে। পান-খাওয়া লালরসে ভেজা ঠোঁট আর চোখের হালকা পরিহাস যেন এক ভয়াবহ জীবনেরই ইঙ্গিত জানাইতেছে।

গোপন স্বদেশী যুগে সুকল্যাণদের সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিত এই রূপক পুলিশের চোখের আড়ালে কত দিন, কত রাতের পর রাত। সেই রুক্ষ বেশ, নির্ভীক যুবক, ফেরার রুপুর এই পরিণতি!

প্রসাদ আস্তে আস্তে বলে—আমাদের পার্টিতেও কম দিন কাজ করে নি রূপক ব্যানার্জী। পার্টির সভ্যও ছিল!

পদ্মা নিস্তেজ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—এখন?

—এখন আর কি, যা দেখছো চোখের সামনে। পার্টি থেকেও এক্সপেল্‌ড। এদিকে ব্ল্যাক মার্কেটে বেশ কিছু পয়সাও করেছে। বৌটাও মরল বিষ খেয়ে এই সেদিন। সবাই ভাবলো, এবা বোধহয় মোড় ফিরবে। স্বর্ণদিকে চিনতে তো? তার সঙ্গেই বি হয়েছিল।

পদ্মা ধীর কণ্ঠে বলে—মোড় ফেরার হলে কি আর বিষ ে স্বর্ণ।

তাহাদের গ্রামের পোস্টমাস্টারবাবুর মেয়ে এই স্বর্ণলতা। ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতো রূপককে। পদ্মা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—এই তো জীবন চলছে এ যুগের।

প্রসাদ বলে—অবশ্য স্বর্ণদিরও দোষ ছিল। সে তার স্বামীর আদর্শকে বুঝতে পারে নি। বুঝেছিল শুধু তার দারিদ্র্যকে। ফলে যা হয়।

বাড়ীর দুয়ার হইতেই বিদায় লইয়া যায় প্রসাদ! পদ্মা ডাকে—ঘরে চল, একটু চা খেয়ে যাও।

—আজ আর সময় নেই। এক্ষুণি ছুটতে হবে গ্লাস ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নের মিটিংয়ে।

প্রসাদ ফেরার পথেও দেখে রূপক তেমনি বসিয়া আছে হেঁদোর বেঞ্চিতে। রক্তাভ চোখে অবসন্ন বিজড়িমা।

—এখনো এখানে বসে?

রূপক উত্তর দেয়—গিয়েছিলাম শ্মশানে। স্বর্ণলতার চিতায় একটু ফুল দিয়ে এলাম।

প্রসাদের বিস্মিত মুখখানা একটু দেখিয়া লইয়া বলে—আমার এক বন্ধু মদ খেয়ে বৌয়ের শোকে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। তার কান্না দেখে আমারও স্বর্ণর জন্য কান্না পেয়ে গেল। অনেকক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাঁদলাম। তারপর বন্ধুটি উঠে গেল ফুল কিনতে বৌয়ের শ্মশানে দেবার জন্যে। আমিও তাই দেখে একটু ফুল কিনে শ্মশানে দিয়ে এই মাত্র ফিরলাম।

প্রসাদ আর দেরি করে না। বলে — চললাম, কাজ আছে।

রূপক ডাকিয়া বলে—প্রসাদ, একটা কথা মনে পড়লো। দেখা তোমার সঙ্গে ভালই হল।

প্রসাদ একটু ইতস্তত করিয়া একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়ে। মদের গন্ধে গা বমি-বমি করে। রূপক বলিতে আরম্ভ করে—

ত সূর্যকে।

ইলেকসান আসছে তো। একটু সাবধানে চলো। আমি কাটিয়া নেশার আড্ডায় গুণ্ডাদের যাতায়াত আছে জানো তো। আমার নিজের হাতেও কয়েকটি ভাল গুণ্ডা আছে। তাই বেশ কিছু টাকার অফার পেয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, বেশ মোটা অঙ্কই। তোমাদের মারার জন্য আমার হাতের গুণ্ডাদের লাগিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমি রাজী হই নি। বলে দিয়েছি, ওসব হবে-টবে না। মদ আমি খাই কিন্তু তাই বলে—না না, তার বেশী পাপ করতে রাজী নই। যাই হোক, একটু সতর্ক হয়েই চলো। ওরা প্রস্তুত হচ্ছে সব এলাকাতেই।

রূপক একটা ট্যাক্সী ডাকিয়া উঠিয়া পড়ে। প্রসাদকে ডাকিয়া বলে—চল তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। এক-পা নিয়ে চলতে তোমার অসুবিধা তো কম নয়।

প্রসাদ বলে—অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এখন।—একটু করুণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাইয়া লয় কাঠের পা-খানার উপর—তাছাড়া, আমাকে এখন ঘুরতে হবে অনেক জায়গায়।

রূপক হাসিয়া বলে—আচ্ছা থাক। মাতালের সঙ্গে ঘুরতে দেখলে তোমার আবার দুর্নাম রটবে। মদ খাই বলে যত না দোষ দেবে আমাকে, তোমাকে আমার সঙ্গে ট্যাক্সীতে দেখলে তার চার-গুণ দোষ দেবে, মদ না খেলেও।

ট্যাক্সীটা চলিয়া যায়। প্রসাদ ভাবে, রূপক সবই বোঝে, তবু মদ খায় কেন?

অরুণাভের সঙ্গে দেখা হয় বাস স্টপে। অরুণাভ প্রসাদের মুখে শোনে সব কথা।

—এতো নতুন কথা নয়। গুণ্ডা যে লাগানো হবে, তা জানা কথাই।

প্রসাদ আপসোস করে রূপকের জন্য—মনটা ওর ভালো কিন্তু মদ ধরেই সর্বনাশ—তবে পার্টির বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বলে, উপকার করতে পারি না, অপকারও করবো না।

প্রসাদ চলিয়া যায় জিলা অফিসে। অরুণাভ বাসের অপেক্ষায়

ড়াইয়া থাকে। ট্রাম স্ট্রাইক চলছে। অসম্ভব ভীড় বাসে। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অধীর হইয়া ওঠে লোকে। বলাবলি করে—দেখালো বটে ট্রাম ওয়ার্কাররা। ট্রাম লাইনে যে মরচে পড়ে গেল।

আর একজন মন্তব্য করে—কম্যুনিস্টরা আছে পেছনে। ট্রাম ইউনিয়ান তো তাদেরই হাতে।

অরুণাভ খুশি মনে শোনে।

প্রসাদ দুঃসংবাদ লইয়া আসে, সূর্য মারা গিয়াছে হাসপাতালে ঘণ্টা খানিক আগে। রসিদ আলি দিবসের তৃতীয় দিনে গুলিতে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিল সূর্য।

পদ্মার রক্ত চলাচল যেন থামিয়া যায় এ সংবাদে। একটা প্রশ্নও আর করিতে পারে না সে। সূর্য, তাহাদের সেই রূপসী গ্রামের সূর্য মরিয়া গেল! জনাকীর্ণ রাজধানীর হাসপাতালে, গুলিবিদ্ধ আহতদের মাঝে মৃত্যু হইল আজ রূপসী স্কুলের সেই মালির!

তৃণ সবুজ বর্ন-বনানী ঘেরা স্নিগ্ধ শান্ত গ্রামের গৃহস্থ সন্তান সূর্য, কি দুর্নিবার শক্তির আকর্ষণে এ জঙ্গীবাহিনীর হাতে মরণকে বরণ করিয়া লইল।

বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে, প্রতিহিংসা-উদ্বেলিত রাজপথে নামিয়া আসিয়াছিল সূর্য, ফুলবাগিচায় রক্ত জবার চারায় নিড়ান দেওয়া সেই সূর্য।

পদ্মার চোখের সামনে একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যায় অতীতের দূর ছবিগুলি। একটা ঝুমকো লতার ফুলের জন্য কত খোসামোদ করিয়াছে সে তাহাকে।

ঘর্মসিক্ত মসৃণ তামাটে রঙের বলিষ্ঠ একটি সুপুরুষ মূর্তির আড়ালে, পদ্মার স্তব্ধ দৃষ্টির গভীর হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায় মলিনবসনা,অনবগুণ্ঠিতা একটি রোদনময়ী রমণী মূর্তি—যমুনা। তাহার খেলার সাথী সেই উদ্ধত যমুনা, তাহার আশাপুষ্ট মন এ নিদারুণ

সংবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিবে! যমুনা ভালোবাসিত সূর্যকে। তাহার শেষ আশা, সূর্য দেশে ফিরিয়া যাইবে, দুর্দিন কাটিয়া গেলেই। তাহার জীবনে সুদিন আসিবে এ পোড়ার যুদ্ধ থামিয়া গেলেই। মৃদু আশা-সঞ্চিত নারীমনের এ বেদনা যে কত গভীর, জানে তাহা পদ্মা। সহজাত নারীমন দিয়া আজ বুঝিতেছে যমুনার অবস্থাটা। সূর্যকে ভালোবাসিবার অধিকার নাই—তবু সে ভালো-বাসিয়াছে। তাহার অফুরন্ত প্রেমভরা নারীমনের ঐশ্বর্যকে নিজের ভিতরে গুটাইয়া রাখিতে পারে নাই সে।

পদ্মা ভাবিতে পারে না যমুনার কথা। সূর্যের মৃত্যুতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদারও অধিকার নাই যমুনার, সমব্যথী স্বজন ব্যক্তির কাছে, তাহার সমাজের কাছে। তবু সে না কাঁদিয়া পারিবে না, জানে পদ্মা।

যমুনা কাঁদিবে। নিঃশব্দ মাঠের গোধূলি অন্ধকারে বসিয়া যমুনা কাঁদিবে। কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না সে নিঃশব্দ ক্রন্দন। তবু সূর্য, যমুনার সূর্য আর গ্রামে ফিরিবে না। পদ্মার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে।

অরুণাভ কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। পদ্মার মাথায় হাত রাখে। ক্রন্দনময়ী পৃথিবী। পদ্মার এ চোখের জলে যেন রোদনরতা বিরাট পৃথিবীরই মানসী মূর্তিটিই প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

অরুণাভও চিনিত সূর্যকে। প্রসাদের সঙ্গে দেখিয়াছে সে তাহাকে বহুবার। একসঙ্গেই ছিল তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষুব্ধ জন-তরঙ্গের মাঝে। শেষ দেখা সূর্যের গুলিবিদ্ধ রক্তে ভেজা দৃঢ় মুখখানা চোখের সামনে ভাসে। অরুণাভ প্রসাদের সঙ্গে নিমতলা ঘাটে চলিয়া যায়।

সূর্যের চিতা জ্বলিতেছে। অরুণাভ চুপ করিয়া বসিয়া দেখে জ্বলন্ত চিতার আগুন। চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে বিক্ষুব্ধ কলিকাতার চেহারাটা।

…ক্ষুধার্ত সন্ধ্যা। ট্রাম বাস ট্যাক্সী রিক্সা সব একে একে থামিয়া যায়। হুকারের চিৎকারে আর্তনাদ করিয়া উঠে পথ-প্রান্তর : ডালহৌসী স্কোয়ারে আবার ছাত্র ও জনতার উপর লাঠি, গুলি, গ্যাস। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের একত্রিত বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ।…

রাতের অন্ধকার বিক্ষুব্ধ চঞ্চল কলিকাতাকে আরও রোমাঞ্চময়, আরও রহস্যময় করিয়া তোলে। অলিতে-গলিতে, রেস্তোরাঁয় রোয়াকে, সর্বত্র আবার নবেম্বরের ইঙ্গিত জানায়।

উদ্বিগ্ন রাত্রির অবসানে আসে দিনের আভাস। কিন্তু সারারাত্রির উত্তেজনা ছড়াইয়া আছে ভোরের চোখে মুখে। তারপর ধীরে ধীরে লোক বাহির হয় রাস্তায়। জনতার সৃষ্টি হয়। পত্রিকাওয়ালাকে ঘিরিয়া ধরে। পত্রিকার গাড়ী লুঠ করে। এই উন্মত্ততা জীবনেরই উন্মত্ততা।

রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের জিপ দ্রুত ছুটিয়া যায় ঘন ঘন। বেলা বাড়ে। ওয়েলিংটনে যেন সারা কলিকাতার লোক ভাঙিয়া পড়ে। জনতার বন্যা আজ পথে-পথে। বাঁধভাঙা প্রাণের বন্যা ছুটিয়া চলিয়াছে বিক্ষুব্ধ বাহিরের ডাকে।

পতাকার লহরী—মিছিল। সাধারণ হইয়া ওঠে অসাধারণ। অপদার্থ গুণ্ডা, চোর—তাহারাও আজ সাধারণের সীমায় পৌঁছায়। ডালহৌসী ঘুরিয়া কাতারে কাতারে চলে জনস্রোত।

হাজার হাজার নাগরিকের চোখে অভিনন্দন ঝরে। কাঁদুনে গ্যাসের উপর জল ঢালে গবাক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত। তারপর আবার সন্ধ্যা নামিয়া আসে—রক্তস্নাত এক অভাবনীয় সন্ধ্যা।

রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। ভাঙা গাড়ী আর জ্বলন্ত মিলিটারী ট্রাক। মিনিটে মিনিটে হাত বোমার আওয়াজ।

মিলিটারী লরী ছোটে বিদ্যুৎগতিতে। তারও বেশী দ্রুতগতি হিংসায় উন্মত্ত জনতার। হতাহতের সংখ্যার হিসাব রাখা যায় না আর। ট্রাক পুড়িতেছে চতুর্দিকে, একটি গোরা সৈন্য পড়িয়া আছে দগ্ধ অবস্থায়।

মোড় ঘুরিয়া চলে অরুণাভ। কাছেই একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। একটা বাড়ীর বসিবার ঘরে লোক জমা হইয়াছে বিস্তর। অরুণাভের সাংবাদিক চোখ খোঁজে জীবন্ত সংবাদ। উঁকি মারিয়া দেখে সে—সূর্য পড়িয়া আছে।

গুলিতে আহত সূর্য! বুক কাঁপিয়া ওঠে অরুণাভের। তখনও প্রাণ আছে। জামার পকেট হইতে বাহির করে একখানা রক্তরাঙ্গা 'স্বাধীনতা' কাগজ আর গ্লাস-ওয়ার্কারদের স্ট্রাইকের আবেদন।

হাসপাতালে লইয়া আসে সূর্যকে। একবার একটু জ্ঞান হইয়াছিল। কি যেন বলিতে চহিয়াছিল কিন্তু বলিতে পারে নাই। সে কথা না-বলাই রহিল মহাকালের বুকে।

জলভরা চোখে দেখে অরুণাভ, উর্ধ্বমুখী চিতার আগুনে জ্বলিতেছে সূর্যের শেষ চিহ্ন। কত অগণিত শহীদেব চিতাভস্মের সাথে মিশিয়া যাইতেছে সূর্যের দেহাবশেষ।

গভীর আবেগে মনে মনে বলে অরুণাভ—মহাকালের মানুষের পবিত্র মন্দিরে তোমার স্থান অক্ষয় হয়ে রইল।

সুকল্যাণ মুক্তি পাইয়া দেশে যাইতেছে। একদিনের জন্য কলিকাতায় থাকিয়া পদ্মাকে সঙ্গে লইয়া যায়। কতকাল পর পদ্মা পদ্মার উপরে। ষ্টীমার চলে ধীরে ধীরে, চড়ায় আটকাইয়া যাইবার ভয় আছে। শীতের নিস্তেজ পদ্মা। স্থানে স্থানে চর পড়িয়াছে, চরের বুকে চক্রাকারে উড়িতেছে সাদা হাঁসগুলি, ঠিক একটি শ্বেত পদ্মের মালার মত। সূর্যাস্তের লাল আভা পড়িয়াছে ধানক্ষেতের উপর। পদ্মা তন্ময় হইয়া দেখে নদীমাতৃকার এ অপরূপ দৃশ্য। চরের বুকে কলাগাছের আড়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শনের ঘর। বহুদূরে গ্রামের সীমারেখা সেই তালগাছের সারি। থাকিয়া থাকিয়া একটা বিষণ্ণ সুর ছুঁইয়া যায় মনের তলায়। পাঁচ বছর আগের সেই দৃশ্য। সেই গ্রাম। তবু সেই গ্রাম আর নাই।

ষ্টীমার আজ লেট, উল্টা স্রোতে আসিতে হইতেছে। ষ্টীমারের

ভিতরে অর্ধেকাংশ জুড়িয়া আছে মিলিটারী সৈন্য। দেশী, বিদেশী সব রকম সৈন্যই আছে। তিলার্ধ স্থান নাই ষ্টীমারে। যাত্রীদের কষ্টের শেষ নাই—যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে তবু।

পদ্মা বারে বারে তাকাইয়া দেখে সুকল্যাণকে। অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে। মুখে বলে—বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ, ছোড়দা।

—তা একটু হব না। —হাসিয়া সুকল্যাণ বলে—অত্যাচার তো আর কম জোটে নি ভাগ্যে।

শশাংকশেখর আসিয়াছে ষ্টীমার ঘাটে। আরও অনেক পুরানো মুখ। কাঠের পুলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে নগেন্দ্রশেখর ও তারাসুন্দরী। কুসুমলতা কাশীতে চলিয়া গিয়াছে কিছুদিন আগে। অল্পের জন্য দেখা হইল না কল্যাণের সাথে, আপসোস করে তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরী পদ্মার মেয়েকে কোলে তুলিয়া চুমা খায়—এ কোন আকাশের চাঁদ নেমে এল আমাদের মরা-গাঙে।

মরা গাঙই বটে। পদ্মা তাকাইয়া দেখে। বাঁশঝাড়ের আড়ালে নিষ্প্রাণ বাড়ীগুলি। শ্রীহীন।

সৌদামিনী ছুটিয়া আসে মাস্টারবাবুর বাড়ীর উঠানে। সুকল্যাণকে ডাকিয়া বলে—আস দেখি একটু কাছে, দেখি ভাল কইরা; আমরা ত আশা ছাইড়াই দিছিলাম। আমাগো সেই পদ্মার কোলে মাইয়া দেইখা যাইতে পারুম এতো ভাবিই নাই। আজ এই বাড়ীর উঠানে কত নাচ তামাসা হওনের কথা। কে করবো, কেউ কি আর বাইচা আছে!

চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে বৃদ্ধার। তাহার হারধনের মুখখানা চোখের সামনে ভাসে। শেষ-দেখা কঙ্কালের মত চেহারাটা।

তারাসুন্দরী ছেলেকে দেখে কাজের ফাঁকে ফাঁকে। গায়ে মাথায় হাত বুলায়। থাকিয়া থাকিয়া চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতে চায়। আবার যদি চলিয়া যাইতে হয় কল্যাণকে।

সুকল্যাণ হাসে একটু। এত ভয় কিসের?

আবার চলিয়া যাইবে স্থকল্যাণ কলিকাতায়। ছাড়িয়া দিতে চায় না মন। স্থকল্যাণ ও পদ্মাকে একসঙ্গে পাইবে এ যেন কল্পনায়ও পৌঁছায় নাই দীর্ঘকাল।

সন্ধ্যার সময় যমুনার সঙ্গে পদ্মার দেখা হয় দীঘির ঘাটলায়। কলসী ভরিয়া কাঁখে জল তুলিয়া লয় যমুনা। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে—সুন্দর খুড়ি, প্রতাপ কাকা, ভালো আছে? তাগো লগে দেখা হয়? স্থন্দর খুড়ির পোলা কত বড় হইছে?

পদ্মা উত্তর দেয় গোনা কথায়। বুকটা ভারী হইয়া ওঠে, আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে না কি যমুনার?

মুহূর্তগুলিও যেন থামিয়া গিয়াছে যমুনার এ ভাষাহীন জিজ্ঞাসার অপেক্ষায়।

একটু চুপ থাকিয়া যমুনা জিজ্ঞাসা করে ম্লান কণ্ঠে—সত্যিই কি প্রতাপ কাকার ভাইয়েরে গুলি কইরা মারছে! ক্যান? কোনও অন্যায় ত করছিল না সে। খামকা খামকাই গুলি কইরা মারলো পুলিশে!

কি উত্তর দিবে পদ্মা। কি করিয়া বুঝায় সে, মানুষকে হত্যা করিবার এ অধিকার কে দিল মানুষকে!

যমুনার এ নীরব জিজ্ঞাসার উত্তর আসিবেই একদিন। কিন্তু আজ জবাব খুঁজিয়া পায় না পদ্মা। শুধু উপলব্ধি করে সর্বহারা নারীহৃদয়ের শোকার্ত দীর্ঘনিশ্বাসগুলি।

কোমল হাতে পুরানো বান্ধবীর হাতখানা ধরে পদ্মা। যমুনা চলিয়া যায় ধীর পায়ে। হয়তো আর আসিবে না সে।

অন্ধকার পথে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে। জোনাকী জ্বলিতেছে ঠিক আগেরই মত ছায়াময় দীঘির বুকে। সেই কাঁঠালি চাঁপা, অশোক দেবদারু সবই আছে। তবু সূর্য তো আর ফিরিবে না এই রূপসী গ্রামে।

পদ্মা দেখে নগেন্দ্রশেখরের শেলফেও সোভিয়েটের বই। গভীর

মন দিয়া লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া পড়ে নগেন্দ্রশেখর সোভিয়েট সমাজের নূতন কাঠামোর কথা।

পদ্মা তার জ্যেঠামণির মুখে শোনে রাশিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

—ধর্ম কি শুধু মন্ত্র জপলেই হয়। বেদের বাণীকে রূপ দিতে পারে নি আমাদের দেশ, কিন্তু রাশিয়া পেরেছে। 'ঈশাবাস্যমিদম সর্বম' একথা আমরা শুধু মুখেই বলি। কিন্তু কার্যত এটা পালন করেছে সোভিয়েট। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন—নগেন্দ্রশেখর চশমা পরিয়া একটি ছাপানো অংশ পড়িয়া শুনায়—যতদিন পর্যন্ত এই কোটি কোটি লোক বুভুক্ষায় ও অজ্ঞতায় দেহ ধারণ করিবে ততদিন পর্যন্ত যাহারা ইহাদেরই অর্থে শিক্ষালাভ করিয়া, ইহাদের উন্নতির প্রতি সামান্য মনোযোগও প্রদর্শন করে না, তাহাদের প্রত্যেককে আমি এক বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিব।

নগেন্দ্রশেখরের কণ্ঠে বেদনার সুর ফুটিয়া উঠে। একটু চুপ থাকিয়া বলে—একখানা বই পড়লাম সেদিন—রাশিয়া ইজ আওয়ার জয় এ্যাণ্ড আওয়ার লিবার্টি, আওয়ার পাষ্ট এ্যাণ্ড আওয়ার ফিউচার আওয়ার হার্ট এ্যাণ্ড সোল—পড়ে আমার মনে হল ভারতবর্ষের যুবকেরাও একদিন স্বামীজীর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলবে—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবর্ষ আমার প্রাণ, ভারত আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী—ভারতবর্ষ আওয়ার পাষ্ট অ্যাণ্ড আওয়ার ফিউচার।

কুসুমলতা কাশীতে আছে। সহরের প্রায় শেষ মাথায়। খুবই ছোট একটা দেশী টালির ঘর।

রাত্রির জন্য লণ্ঠনটি ঠিক করিতে গিয়া দেখে কুসুমলতা এক ফোঁটাও তেল নাই বোতলে। তাড়াতাড়ি দুপুরবেলাই বাহির হয় কেরোসিন আনিতে। একহাতে কেরোসিনের বোতল, আরেক হাতে অস্থিসার দেহের সম্বল একটি মজবুত লাঠি। গায়ে জড়ানো

একখানা জীর্ণ উড়নি। দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার গাঢ় ছায়াময় এক আত্ম-তন্ময়তার পর্দা দৃষ্টিতে!

অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে লাঠিতে ভর দিয়ে চলে অশীতি বয়স্কা বৃদ্ধা—কেরোসিনের দোকানের দিকে।

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত ধূলিকণা। পায়ের তলাটা পুড়িয়া যায় মনে হয়, প্রতি পদক্ষেপে।

খড় বোঝাই একটা গরুর গাড়ী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় কিছু ধূলা উড়াইয়া। উড়নির কোণাটা মুখে চাপিয়া ধরে বৃদ্ধা! তবু কিছুটা ধূলা ফুসফুসে ঢুকিয়া যায় মনে হয়। শেষ বয়সে মানুষের কষ্টের যেন আর শেষ নাই। এই অচল দেহটাকে আর টানিতে পারিতেছে না। এরই মধ্যে মনে হয়, কয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে সে। গাছতলায় বসিয়া একটু জিরাইয়া লয়। সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চায় না কুসুমলতা। জীবনের বাকী কয়টা দিন বিশ্বনাথের পায়ে পড়িয়া থাকিতে চায়।

তাহার সমস্ত জীবনের সাধনা—আশ্রম, বালিকা বিদ্যালয় সবই তো গিয়াছে, আর কিসের জন্য সংসারে থাকা। সমস্ত দেশব্যাপী ভাঙ্গন শুরু হইয়াছে। একদিকে ভাঙ্গা আর একদিকে গড়া। আরেক নূতন যুগ স্থুরু হইতেছে এই ভাঙ্গনের ভিতর হইতে। কুসুমলতা বোঝে, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহার আর শক্তি নাই আজ। কোন কাজেই লাগিবে না এই অসমর্থ দেহ।

গঙ্গার বুক হইতে উঠিয়া আসে একটা অস্থির হাওয়ার ঢেউ। ক্ষণিকের জন্য জুড়াইয়া দিয়া যায় রৌদ্রদগ্ধ দেহটাকে।

আবার হাঁটিতে আরম্ভ করে। তেল লইয়া ফিরিতে ফিরিতে বেলা ঢলিয়া পড়ে। ঘরের দাওয়ায় লাঠিটা রাখিয়া বসিয়া পড়ে। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে। এদিকে পিয়ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দুয়ারে। মনি অর্ডার আছে কুসুমলতার নামে।

কুসুমলতা তাড়াতাড়ি চশমা বাহির করিয়া নাম সই করে। পাঁচটি টাকা গুনিয়া লয়! কুপনটি ছিঁড়িয়া দিয়া পিয়ন চলিয়া

যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা কুপনটা মন দিয়া কুসুমলতা পড়ে! প্রকাশ জানাইয়াছে আগামী মাস হইতে সে আর টাকা পাঠাইতে পারিবে না। তাহার নিজের সংসার লইয়াই ব্যস্ত—তাই দূর আত্মীয়, মামী পিসী খুড়ি জ্যেঠির খোঁজ লওয়া আর সম্ভব নয় তাহার।

কুসুমলতার হাত হইতে কুপনটুকু খসিয়া পড়িয়া যায়। একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করে ভিতরে। এতখানি রূঢ় না হইলেও পারিত প্রকাশ। প্রকাশের শিশুমুখখানি মনে পড়ে—সেই আধ আধ কথা।

মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল প্রকাশ তাহাকে কাশী আসিবার পূর্বে। এই দুর্মূল্যের বাজারে কি ভাবে যে কি চালাইবে ভাবিয়া পায় না কুসুমলতা। কি দিয়াই বা ঘরভাড়া দিবে এমাসের। ঘরে গিয়া জল খায় কাণাভাঙা একটি পাথরের গ্লাসে। পিপাসার নিবৃত্তি হয় কিন্তু চিন্তার উপশম হয় না।

রাস্তা দিয়া এক পুরানো কাগজওয়ালা ডাকিয়া চলিয়াছে—কাগজ বিক্রি। পুরাণা কাগজ বিক্রি।—রোজই যায় লোকটি।

ঘরের কোণায় টিনের ভাঙা সুটকেসটা চোখে পড়ে। কাগজ বোঝাই সুটকেসটা দেখে স্থির চোখে। জীবনের অতীত অধ্যায় সাজানো কাগজের স্তরে স্তরে। কবিতা আর প্রবন্ধে ঠাসা সুটকেস। রাস্তা দিয়া ক্রমেই ভাসিয়া আসে কাগজওয়ালার চিৎকার—কাগজ বিক্রি।

কুসুমলতা লোকটিকে ডাকে। অতি কষ্টে সুটকেসটি টানিয়া আনে বাহিরে।

কাগজওয়ালা গররাজীর সুরে বলে—এতো মা সব বহু পুরানো কাগজ। পত্রিকার কাগজ নেই?

বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইয়া বোধহয় একটু দয়া হয় তাহার। —আচ্ছা, নিয়ে যাই। ঠোঙা বানানো চলবে। কিন্তু দাম কিছু কম হবে!

ওজন হইতে থাকে কুসুমলতার সারা জীবনের সাধনা। দাম হয় তু টাকা সাড়ে দশ আনা। কুসুমলতা কম্পিত হাতে গুণিয়া লয় দামটা। লোকটি কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইতে থাকে। কুসুমলতা একখানা খাতা তুলিয়া লয়—দেখি, একটু এই খাতাটা।

তাহারই বিগত জীবনের সকরুণ রোজনামচা। শেষবারের মত চোখ বোলায় সে। গাঢ় ব্যথা ঘনাইয়া ওঠে চোখে। প্রতিটি পাতা তাহারই বুকের রক্ত দিয়া লেখা যৌবনের প্রতিটি সন্ধ্যায়।

লোকটি ব্যস্ত হইয়া ওঠে। — মা বেলা আর নেই। আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

কুসুমলতা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া দেয় খাতাখানা। লোকটি, চলিয়া যায়। বৃদ্ধা পয়সাগুলি হাতের মুঠিতে চাপিয়া বসিয়াই থাকে তুয়ারে। উঠিবার শক্তি আর নাই। অবশ হইয়া গিয়াছে যেন তাহার প্রতিদেহের অবশিষ্ঠ শেষ শক্তিটুকু। মনে হয়, আজীবন স্নেহ মমতায় পালিত একটি জীবন্ত সন্তানকেই বিক্রি করিয়া দিল সে আজ তুই টাকা দশ আনার বিনিময়ে।

ইলেকসন আসিতেছে। ট্রামে বাসে, পথে পথে, সর্বত্র একমাত্র কথা—ইলেকসন। তিরানব্বই ধারার অবসান হইবে এতদিনে। আবার জাতীয় মন্ত্রীদের হাতে আসিবে দেশ-শাসনের ভার। সুখ সুবিধা কিছু হয়তো হইবে এতদিন পরে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টারের পর পোষ্টার। লাউড স্পাকারে ভোটপ্রার্থীর গুণগান।

শ্লোগানের পর শ্লোগান। লরী বোঝাই স্বেচ্ছাসেবকরা সংসারী, অফিস-ফেরতা বাবুদের সতর্ক করিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া যায়, ভোট দানের গুরু সমস্যা সম্বন্ধে। 'ভোট দিন—' 'ভোট দিন—' চিৎকারে মুখরিত হয় আধ-অন্ধকার অলিগলিও।

মেয়েরাও ভোটাধিকার পাইয়াছে এইবার। মেয়ে মহলে ঘোরে স্বেচ্ছাসেবিকারা।

কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, তপশীল, কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট সব দলেই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, প্রতি অঞ্চলে।

ইরা, বিপাশা ঘোরে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় পাড়ায়— অন্দর মহলে, উঠানে ও ঘরে ঘরে।

ইরা আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যায় পদ্মাকে—একা, একা ঘুরতে ভাল লাগে না—চল একটু সাথে।

পদ্মা যায় ইরার সঙ্গে সঙ্গে। গোলক ধাঁধার মতো গলির পর গলি—কোথা হইতে যে আরম্ভ, আর কোথায় শেষ বোঝা দুষ্কর। নোংরা আবর্জনার স্তূপের পাশ কাটাইয়া সন্তর্পণে হাঁটে পদ্মা। পচা চিংড়িমাছের খোসার দুর্গন্ধে পেটে মোচড় দিয়ে উঠিতে চায়। তাড়াতাড়ি উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে দুইজনে।

আধাবয়সী বিধবা একজন অবাক হইয়া বাহির হইয়া আসে ঘরের ভিতর হইতে। বিস্ময় ফুটিয়া উঠে চোখে, কথা বলিবার অবসর দেয় না আর এ বিষম-খাওয়া বিস্ময়।

ইরাই পরিচয় দেয় নিজেদের, জানায় কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে তাহারা।—এবার তো ভোটের অধিকার পেয়েছেন আপনারাও।

বিধবাটির কথা আসে মুখে এতক্ষণে।—ভোট? ভোট কাকে বলে আবার?

ইরা ধীরে সুস্থে বুঝায়, ভোট কাহাকে বলে।

পদ্মা হাসে মনে মনে ইরার অবস্থা দেখিয়া। মনে মনেই হিসাব করে, ভোট কাহাকে বলে হইতে ভোট কাহাকে দেবে এ বুঝাইতে কত সময় লাগিবে ইরার। কোথায় আছি আমরা— ভাবে পদ্মা, আর এখনই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—রব উঠিয়াছে— গেল গেল দেশটা, মেয়েদের স্বাধীন করিয়া দেওয়ায়—

ইরা বুঝাইয়াই চলিতেছে।

অবিবাহিত কয়েকটি বয়স্ক মেয়েও আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়। মনোযোগ তাহাদের যত না ইরার কথায়, তার চাইতে দ্বিগুণ মনোযোগ ইরাকে দেখায়!

হাতে ঘড়ি পরিয়াছে মেয়েমানুষেও! প্রতিটি চোখই একবার করিয়া ঘুরিয়া যায় তাহার হাত-ঘড়িটার উপর। একজন বয়স্ক মহিলা প্রশ্ন করে—সঙ্গে পুরুষ নাই কেউ?

ইরা উত্তর দেয়—না আমরা একাই বেরিয়েছি।—মহিলাটি একটু সিঁথির দিকে তাকাইয়া দেখে—আর কোনও কথা বলে না।

এদিকে ইরার পুরোপুরি একঘণ্টা বুঝাইবার পর উত্তর দেয় ঘরের সধবা গৃহিণী আসিয়া—কিন্তু, বাবু না এলে তো আমরা কিছু বলতে পারবো না।

পদ্মা মনে মনে বলে—হায় হতোস্মি।

মুখে বলে—আচ্ছা বাবুকেই জিজ্ঞেস করে রাখবেন। আমরা আবার আসবো।

আরেকটা গলিতে ঢোকে তাহারা। একই দৃশ্য প্রতি উঠানে। উঠানের চতুর্দিক ঘিরিয়া জীর্ণ দালান। চুনকামহীন, কিংবা চল্লিশ বছর আগে চুনকামকরা ছোট ছোট আধ-অন্ধকার ঘর। ঘরের ভিতরে জায়গার চাইতে জিনিস বেশী—পুরান আমলের ষ্টীলের ট্রাঙ্কের উপর ট্রাঙ্ক, কেরোসিন কাঠের তক্তাপোষের উপর স্তূপীকৃত মলিন শয্যা। কোন কোন ঘরে একটা ময়লা চটের পুরু পর্দা পৃথক করা—নববধূর সাথে মধুরাত্রি যাপনের ঐকান্তিক ব্যবস্থা।

দড়ির উপর ঝুলান ছেঁড়া, ধুতি, সার্ট, ময়লা লুকাইয়া রাখার জন্য রঞ্জন সাবানে রং-করা রঙ্গিন শাড়ি, ছোট ছোট ফ্রক, জাঙ্গিয়া।

কুলুঙ্গীতে নারিকেলের সুবাসিত তেল, সিন্দুরের কৌটা, ফিতা-কাঁটা চিরুণী। দারিদ্র্য যতই থাকুক, একটু প্রসাধন না করিয়া পারে না মেয়েরা।

কোণায় মাটির হাঁড়িতে সপ্তাহের রেশন। তাকের উপরে তেল-সিঁদুরে লেপা লক্ষ্মীর ছবি, কড়ি, শঙ্খ, তেলের প্রদীপ।

মনে মনেই হাসে পদ্মা, এমন শ্রীহীনতায়ও হাঁপাইয়া উঠেন না লক্ষ্মীদেবী! যুগের হাওয়া বুঝিয়া চলিতে জানেন বুঝি দেবতারাও! তাই ভাঙা ঘরেই বাঁধা পড়িয়াছেন তিনি আপন মহিমায়

লক্ষ্মীহীন ঘর একখানাও চোখে পড়িল না পদ্মার। কিন্তু দেবতারা হাঁপাইয়া না উঠিলেও, পদ্মার মন হাঁপাইয়া উঠে—ভারতের সম্পদ, শ্রী—সীতাসাবিত্রীর দেশ এইতো? এইতো আমাদের অহংকার।

পদ্মা স্থির দৃষ্টিতে দেখে ঘরের বাসিন্দাদের। আদরও একটু করে ঘিরিয়া দাঁড়ান উলঙ্গ শিশুদের। কিন্তু মনের তলায় কাতার দিয়া চলিয়াছে অনন্ত প্রশ্ন।

বিকেলের দিকে যায় আবার তাহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলাকায়। পদ্মাকে ছাড়ে না ইরা—এসব কাজও একটু শেখ।—অগত্যা যায় সেও। তেলসিঁদুরে লেপা লক্ষ্মীদেবীকে জোর করিয়া আটকাইয়া না ফেলিলেও শ্রী আছে ঘরে ঘরে। প্রাচুর্য না থাকিলেও পরিচ্ছন্নতা আছে। দৃষ্টির রুচিবোধও ফুটিয়া উঠিয়াছে কোন কোন গৃহে।

সকালের মত বিব্রত বোধ করে না পদ্মা নিজেদের পরিচ্ছন্ন বেশভূষা লইয়া।

আপ্যায়ন করিয়া বসায়, চলিয়া আসার সময় অকুণ্ঠিত নমস্কার জানায়। পরিচিত বাড়ীতে চা-ও খাওয়ায়। পদ্মা এ বেলায় একটু নিশ্চিন্ত হয়, না, ভারতবর্ষ ভোলে নাই এখনও আতিথ্যের মর্যাদা।

কিন্তু ইরার সমস্যা কাটে না। সেই একই প্রশ্ন প্রফেসারের পত্নীর কাছেও আশা করে নাই সে।

রেবা তার নূতন সাজানো বসিবার ঘরে শেলফের উপর স্বামীর প্রগতি-সাহিত্যগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে জবাব দেয়—কিন্তু উনি না এলে তো বলতে পারব না কাকে ভোট দেওয়া হবে।

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পিচ ঢালা রাস্তার দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে বসন্তের লাল আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে, আমেজ-মাখান দখিন হাওয়া বহিয়া আসিতেছে দূর সমুদ্র হইতে। রাস্তার ধারে একটা মন্দিরে সন্ধারতি আরম্ভ হইয়াছে। মন্দিরের শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে স্তরে স্তরে ভক্তবৃন্দের দেবানুভূতি!

অজ্ঞানতার তমসায় ঢাকা থাক গৃহগুলি—তবু দেবতার মন্দিরে মন্দিরে জ্বলিতেছে শত সহস্র দীপশিখা, জ্বলিবে আরও বহুকাল।

পরমব্রহ্মের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত মন্দির-চূড়া। অনন্ত জিজ্ঞাসা-ভরা মানব ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া যাক্ এ জ্যোতি দেবতার বেদীতলে—।

অর্বুদ কোটি গৃহ থাকুক অন্ধকার, চির অন্ধকারে—ক্ষতি নাই।

কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে খোল করতালের তালে তালে। এইতো ভারতবর্ষ। পদ্মার মন আজ বিরূপ হইয়া উঠে। সূক্ষ্ম শ্লেষ উঁকি মারিয়া যায় মনের অন্তরালে।

পদ্মা তাকায় আবার সম্মুখে, রাজপথে। একটা যাত্রী-বোঝাই ট্রাম চলিয়া যায়—বিদ্যুতে বিদ্যুতে চমক লাগাইয়া। ভিতরে ভোট-প্রার্থী স্বেচ্ছাসেবকের কণ্ঠনালী চিরিয়া-যাওয়া চিৎকার—ভোট দিন—

ইরা ও বিপাশার ঘোরার আর বিরাম নাই। তবু শ্রান্তি নাই। এই ভোটের উপরই নির্ভর করিতেছে তাহাদের ভাগ্য। অদূরে পৃথিবীতে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে আবার এক ভয়ঙ্কর দানব।

ভিতর হইতে কে যেন সতর্ক করে বারে বারে—চলো, চলো দ্রুত চলো।

কপালে ঘাম ঝরে, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া আসে বারে বারে। উত্তপ্ত পিচে পায়ের চটি গরম হইয়া উঠে—রাস্তার লোকের গালাগালিও কানে আসে—তবু অক্ষতই বাড়ী ফেরে তাহারা। কিন্তু সমীর, কল্যাণ, বিপ্লব—মার খাইয়া আসে গ্লাস-ফ্যাক্টরী হইতে। কল্যাণের কপাল ফাটিয়া গিয়াছে—পদ্মা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয় নিজহাতে। আয়োডিনে জ্বলিয়া উঠে ক্ষত, কিন্তু তারও বেশী জ্বলিয়া উঠে মনের ক্ষত।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াই তারা আবার নামিয়া পড়ে রাস্তায়। পদ্মা ব্যালকনিতে দাঁড়াইয়া দেখে শুভাকাঙ্ক্ষাভরা চোখে তাহাদের পথ-চলা। মনে মনে ভাবে, এ সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবে কবে?

ইলেকসনের দিন আসিয়া পড়ে। অরুণাভ পোলিং এজেণ্ট হইয়া যায়। খদ্দর পরিহিত সৌম্যদর্শন সাংবাদিক অরুণাভকে আপ্যায়ন

করিয়া বসায় পোলিং অফিসার। মৃদুগলায় আশ্বাস দেয়—আপনার যা কিছু প্রয়োজন জানাবেন—আমরা তো আছিই।

মনে মনে স্বরূপ চিনিয়া রাখে অরুণাভ পোলিং অফিসারের; মুখে কিছু বলে না।

দারোগাবাবু আসিয়া পান খায়, সিগারেট খায় একসঙ্গে, অরুণাভকেও সাধে সিগারেট একটা। অরুণাভ ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তারপর মৃদুস্বরে কথাবার্তা হয় দারোগাবাবুর সঙ্গে পোলিং অফিসারের। চলিয়া যায় দারোগা।

নির্দিষ্ট সময়ে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়। পোলিং অফিসার বিস্মিত হইয়া দেখে অরুণাভ আসিয়াছে কম্যুনিস্টদের এজেণ্ট হইয়া।

হতবাক হইয়া যায় সে মুহূর্তের জন্য! তারপর ধীরে ধীরে চোখে মুখে নামিয়া আসে কঠোর আক্রোশ।

দত্তগুপ্ত আবার অরুণাভকে ডাকাইয়া কৈফিয়ৎ চায়, তাহার কাগজে কেন কংগ্রেসবিরোধী রিপোর্ট ছাপানো হইয়াছে।

অরুণাভ উত্তর দেয়—কংগ্রেসবিরোধী হতে পাবে। কিন্তু রিপোর্ট যা ছাপা হয়েছে, সম্পূর্ণ সত্য।

মিঃ দত্তগুপ্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে একটু—সত্য-মিথ্যা বুঝি না। আমাদের কাগজের নীতি অনুসারেই সংবাদ ছাপানো হোক, এই আমি চাই।—ব্যস্ত পদক্ষেপে চলিয়া যায় দত্তগুপ্ত।

অরুণাভ চুপ করিয়া ভাবে এর চাইতে অপমান আর কি সাংবাদিকের জীবনে! সাংবাদিক হইয়াও সত্য সংবাদ ছাপাইতে পারিবে না।

চাকরি ছাড়িয়া দিবে নাকি, ভাবে একবার, আবার ভাবে, চাকরি ছাড়িয়াই বা কি হইবে। ইহার বিরুদ্ধেই তো সংগ্রাম তাহাদের। সংগ্রাম, সংগ্রাম, চতুর্দিকে সংগ্রাম। আরেকজন সাব-এডিটার লক্ষ্য করে অরুণাভের দ্বিধাগ্রস্ত মৌনভাব। সে বলে—কেন অনর্থক গোলমাল সৃষ্টি করেন ওসব কম্যুনিজমের কথা ছাপিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই অরুণাভকে জানান হয় তাহাকে রবিবাসরীয় সম্পাদকের পদে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। অরুণাভ বোঝে, নিউজ এডিটারের পদে আর তাহাকে রাখা চলিবে না। এখানে যে আর বেশী দিন টে'কা যাইবে না তাহাও বোঝে মনে মনে।

ইরা ও পদ্মা বাহির হইয়াছে তাহাদের কাগজের জন্য চাঁদা তুলিতে।

পথে দুইজন কমরেডের সঙ্গে দেখা হয়। ইরা তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয় পদ্মার—আমাদের একজন সিম্প্যাথাইজার। কমরেড অরুণাভের—

চশমাপরা ভদ্রলোকটি ঠাট্টার সুরে বলে—পদ্মাকে তো চিনি আমি, কিন্তু কথা হচ্ছে, এখনও দরদীর চৌকাঠ ডিঙ্গতে পারলে না, দরদ আছে প্রচুরই তবে, বুঝতে হচ্ছে ?

পদ্মা হাসে। কিন্তু মনটা একটু বিষণ্ণ হইয়া যায়। এগিয়ে যায় ভদ্রলোক দুইটি।—মিটিং-এ যাচ্ছেন তো।

ইরা ও পদ্মা আগাইয়া যায় মহম্মদ আলি পার্কের দিকে। একটা মিছিল চলিয়াছে শ্রমিকদের। লাল ঝাণ্ডা হাতে হাতে। ছাত্ররাও চলিয়াছে পেছনে।

ইরা উৎসাহী চোখে দেখে, মৃদুস্বরে বলে—মস্ত বড় প্রসেশন কিন্তু !

পদ্মা চোখ বুলায় মজুরদের হাতের ফেষ্টুনগুলির উপর।

সুপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা হয়। পদ্মা লক্ষ্য করে, ইহার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সুপ্রিয়কে দেখিয়া ! পদ্মা কি একটু আন্দাজ করে মনে মনে।

ইরার আর কথা ফুরায় না। প্রতি পনের মিনিটেই কমরেডদের সঙ্গে জরুরি কথা বলিতে যায় সে।

ওদিকে সভামঞ্চের উপর মাইক পরীক্ষা চলিয়াছে, হ্যালো-হ্যালো হ্যালো ! এক দুই তিন—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।···ছাত্র-ছাত্রীরা ফুটো বাক্সে চাঁদা তুলিতেছে রেড্ হাসপাতালের সাহায্য।

সভা আরম্ভ হয়। মাইকে গর্জিয়া উঠে বক্তাদের ওজস্বিনী বাণী। কে একজন বক্তা বলিয়া যাইতেছেন, চেনে না পদ্মা। উত্তেজনা-পূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বর। পদ্মার আর দেরি করা চলে না। মেয়েকে খাওয়াইতে হইবে। সে উঠিয়া পড়ে।

সভামঞ্চে বক্তৃতা চলিতেছে—অগ্নিবীজ ছড়াইয়া পড়ে নীরব শ্রোতাদের মনে। পদ্মা একটু একপাশে দাঁড়াইয়া শোনে—রাজপথে একাধিক জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি করেও কলিকাতার বিপ্লবী যুবশক্তিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথ হতে ফিরানো যায় না, এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

পদ্মার আর দাঁড়াইবার উপায় নাই। ব্লাউজ ভিজিয়া উঠিয়াছে বুকের দুধে, ক্ষুধায় কাঁদিতেছে হয়তো মেয়েটা। পদ্মা তাড়াতাড়ি পা চালায়। দূর হইতে কানে আসে মাইকের গুরু গর্জন—অসংখ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের যে চোখ খুলছে, হীন প্রচারকের কোনও বক্তৃতাই সে চোখে ঘুম নামাতে পারবে না।···

জ্যোতির্ময় আসিয়াছে সুকল্যাণের কাছে।

প্রসাদও আছে ঘরে। সে ও সুকল্যাণ এখন একসঙ্গেই থাকে। সুকল্যাণ কিছুতেই কমিউনে থাকিতে দেয় না প্রসাদকে। বলে—মতটা না হয় আলাদা, একই বাড়ীতে জন্মেছি আমরা, সেটা তো ভুললে চলবে না। রূপসী গেলে তুই কি আলাদা হাঁড়ি নিয়ে বসবি ভাত ফুটাতে?

সুকল্যাণও সহিতে পাবেপ্রস না সাদের এই কাটাপায়ের দৃশ্য। ট্রাম-বাসভরা রাস্তায় ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলে প্রসাদ কাঠের পা লইয়া—সুকল্যাণ দেখে, ভাবে, কোন বিপদ আবার না ঘটে।

সতর্ক করিয়া দেয়—একটু সাবধানে চলিস ফিরিস। ঘোরাঘুরিটা একটু কমালে চলে না।

প্রসাদ বলে—ঘোরাঘুরি কমাব কি। গ্লাসফ্যাক্টরীর ইউনিয়নটি যেতে বসেছে। তবু শেষ চেষ্টা তো দেখতে হবে

সুকল্যাণ চুপ করিয়া থাকে, সেও তো জানে, এই এক একটি ইউনিয়ন ভাঙা গড়ার ব্যথা ও আনন্দ কি ভাবে দাগ কাটে আশাপুষ্ট তরুণ মনগুলিতে। এইতো দেশসেবকের জীবন, এইতো তাহাদের জীবন-রোমাঞ্চ।

জ্যোতির্ময় বলে—গ্লাসফ্যাক্টরীর ইউনিয়নকে রাখা সোজা নয়।! যা কংগ্রেস ভক্ত হয়ে উঠেছে আজকাল প্রকাশদা।—হাসে জ্যোতির্ময়।

একই পাড়ায় থাকে তাহারা। জ্যোতির্ময়ের কাকা ঐ পাড়ার কংগ্রেস সেক্রেটারী। জ্যোতির্ময় বলিয়া যায়—ইলেকসনের আগে এসেছিলেন প্রকাশদা আমাদের বাড়ীতে কাকার কাছে। তুই হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। বললেন, কি আপনারা এক টাকা, তুই টাকা করে চাঁদা তোলেন। এ ভাবে কি আর ফাইটিং ফাণ্ড পুষ্ট হতে পারে। তুই হাজার টাকার সঙ্গে মস্ত একটা ফলস্ 'চার আনার মেম্বারের' লিষ্টও ছিল আঙ্গুলের ছাপ সহ। এ সংবাদটা অবশ্য গোপন সংবাদ। কাকার মেয়ের কাছ থেকে শোনা খুব সম্ভব কর্পোরেশনের ট্যাক্স নেওয়ায় লিষ্ট থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন নামের লিষ্টটা। প্রকাশদার যাতায়াত আছে বড় বড় হোমড়া-চোমড়াদের আড্ডায়। প্রায়ই তো দেখি বড়নেতাদের সঙ্গে এক মোটরে।

—উর্মিলাদেবীও খুব সভাসমিতি করছেন আজকাল। কংগ্রেসের ব্যাজ লাগিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করেন দেখি বস্তিতে বস্তিতে।

সুকল্যাণ কথা বলে না। চুপ করিয়া ভাবে, এই পাঁচমিশালী দেশভক্তদের ভিতর হইতে ভেজাল ছাঁকিয়া লওয়াটাও সোজা নয়।

সত্যিকারের দেশভক্তরা আজ আড়াল হইয়া যাইতেছে এই মেকী দেশভক্তদের ভিড়ের তলায়। কত আত্মত্যাগ, লাঞ্ছনা দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া গড়িয়া তোলা জাতীয় আন্দোলনকে চতুর্দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছে মুখোশধারী কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা।

জ্যোতির্ময় আবার একটু ঠাট্টা করে প্রসাদকে—পিসফুল ট্রান্স-

ফারেন্স অফ পাওয়ার-এর নমুনা দেখছো ত। তোমাদের তো রসিদ-আলি দিবস পর্যন্তও পিপলস্ ওয়ার-এর ফেজ গিয়াছে। এত বড় একটা অবিস্মরণীয় দিন গেল কোলকাতায়। কি করলে তোমরা? শান্তি প্রচার। কিসের জন্য শান্তি।

প্রসাদ উত্তর দেয় না। রাস্তায় নামিয়া আসে। শান্তিবাহিনী করিয়া জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেও। তবু এ সংশয় মাঝে মাঝে দৃঢ় হইয়া উঠিত তাহারও মনে—নভেম্বর দিবস আর রসিদ-আলি দিবসে ঠিক পথই লইয়াছিল কি তাহারা?

বিপাশার সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায়। প্রসাদ অভিযোগ জানায় ইরা সম্বন্ধে—গত শনিবারে ইরাদি গেলেন না কেন মিটিংয়ে? তাঁর তো সেখানে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কত দূর দূর থেকে মেয়েরা সব এসেছিল। অগত্যা কি আর করি। বানিয়েই বলতে হ্ল বাধ্য হয়ে—জ্বর হয়েছে—তাই আসতে পারে নি।

বিপাশা বলে—হয়তো জরুরী কাজ ছিল।

প্রসাদ একটু উষ্ণতা প্রকাশ করে—আর ওখানে যাওয়াটা জরুরী নয়? ফাঁকি দিয়ে খাঁটি কাজ কোনদিন হয় না।

প্রসাদ চলিয়া আসে বড় রাস্তায়। মাথার উপরে রৌদ্র-তপ্ত আকাশের মধ্যাহ্ন উত্তাপ। ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে গায়ের সার্টটা।

রাস্তার মোড়ের একটা বড় বাড়ী হইতে রেডিওর খবর ভাসিয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের দাম্ভিক ঘোষণা। রাস্তায় চলিতে চলিতে প্রসাদের কানে আসে স্পষ্ট উচ্চারিত দিনের সংবাদ। সংবাদ তো নয়, যেন রক্তপিপাসু এক সেনাবাহিনীর লালসা-উন্মত্ত পদধ্বনিই ভাসিয়া আসিতেছে এ শব্দগম্ভীর বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গে।

কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছে সুপ্রিয়, ইরার ব্যবহারটা যেন একটু বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে। প্রায়ই আসে ইরা তাহার খোঁজে এ কাজ সে কাজ লইয়া! সুপ্রিয় হিসাব করিয়া দেখে, তাহার মধ্যে অ-কাজেই বেশী।

অহেতুক বসিয়া থাকে কিছুক্ষণ, একটু গল্প জমাইতে চায়। সুপ্রিয়ও কথা বলিতে জানে, সেও কথা বলিয়া যায়—কাজের, অ-কাজের বহু কথাই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে একটু অস্বস্তি বোধ করে। অপ্রত্যাশিত গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে চাহে প্রতিমুহূর্তে ইরার কথার রহস্যে, ধরা দিতে চায় যেন মনের অশান্ত চপলতাগুলি। সুপ্রিয় লক্ষ্য করেও করে না।

আজ ইরা আসিয়াছে অনেকক্ষণ। আধা-অন্যমনস্ক ভাবে পত্রিকাটা উল্টাইতে উল্টাইতে বলে সে—একটা ভাল ছবি এসেছে, দেখবে নাকি ?

সুপ্রিয় রাজী হয়। একটু যেন উজ্জ্বল দেখায় ইরাকে, তাহাও লক্ষ্য করে সে। আবার একটা অস্বস্তিকর ছায়া ফেলিয়া যায় তাহার মনের পর্দায়। তবু সার্টটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া যায়।

সিনেমা দেখিয়া ফেরার পথে বৃষ্টি নামে। সুপ্রিয় বলে—বৃষ্টিটা থামুক। ততক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেজার চাইতে আমার ওখানেই অপেক্ষা করে যাও।

ইরার চোখদুটি অনাবশ্যক আনন্দে ছলকিয়া উঠে। ঘরে গিয়া বলে সুপ্রিয়—বোস চা আনাই।

ইজিচেয়ারটায় আরামে দেহ এলাইয়া দেয় ইরা। কথা বলে না আর।

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে—কি, অত চুপ হয়ে গেলে কেন ?

ইরা উত্তর দেয়। আশা-মধুর কণ্ঠস্বর।

—একটা কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা সুপ্রিয়, তুমি আমায় বোনের মতই দেখছো তো।

সুপ্রিয় বিস্মিত হয় না এ প্রশ্নে, তবু একটু স্তম্ভিত হইয়া যায়। চা রাখিয়া যায় হোস্টেলের ছোকরা চাকরটি। ইরা চা ঢালিতে থাকে।

সুপ্রিয় জানে, কি শুনিতে চাহিতেছে ইরা। তবু উত্তর দেয় নির্লিপ্ত সুরেই—বোনের মত না, তবে দিদির মত দেখি তোমাকে।

সুপ্রিয় তাকাইয়া দেখে, ইরার মুখখানা এক মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া উঠে। তবু জোর করিয়াই মুখে হাসি টানিয়া বলে—আমায় বুড়ি করে ফেলতে চাও নাকি এরই মধ্যে ?

চা ঢালিতেছে সে দুইটি পেয়ালায়—মধুর পরিবেশন শুষ্ক হইয়া উঠে এক অপমানের ব্যথায়।

সুপ্রিয় জবাব দেয় না ইরার কথার। একটু মায়াও হয়। এতটা রূঢ় না হইলেও পারিত। কিন্তু অসুবিধাজনক মনোভাবকে সহজ করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না সে। বড় গ্লানিকর লাগে।

ইরা চা খাইয়া চলিয়া যায়। ভিতরে তাহার কি বহ্নি জ্বলিতেছে জানে সুপ্রিয়। তবু এ ছাড়া উপায় ছিল না তাহার।

মনটা বিশ্রী হইয়া থাকে। অবাঞ্ছিত প্রেমকে গ্রহণ করাও যেমন সোজা নয়, উহা প্রত্যাখ্যান করাও তেমনি সহজ নয়। ভাবে একটু ইরার কথাই। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে উহারা, স্বজনের সীমানা হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছে। এ দুরূহ পথযাত্রায় একলা চলার ক্লান্তিতে অবসাদ আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই হয়তো সঙ্গী খোঁজে—হয়তো জীবন ভরিয়াই খুঁজিবে। হয়তো ভুলও করিবে অজস্র।

কষ্ট হয় সুপ্রিয়র ইরার জন্যে। কিন্তু নিরুপায় সে।

সিন্ধুবালার ছেলের আবার মাঝরাত্রি হইতে খুব জ্বর আসিয়াছে। ভোরবেলা ছেলেকে কাঁথায় জড়াইয়া কোলে লইয়া বসে আসিয়া সরু বারান্দাটুকুতে। রোদ উঠিয়াছে, এক ফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে শেওলাভরা উঠানের কোণায়।

মনটা অসাড় হইয়া আছে সিন্ধুবালার। যেন কত দীর্ঘকালের রোগী সে নিজেই। উঃ! কি ভীষণ দিন আর রাত কাটিয়াছে কয়দিন। এখনও থাকিয়া থাকিয়া বুক কাঁপিয়া উঠে। আচমকা, দূর হইতে যেন কানে আসে মাঝে মাঝে এখনও সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস চিৎকার

—আল্লা হো আকবর; লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—জয়হিন্দ্, জয় মা কালী। দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। উঃ সে কি আগুন। আকাশ-ছোঁওয়া রক্তবর্ণ আগুন সব। চোখের উপরেই পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেল পর পর কয়টা খোলার ঘর। ছোট ছোট ছেলেপুলে, আর মেয়েমানুষের চোখে কি ত্রাস, সে কি আতঙ্ক।

ঝিলিক দিয়া উঠে শরীরে এখনও ভাবিতে। তাহাদের এই ভুতুড়ে অন্ধকার বস্তির ছোট্ট উঠানটুকুতে আসিয়া ভিড় করে সবাই—কোলে কাঁখে ছেলেপুলে লইয়া।

সিন্ধুবালাও ছেলেকে বুকে চাপিয়া পরিত্রাহি ডাকিতে আরম্ভ করে—মা মনসা রক্ষা কর—রক্ষা কর মা মনসা—পা কাঁপে থর থর করিয়া। দেওয়ালের একটা ভাঙ্গা ফুটা দিয়া দেখিয়াছিল—উঃ সে কি দৃশ্য। রক্তগঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে রাস্তায়। ধারাল চকচকে ছোরা হাতে, লাঠি সড়কি হাতে ভীষণ মানুষের কি ত্রস্ত ছুটাছুটি।—এখনও ভুলিতে পারে নাই সে দৃশ্য—গা কাঁটা দেওয়া দৃশ্য।

সিন্ধুবালা ছেলের কপালে হাত দিয়া দেখে বারে বারে জ্বরের উত্তাপ। আর দেখে উঠানের রোদ! রূপসীর কথা মনে পড়ে। যমুনা, ঠানদিবুড়ি হয়তো জানেও না, এখানে কলিকাতায় তাহারা কিভাবে দিন কাটাইতেছে।

সূর্যের কথাই মনে পড়ে বারে বারে। ছেলেটাকে বড় ভালবাসিত সে। তবু কত কটু কথাই শুনাইয়াছে তাহাকে, আজ অনুতাপ কাঁটার মত বেঁধে মনে।

সিন্ধুবালার সুখস্বপ্ন ছিঁড়িয়া কুটি কুটি হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বপ্নরাজ্য মিলাইয়া গিয়াছে হাহাকারভরা ক্ষুধার্ত বাতাসে। চতুর্দিকে ভাসে শুধু সেই অট্টহাসি—রে রে রে রে, মার মার, ধর ধর। ধর্ষিতা মেয়েমানুষের বুকফাটা, আকাশফাটা আর্ত চীৎকার।

রূপসীর বাড়ী-গ্রাম ছাড়িয়া আসার শেষ সন্ধ্যাটি মনে পড়ে। গয়নার নৌকায় পদ্মা-পাড়ি দিয়া আসিয়াছিল। যদি আবার সেই গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিত।

কমলারাও উঠিয়া গিয়াছে এখান হইতে। পরেশের চাকরি গিয়াছিল গতবারে স্ট্রাইকের পরই। তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে।

প্রতাপ ওষুধ লইয়া আসে এক হাসপাতাল হইতে। বহু দূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে সে, ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে গায়ের গেঞ্জিটা। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসে সে দাওয়ায়।

সিন্ধুবালা দেখে প্রতাপকেও। কত বুড়া হইয়া গিয়াছে চেহারা এই কয় বছরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

আবার রেশনের লাইনে দাঁড়াইতে হইবে — প্রতাপ উঠিয়া যায় এক গ্লাস জল খাইয়া। কয়দিনের উত্তেজনা আর রাতজাগার ক্লান্তি সব শক্তি চুষিয়া লইয়া গিয়াছে। পায়ে জোর পায় না, তবু হাঁটে রেশনের জীর্ণ থলেটি হাতে লইয়া। দূর হইতেই দেখে, গলির মোড় পর্যন্ত লাইন হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই।

প্রতাপ নিস্তেজ পায়ে গিয়া বসে লাইনের পিছনে। উপায় নাই। পেটে ক্ষুধা যখন আছে, কাজ ছাড়া উপায় নাই। শোকে আর আতঙ্কে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে চলিবে না।

রাত হইতে না হইতেই আবার জ্বর আসে সিন্ধুবালার ছেলের; রাত বাড়ে, জ্বরও বাড়ে—গা পুড়িয়া যাইতেছে। চোখমুখ কেমন ঘোলাটে হইয়া উঠে! সিন্ধুবালা কাঁদিয়া উঠে—ওগো ছেলে বুঝি যায়। তুমি শীগগীর যাও ডাক্তার বাড়ী। আমার সোনা বুঝি আমাগো ছাইড়া চললো গো।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়খানা হাড়ের পাঁজরের মধ্যে বেহুঁশ জ্বরের কাঁপুনি আরম্ভ হইয়াছে। প্রতাপ বাহির হইয়া যায় ওষুধের শিশি হাতে।

বড় রাস্তায় পড়িতে না পড়িতেই একটা মিলিটারী পুলিশ ধরিয়া ফেলে তাহাকে।

কাকুতি, ক্রন্দন, অনুনয় সব বৃথা। একটা টাকাও বাহির করতে পারে না সে কাপড়ের খুঁট হইতে। আনি দুয়ানী, আর ফুটা পয়সা শুধু। মন উঠে না পুলিশের। সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারী, বিচারাধীন

আসামী প্রতাপ কম্পিত পদক্ষেপে হাঁটে থানার গারদের দিকে।

তাহার খোলার ঘরটুকুতে তখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে তাহার একমাত্র সন্তান—বাবা গো, ও বাবা গো।

আবার জড়াইয়া আসে জ্বরার্ত জিহ্বা। একবার ক্ষীণ ভাবে তাকায় একটু মায়ের মুখের দিকে শিশুটি। জড়ান স্বরে আবারও বলে —মা, বাবা কই। "বাবাগো। ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে ক্ষণেক্ষণে।

সিন্ধুবালা আর সহিতে পারে না এ করুণ বিলাপ। কান পাতিয়া থাকে বাহিরের দিকে, পরিচিত পদশব্দের অপেক্ষায়।

বুকটা ছিঁড়িয়া যাইতেছে। রাত্রি গভীর হইয়া উঠে। নিশীথিনীর দীর্ঘশ্বাস ঝরিতে আরম্ভ করে রাত্রির বুকে।

একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে সিন্ধুবালা ছেলের অচৈতন্য ক্ষুদ্র দেহটুকুর দিকে।

কিন্তু এ কালরাত্রি আর প্রভাত হয় না। সিন্ধুবালার একমাত্র ছেলে তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, রাত্রিপ্রভাত হওয়ার আগেই। দারিদ্র্য নিষ্পিষ্ট মা-বাবাকে এ কঠিন স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া যায় সে চিরদিনের জন্য।

সিন্ধুবালা ডুকরাইয়া কাঁদে। কি করিয়া বাঁচিবে সে, কি লইয়া বাঁচিবে ? প্রতাপকে কি করিয়া মুখ দেখাইবে আর সে ?

কিন্তু মুখ আর দেখাইতে হয় না প্রতাপকে। প্রতাপ আর ফেরে না, ফেরে মদন।

সারারাত্রি মরা ছেলে-কোলে বসিয়া থাকে সিন্ধুবালা। বছর ভরিয়া কাঁদিলেও বুঝি শেষ হইবে না মায়ের এ শোকের সমুদ্র। এই শূন্য বুকটাতে কাহাকে আর চাপিয়া ধরিবে সে।

মদন ভোরবেলা ছেলেকে রাখিয়া আসে নিমতলা ঘাটে। প্রতাপের খোঁজও করিয়া আসে। দুঃসংবাদ আনিয়া সে জানায় সিন্ধুবালাকে। কিন্তু সিন্ধুবালা যেন আর এ পৃথিবীরই মানুষ নয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সারাদিন শূন্য ঘরে। জলটুকুও স্পর্শ করাইতে পারে না প্রতিবেশী মেয়েরা।

সূর্যের দেওয়া ছেলের ছোট্ট জুতাজোড়া এখনও নূতনই আছে তাকের উপরে। ছোট ছোট জামা দুটি এখনও ঝুলানো রহিয়াছে দড়িতে। সিন্ধুবালার চোখ ছাপাইয়া উঠে জলে।

এই জুতা পরিয়া কি খুশিই না হইয়াছিল ছেলে। আজ ছেলেও নাই, সূর্যও নাই। বুক চিরিয়া চিরিয়া হু হু করিয়া কাঁন্না বাহির হইয়া আসে। কে পরিবে আর ঐ জুতা জামা। সবই শেষ।

দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাসও কাটিয়া যায়। সিন্ধুবালা কাজ কর্ম করে আবার, মদনই একটা কাজ জুটাইয়া দিয়াছে তাহাকে—ঠোঙা বানানোর কাজ।

পেটটা যখন আছে, তখন সবই সহ্য করিতে হইবে। পাথরের মত মন লইয়া চলে ফেরে, নড়ে-চড়ে, সবই করে সুন্দরবৌ, আর দিন গোনে, কবে প্রতাপ খালাস পাইবে।

মদন ভরসা দেয় তাকে।

মদন লোকটা খারাপ নয় অত, যতটা সে ভাবিয়াছিল, ভাবে সুন্দরবৌ। মদন যত্নের ত্রুটি করে না সুন্দরবৌয়ের, আর ত্রুটি রাখে না সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে গোপন পরামর্শের। এইতো সুযোগ। প্রতাপ আসিয়া পড়ার আগেই সরাইতে হইবে সুন্দরবৌকে। প্রতাপ ফিরিয়া আসিলে বলিবে, মুসলমান গুণ্ডায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার বৌকে।

সিদ্ধেশ্বরের বাটারফ্লাই গোঁফের তলায় পুরু ঠোঁটে হাসি ঝলকায়। ঝলকায় কামনার উলঙ্গ পিপাসা।

অন্ধকার রাত্রি। বহু ঊর্ধ্বে কয়েকটা তারা দেখা যায় আকাশে। সুন্দরবৌ বসিয়া ভাবে প্রতাপের কথা, কবে ফিরিবে, আর কত দেরি? লোহার গারদের ভিতরে প্রতাপ এখন কি করিতেছে, কে জানে? আর নয় এ মরার কলিকাতা শহরে। রূপসীতে ফিরিয়া যাইবে তাহারা।

রূপসীর উঠানে ঝিঁঝিঁ-ডাকা শীতল সন্ধ্যার ছায়া পড়ে চোখের মণিতে।

সুন্দরবৌর চমক ভাঙে। আবার, আবার সেই বীভৎস চীৎকার। —রক্তের বদলে রক্ত চাই, জয় হিন্দ, জয় মা কালী।

সমস্ত বস্তিটা কাঁপিয়া উঠে এক মুহূর্তে। পুরুষেরা ছুটিয়া বাহির হয় লাঠি বল্লম ইট-পাটকেল লইয়া।

বৌ-ঝিরা কাঁপে, ভয়ে আতঙ্কে মুখ শুকাইয়া যায়। শিশুগুলি কাঁপিতে থাকে মায়েদের দেখাদেখি।

সুন্দরবৌর বুকটার ভিতরে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। কাহাকে আর চাপিয়া ধরিবে সে আজ বুকে! নিজের হাত দিয়াই শক্ত করিয়া ধরে বুকটা। পা কাঁপে, শরীর কাঁপে, আবার, আবার সেই!

প্রতাপ নাই, কে বাঁচাইবে তাহাকে, কে রক্ষা করিবে? হে মা মনসা!

মদন ছুটিয়া আসে কোথা হইতে একটা লাঠি হাতে—ত্রস্ত ব্যস্ত ভীষণ চেহারা। দিশাহারা সিন্ধুবালা ভরসা পায় মদনকে দেখিয়া। বুঝি মা মনসা তাহার ডাক শুনিয়াছে।

মদন জড়িত কণ্ঠে ডাকিয়া বলে—সুন্দরবৌ শীগগীর চইল্যা আস, এক মিনিটও দেরি না—শীগগীর, শাগগীর।

সিন্ধুবালা এক কাপড়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় ঘর হইতে। মদনের পিছু পিছু হাটে কম্পিত পায়ে।

চারদিকে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার—আর বীভৎস চিৎকার—মার্ মার্ মার্।

মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে দূরে একটা গ্যাসের বাতি। আরও অনেক দূরে শোনা যায়—আল্লাহো আকবর।

ডরে-ভয়ে বিদ্যুৎ-কাঁপন শরীরটাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলে সিন্ধুবালা মদনের পিছু পিছু অবশ পদক্ষেপে।

দুপুরবেলা ঘরে বসিয়া কাঁথা শেলাই করিতেছে তারাসুন্দরী। পদ্মার মেয়ের জন্য একখানা কল্কা-আঁকা বড় কাঁথা লইয়াছিল সেই কবে—সময় অভাবে আজও শেষ করিতে পারে নাই। সংসারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে—তার উপর দেশব্যাপী আজ এক কুরুক্ষেত্রলীলা আরম্ভ হইয়াছে—কিছুই ভাল লাগে না। কি হইবে, কি হইবে ত্রাস সর্বত্র। এদিকে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের ভিটামাটি বিক্রি করার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রশেখর কিছুতেই গ্রাম ছাড়িবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। প্রাণ থাকিতে সে দেশ ত্যাগ করিতে পারে না।

তারাসুন্দরী তাক হইতে চশমাটা পাড়িয়া আনে। চশমা ছাড়া আজ আর একগাছিও সূতা পরাইতে পারে না ছুঁচে। অথচ এক-কালে রাত জাগিয়া কত ক্রুশের কাজ করিয়াছে তাহারা। পোর্টম্যান্ ভর্তি এখনও সযত্নে তোলা আছে কত ক্রুশের খঞ্চিপোশ, খাবার ঢাকনি, ভেলভেটের উপর জরির কাজ করা জুতা। কোথায় যাইবে, কি হইবে এত কালের সযত্নে-তোলা জিনিসপত্র সব। ভগবান জানেন। একটা ঘোর অনিশ্চয়তা সম্মুখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা-সুন্দরী। রৌদ্রে খাঁ খাঁ করে উঠানটা—তাকান যায় না। দূরে কোন বাড়ীতে ঘরের টিন খোলা হইতেছে। কেমন যেন উদাস উদাস করে প্রাণটা।

একটা কাল ছায়া পড়ে উঠানে—তারাসুন্দরী চমকিয়া তাকায় বাহিরে। একজন লুঙিপরা মুসলমান। বুকটা কাঁপিয়া উঠে।

—কি চাই?

—ফারনিচার আছে বেচনের মত?—প্রশ্ন করে সে নিঃসঙ্কোচে।

বিরক্তির সুরে উত্তর দেয় তারাসুন্দরী—না, আমরা কিছু বিক্রি করুম না।

—ঐ যে ঘরটা পইড়া আছে দক্ষিণের ভিটায় ঐটার টিনগুলি বেচেন যদি, গাহেক আছে।

তারাসুন্দরী গর্জিয়া উঠে এতক্ষণে—তোমার তো আস্পর্ধা কম না মিঞা। যা কথাবার্তা বাইর বাড়ীতে কর্তাগো কাছে কইবা। জান না, বাড়ীর ভিতরে ঢোকার নিয়ম নাই বাইরের মানষের।

—সব নিয়মই কি সব কালে থাকে, ঠাইরাইন? হিন্দুরা সকলে ঘরবাড়ী, চেয়ার, টেবুল, থাল ঘটি বাটি বেচতাছে, দেইখ্যাই আইলাম। আপনারাও যদি বেচেন।—প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-ঠাসা লোকটির চোখের কোণায়।

তারাসুন্দরী আর উত্তর দেয় না। বোঝে সে, আজ আর উহাদের কাছে পূর্বের সম্মান আশা করা বৃথা। আজ তাহাদেরই দিন আসিয়াছে।

লোকটি চলিয়া যায়। আহত আভিজাত্যাভিমানে চুপ হইয়া বসিয়া থাকে তারাসুন্দরী। বুকের ভিতরে জমাটবাঁধা নিঃশব্দ ব্যাথার চাপ। কি দিনই আসিল দেশ স্বাধীন হওয়ার আওয়াজে।

মুসলমান জোতদাররা নূতন করিয়া ঘর বানাইতেছে, ঘর সাজাইতেছে ভিটাছাড়া হিন্দুদের নিকট হইতে সস্তাদরে কেনা আসবাব-পত্র দিয়া।

সৌদামিনী আসিয়া গল্প করে—আলাবস্কর বাড়ীতে গেছিলাম পোলা ধরতে। তার চাচাত-ভাইয়ে ঘর তুলছে খাসা একখান, দেইখ্যা আইলাম। আমাগো কর্তাবাড়ীর ডাক বাংলা ঘরের মতন। তারপর কত বাহাইরা ছবি দিয়া ঘর সাজাইছে। চক্রবর্তী বাড়ীর থন নাকি কিন্‌ছে—মাছের আইশের গোলাপঝাড় একখান, মাছের দাঁতের ছবি একখান, ছবিতে কাপড় পড়ান্যা একখান। তারপর চেয়ার টেবুল কিনছে দেখলাম। এদ্দিন হিন্দুরা সব বাবু ছিল, এইবার মোল্লারা মুন্সীরা বাবু হইয়া রইব।—হাসে সৌদামিনী। পোকায় খাওয়া কাল দাঁতগুলি চিক চিক করে অর্থহীন হাসির আড়ালে।

—চক্কত্তীরা কৃষ্ণনগরে যাইব ঠিক হইছে। আপনাগো পূবের

ঘরের রাও নাকি শান্তিপুরে চইল্যা যাইব শুনলাম। কাশামুদ্দির পুতে কইল, চৌধুরীগো পুবের ঘরের আটচালাটা নাকি সেই কিনছে আটশো টাকায়।

তারাসুন্দরী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেয়—আটশো টাকা কই? পাঁচশো টাকায় বিক্রি কইরা গেল ভাসুর পো অমন প্রকাণ্ড ঘরটা।

তবে যে সেখের পো কইল আটশো টাকা। তাহলে বোধ করি, দালাল ব্যাটাই মারছে তিনশো টাকা।

মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে ভাসিয়া আসে টিনের চালা খুলিয়া ফেলার ক্রমাগত একটানা হাতুড়ির শব্দ আর মাঝে মাঝে দালালদের বিকট চীৎকার—ফারনিচার আছে নাকি। ফারনিচার বেচবেন?

'ফারনিচার' কথাটি মনে বাসা বাধিয়াছে নূতন বাবু-হওয়ার স্বপ্ন দেখা জোতদারদের। জীবন ভরিয়া পৃথক আসন, আলিসায় বসা, পৃথক হুঁকায় তামাক-খাওয়া সম্ভ্রান্ত কৃষকের ক্ষুব্ধ মর্যাদাবোধ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে আজ। হিন্দু বাবুদের মত তাহারাও গাড়ী বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া গুড়গুড়ি টানিবে। চাষীরা আসিয়া সেলাম দিয়া যাইবে তাহাদের। ভবিষ্যত পাকিস্তানের স্বপ্নের মদিরা নামিয়া আসে সুরমাপরা চোখে।

গভীর রাত্রিতে গ্রামের চৌকিদার হাঁক দিয়া যায়। হিম-ঝরা মাঠের উপর দিয়া স্তিমিত রাত্রির দীর্ঘশ্বাস বহে। নগেন্দ্রশেখর ঘুমায় নাই তখনও। ঘুম আসে না চোখে।

পূবের ঘরের টিন খোলা হইতেছে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে কামলারা, এই মাসের মধ্যেই কাজ সারা চাই। পূবের ঘরের বৌ-ঝিদের শান্তিনগরে মামার বাড়ীতে পাঠান হইয়াছে, ১৫ই আগষ্টের আশঙ্কায়। এখন গাছ-গাছালীগুলি বিক্রি করিতে পারিলেই চলিয়া যাইবে ছেলেরা সবাই। মাত্র পাঁচশো টাকায় বিক্রী করিয়া গেল অতবড় আটচালাটা! কৃষ্ণনগরের জমি কিনিতেই তো

লাগিবে নগদ অন্তত: হাজার টাকা। ছেলেপুলে লইয়া পথেই বসিবে নাকি রমেশ ?

ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। সমস্ত গ্রামই খালি হইয়া যাইতেছে চোখের উপরে। বাঁড়ুয্যেরা চলিয়া গিয়াছে, শূন্য ভিটাগুলির দিকে তাকান যায় না। লক্ষ্মীহীন উলঙ্গ ভিটাগুলি যেন চতুর্দিকে ঢলিয়া পড়িয়া আছে মূর্তিমান অভিশাপের মত। বাংলার বুকে এমন ঘোর দুর্দিন ফণা তুলিয়া দাঁড়াইবে, এতো তাহার কল্পনায়ও স্পর্শ করে নাই কোন দিন।

চোখের উপরেই দেখিতেছে নগেন্দ্রশেখর তাহারই দেশ, সমাজ, ভাষা নষ্ট হইতেছে। ঠিক পদ্মানদীর ভাঙনের মতই চোখের উপরে এই ভাঙন। অবিকল সেইরূপ।

নগেন্দ্রশেখর চক্ষু মুদিয়া ভাবে ভবিষ্যতের কথা—আরও ভীষণ দিন আসিতেছে সম্মুখে। ব্রিটিশের প্যাঁচে কোথায় চলিয়াছে ভারতবর্ষ, ভাবিতে ভাবিতে স্তব্ধ হইয়া যায় মন।

উঠানের উপর দিয়া কাহার যেন পদশব্দ শোনা যায়। কোনও স্নেহের জন বাড়ী আসিল নাকি এ গভীর রাত্রিতে ? কল্যাণ ? চমকিয়া উঠে নগেন্দ্রশেখর—কে, কে যায় ?

কুকুরগুলিও চেঁচায় কিছুক্ষণ।

কেহই কোথাও নাই। শুধু নিস্তব্ধ অন্ধকার উঠানের উপর দিয়া রাতজাগা পাখী একটা উড়িয়া যায় ডানা কাঁপাইয়া।...

সৌদামিনী সময়ে অসময়ে আসিয়া বসে মাস্টারবাবুর বাড়ীর দাওয়ায়। গ্রামের প্রায় সবাই চলিয়া গিয়াছে। সেই আকালের দিন হইতে গ্রাম জনশূন্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ থাক না থাক—ঘরবাড়ীগুলি তো ছিল এতকাল। এইবার পাকিস্তান হওয়ায় ঘরবাড়ীও বেচিয়া যাইতেছে সকলে। ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নেড়ানেংটা ভিটাগুলি পড়িয়া আছে। বুকটায় মোচড় দিয়া উঠে।

এতলোক দেশ ছাড়িল, কিন্তু সৌদামিনী এই ভিটার মায়া কাটাইতে পারে নাই আজও। ষাট বছর ধরিয়া গোবর দিয়া লেপা উঠান, ঘরের পিড়া! ঐ আমগাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে তাহার সন্তানদের বাপ—তাহার হারাধন, তাহার ছেলে-বৌ সবাই। উহাদের ফেলিয়া সে কোন দেশে যাইবে। কিন্তু মনটা ভাঙিয়া চুরিয়া তুমরাইয়া আছে। পাড়াপড়শীদের উঠানে উঠানে কত সাঁঝের তারাভরা আকাশের তলায় বসিয়া প্রাণের নিঃশব্দ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাদের সঙ্গে তিল তিল করিয়া—তাহাদের এই বিদায়ের ব্যাথায় বুড়া হাড়ও যে এমন করিয়া অবশ করিয়া দিয়া যাইবে—কোনদিন জানিত কি এই গ্রামের ধাত্রী—বুড়ী সৌদামিনী?

খাঁ খাঁ করে গ্রামটা—আকাশে বাতাসে যেন মরাকান্নার নীরব রোল।

দেশ ভাগ হইয়া গিয়াছে গত সন্ধ্যায়—রেডিওতে খবর ছড়াইয়া পড়ে সমস্ত ভারতবর্ষে। নগেন্দ্রশেখর চুপ করিয়া শুইয়া থাকে ইজি-চেয়ারে। একটা অবসাদের ক্লান্তি ঘিরিয়া আছে মনে।

অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল! যেন তাহারই বুকের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে দুই টুকরা করিয়া দিয়া গিয়াছে এ ঘোষণা। ভারতবর্ষ—শিবাজী, নানক, টিপু সুলতান, লালা লাজপতের ভারতবর্ষ আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানে ভাগ হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার উৎসব করিতে বলা হইয়াছে কংগ্রেস হইতে ঘরে ঘরে। কিন্তু উৎসবের সে সাড়া জাগে কই মনে।

এক শুভ সচেতন মুহূর্তে যে সঙ্গীত গাহিয়া উঠিয়াছিল উদাত্ত সুরে—যে রাগিণী যৌবনোন্মেষ হইতে ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইয়াছিল, যে স্থর বনমর্মর কাঁপাইয়া গৃহছাড়া করিয়া ডাকিয়া লইয়াছিল শতসহস্র তরুণ-তরুণীকে—বছর ঘুরিয়া যুগান্তে মিশিয়াছে—শতাব্দীর স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে তবু তো সে গীত থামে নাই।

কিন্তু আজ এ উৎসব প্রদোষে সেই জয়যাত্রার গান, সেই

মহাসঙ্গীত থামিয়া গেল কেন কোন অদৃশ্য ভীষণের ইঙ্গিতে। কি গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে বার্ধক্যে-ক্ষীণ দুর্বল বুকে রভিতরে।

তারাসুন্দরী অবসন্ন মনে পূজার ঘরে কাজ করে।

বিকালে একটা সভা ডাকা হইয়াছে স্কুলের মাঠে। গ্রামবাসী জড়ো হয়—মেয়ে-পুরুষ সবাই। নগেন্দ্রশেখর ধীরে ধীরে উঠিয়া যায় লাঠিতে ভর দিয়া সভার দিকে।

মুসলমানদের চোখে আশার রোমাঞ্চ—হিন্দুদের চোখে হতাশা আর অনিশ্চিতের কুয়াশা।

সবুজ পতাকা উড়িতেছে বাতাসে—কৃষক আর চাষীরা খুশির চোখে তাকাইয়া দেখে।

শশাঙ্কশেখর বক্তৃতা দেয়। প্রথমেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় শহীদদের স্মরণে। আবেগ-গম্ভীর স্বরে বলে সে—এ গ্রামের প্রথম শহীদ সূর্য—তার প্রতি আমরা অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সূর্য মরে নাই, আকাশের ঐ ধ্রুবতারার মতই সে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অনন্ত-কালের আকাশে।...

মস্তক নত করে বক্তা। সকলকে বলিয়া দেয়—ঘরে গিয়া একটি প্রদীপ যেন জ্বালায় সন্ধ্যায়—শহীদদের উদ্দেশে।

যমুনাও শোনে বক্তার কথা—স্তিমিত চোখ দুইটি জ্বল জ্বল করিয়া উঠে বক্তার কথায়।

সন্ধ্যার পর তারাসুন্দরী ছাদের আলিশার উপর প্রদীপ সাজাইয়া দেয়। নগেন্দ্রশেখর পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। গভীর আবেগে মনে মনে উচ্চারণ করে নগেন্দ্রশেখর—এ পুণ্যভূমির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশিয়া আছে তোমাদের জয়যাত্রার গান—জাগো জাগো। প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশিয়া আছে তোমাদের আত্মত্যাগ।

নিচে বাঁশঝাড়ের আড়ালে প্রতাপের জনহীন ভিটা। উঠানের মুক্ত আকাশের নিচে ধ্যানমগ্ন হইয়া সেই অজেয় অমর আত্মাদের অন্তরে উপলব্ধি করে নগেন্দ্রশেখর। মাথার উপরে অগণিত তারা। বুকে জ্বলিয়া উঠে ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ।

ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রণাম করে যমুনা। ঐ তারাদের মতই তাহার সূর্যও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে মানুষের মনে।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধ ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে যমুনা ও তাহার সৎ-বোনের মা-মরা ছেলেটি গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে প্রদীপটিকে। তীব্রস্মৃতি, আর এই শিশু, এইতো তাহার অবলম্বন জীবনে।

সৌদামিনী মারা গিয়াছে।

তাহার জনশূন্য, প্রাণহীন ঘরটার চালে আকাশের ম্লান জ্যোৎস্না নামিয়া আসিয়াছে। বহুদূরের বোবামাঠ ভেদ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে উৎসবরত মুন্সীদের জিগির ধ্বনি।

এ দাঙ্গায় সব চাইতে বড় ক্ষতিই হইয়াছে শ্রমিক আন্দোলনের। প্রসাদের শুকনো মুখখানা দেখিয়া এত কষ্ট হয়। অরুণাভ, বিশ্বরূপ, বিপাশা, সুপ্রিয় সকলেরই চোখে মুখে হতাশার ছায়া। তবু জোর করিয়াই আবার কাজ শুরু করে, আবার জোড়া তালি লাগায় ভাঙা ইউনিয়নগুলিতে।

পরী জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে চিৎকার করিয়া—পচুদা, ও পচুদা। শীগগীর বাড়ী এসো। আর, দেরি করো না।

পদ্মার বুকটায় নূতন করিয়া আবার মোচড় দিয়া উঠে। পরী ভুলিতে পারে নাই পচুকে। হয়তো কাহাকেও দেখিয়া মনে পড়িয়াছে তাহার কথা। পদ্মাও ভুলিতে পারে না পচুর এ নির্মম অভাব। তাহার চোখের সামনে সব সময়ই ভাসে পচুর চেহারাটা।

মাস দুইও হয় নাই—এরকমই এক দুপুরবেলায় পচু সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই। সে একদিন তাহার লাট্টু

খেলার সাথীদের নিকট হইতে বাড়ী ফেরার পথে দেখে, মস্ত এক লাইন দাঁড়াইয়াছে দোকানে হরলিক্সের জন্য।

পচুর খেয়াল হয়, তাহাদের পরীর জন্যও এক কৌটা হরলিক্স লইয়া গেলে বেশ হয়। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া পড়ে সেও লাইনের পেছনে। প্রায় দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকার পর পচুর পালা আসে।

কিন্তু দোকানদার বাবুটি পচুর ঠিক আগের ভদ্রলোকের হাতে শেষ শিশিটি দিয়া আপসোস করে পচুর দিকে তাকাইয়া—খোকা, এইমাত্র ফুরিয়ে গেল। তুমি কাল এস, কাল ঠিক পাবে।

পচুর মনটা দমিয়া যায়। কিন্তু মনে মনে জিদ চাপিয়া যায় যেমন করিয়াই হউক পরীর জন্য এক শিশি হরলিক্স জোগাড় করিবেই।

এদিকে বেলাও প্রায় শেষ। বৌদির কাছে বকুনিই খাইতে হইবে হয়তো, ধীরে ধীরে হাঁটে পচু। ছোট্ট পার্কের ধারে প্যারা-মবুলেটারে শোওয়ানো রোজ দেখা মেয়েটিকে দেখে মন দিয়া। শিশুটির কাণ্ড দেখিয়া আপন মনেই হাসে পচু।

আমাদের পরীও তো এরকমই সুন্দর। মনে মনেই বলে সে।

অরুণাভ শুনিয়া তিরস্কার করে—সর্বনাশ, তুই ঐ রাস্তায় গিয়ে-ছিল হরলিক্স আনতে, গুণ্ডাদের ঘাঁটিতে?

কিন্তু পরের দিনই দুপুরবেলা আবার চুপিচুপি যায়।

পদ্মা ঘুম হইতে জাগিয়া দেখে, পচু বাড়ী নাই। ভাবে পদ্মা চিন্তিত মনে। কিন্তু উদ্বেগ ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া উঠিতে থাকে, বারে বারে রাস্তার দিকে তাকায়। বহু দূরে পচুর মত দেখা যায় যেন—নীল সার্টটিই গায়ে। এই দিকেই আসিতেছে। সমস্তটা দিন উদ্বেগে কাটে। দিন শেষ হইয়া সন্ধ্যা হয়। কোথায় পচু? ঘরে বসিয়া ছটফট করে পদ্মা। সারা দিন সারা সন্ধ্যা গলির দিকে তাকাইয়া থাকে। কত অসংখ্য লোক আসে, যায়, গলির মোড় ঘুরিয়া বড় রাস্তায় চলিয়া যায়। পচু আর ফেরে না।

থানায় খবর, রেডিওতে খবর, সবই বৃথা।

দড়িতে ঝুলানো পচুর আধময়লা সার্ট-প্যাণ্টগুলি আজও পড়িয়া আছে। যেন পচুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

পরী তখনও ডাকিয়া চলিয়াছে—পচুদা, ও পচুদা।

অরুণাভ একটা টেলিগ্রাম হাতে ঘরে ঢোকে। দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রথমেই ঠাকুমার কথা মনে পড়ে! এ শোক কেমন করিয়া সামলাইবে সেই বৃদ্ধা।

শ্রাদ্ধের কাজ করিতে দেশে যাইবে সে কয়েকদিনের জন্য। সরকার মহাশয়ের পত্র আসিয়াছে। সঙ্গে তাহারই পিতার স্বাক্ষরিত একখানা পত্র। পিতার মৃত্যুর পর এ পত্র তাহার নিকট পাঠাইবার নির্দেশ ছিল।

অরুণাভ চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়! সুপ্রিয় তাহারই পিতার অবৈধ সন্তান! আর এই সুপ্রিয়ই তাহার মাতার মৃত্যুর কারণ।

অরুণাভের চোখ-মুখের এই ম্লান ছায়া লক্ষ্য করিয়া পদ্মা বিস্মিত হয়। কাছে আসিয়া বলে—কি হয়েছে, কোন খারাপ খবর?

অরুণাভ পদ্মার হাতখানা ধরিয়া বলে—তোমার কাছেও বলা যাবে না এ চিঠির সংবাদ পদ্মা। কারও কাছেই নয়।

পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসিয়া বসিয়া ভাবে অরুণাভ নিজের কথা। কাজের মধ্যে ডুবিয়া যখন থাকে, নিজেকে খুঁজিয়া পায় না। কাজের উন্মাদনায় ঘোরে সাংবাদিক মহলে ট্রামে বাসে রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু কাজ যখন শেষ হইয়া যায়, এক বিষণ্ণ অবসন্নতায় তাকে ঘিরিয়া ফেলে। বড় একা মনে হয় নিজেকে। তাহাকে বুঝিবার মতো কেহ নাই। পদ্মাও চিনিল না তাহাকে। তাহার এ কঠিন কর্মময় জীবনের পাশে আসিতে পারিল না পদ্মা কোনদিন! তাই

দূরে দূরেই রহিল সে চিরদিন। তাহার পুরানো দিনের বন্ধুরাও আজ বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে পর্বত-প্রমাণ মতের অমিল লইয়া।

এদিকে সংবাদপত্রের মালিকদের সঙ্গে মতান্তর তো লাগিয়াই আছে। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাকে আর লিখিতে দেওয়া হইতেছে না। বোঝে সে আর বেশিদিন টিকিতে পারিবে না।

উঠিয়া পার্কের ভিতর দিয়া হাঁটে। একজন পুরানো আমলের আই-বি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়।

—কি খবর ?

—খবর তো আপনাদেরই এখন।—হাসিয়া বলে অরুণাভ—শুনছি আপনাদের ব্যারাকে নাকি রাবণের চিতা জ্বলছে।

আই-বি-র ভদ্রলোকটি হাসিয়া উত্তর দেয়—তাতে আপনাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনাদের ফাইল ঠিকই আছে।

রাস্তায় আসিয়া পড়ে অরুণাভ। ভদ্রলোকটি বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। দূর হইতে হঠাৎ চোখে পড়ে অরুণাভের, ঠিক পচুর মতই একটি ছেলে বসিয়া আছে একটা অপরিচিত বাড়ীর রোয়াকে। ঠিক পচুই।

চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে অরুণাভের, দ্রুত আগাইয়া যায় সে। কিন্তু এমন ভাবে কি ফাঁকি দিতে পারে পচু তাহাদের।

একটা প্রসেশন চলিয়াছে বাটা শ্রমিকদের। অরুণাভ পাশ কাটাইয়া যায়। রাস্তাটা পার হইয়াই একমুহূর্তে দমিয়া যায় সে। পচু তো না। একেবারেই আলাদা চেহারা।

কিন্তু এমন ভুল দেখিল সে! মনটা বড় খারাপ হইয়া যায়। বাড়ী ফিরিয়া আসে অবসন্ন পায়ে।

অরুণাভের নামে সম্পত্তি নামজারী হইবে। সম্পত্তি বলিতে কিছুই বড় রাখিয়া যায় নাই তাহার পিতা। তবু যেটুকু আছে। তাহারই অর্ধেকাংশ সুপ্রিয়র নামে লিখিয়া আসে সে।

সরকারমশাই অবাক হয়। সুপ্রিয় ভীষণভাবে আপত্তি জানায় —আমাদের পরীরানীকে ঠকানো চলবে না।

অরুণাভ বলে—তুই যদি আমার সহোদর ভাই হতিস তবে কি আপত্তি করতিস।

এর ওপরে আর কোন কথা বলিতে পারে না সুপ্রিয়। কিন্তু বড় বিব্রত বোধ করে সুপ্রিয়। সবাই জানে, আত্মীয়-পরিজনহীন, মাতৃহীন বালক সে। অরুণাভের পিতার আশ্রয়েই বড় হইয়াছে। দয়ায় প্রতিপালিত পরিচয়ই গ্লানিকর অভিসম্পাৎ তাহার জীবনেব। তাই খুব কম সময়ই ভাবে সে তাহার জীবনের কথা। ভাবিতে গেলেই বড় বিপন্ন মনে হয় নিজেকে। তার উপর অরুণাভের এ দান তাহাদের মধুর সম্পর্ককেই বিকৃত করিয়া তুলিবে রহস্যের কুল-না-পাওয়া আত্মীয়দের কানাকানিতে।

পদ্মা শ্বশুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে দেশের বাড়ীতে আসিয়াছে আর যায় নাই। এখানেই থাকিবে সে। এখন, বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ীব শোকদগ্ধ মনের ক্ষতে অন্তরের মধুর প্রলেপ দরকার। এই বয়সে পুত্রশোক যে কি ভীষণ অসহনীয়, বোঝে পদ্মা! বয়সের ভারে নুইয়া আসা দেহ এ আকস্মিক শোকে আরও ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের ভিতরে হাঁটিবার শক্তিটুকুও আছে বলিয়া মনে হয় না।

পাঁচআনির সবাই রাঁচী চলিয়া যায়। তাহাদের মতে, নোয়াখালিতে যাহা হইয়া গেল তাহার পর আর কোনও ভরসায়ই ছেলেপুলে লইয়া পাকিস্তানে থাকা চলে না।

সুরবালার বাড়ী ছাড়িতে মন চায় নাই। স্বামীর স্মৃতিমাখা ধূলিকণা। যেদিকে তাকায় স্বামীর হাতের চিহ্ন। তাহারই নিজের হাতে করা ফলের বাগান, গাছ-গাছড়া, বাড়ীঘর, সবই। জীবনের বাকি দিনগুলি স্বামীর স্পর্শমাখা ঘরখানিতেই কাটাইয়া যাইবে, এইটুকুই ছিল শেষ আশা। তাহাও অদৃষ্টে রহিল না।

প্রজারা আসিয়া বলে—শুনতাছি, আপনারা নাকি সব বাড়ী

ছাইড়া যাইবেন। কিসের লেইগা আপনাগো বাপঠাকুরদার দেশ ছাইড়া যাবেন। আমরা আছি তবে ক্যান।

বুড়া করিম শেখ দুধ দোয়াইতে আসে। সাদা দাড়ির ভিতর হইতে ঠোঁট কাঁপিয়া উঠে—কর্তা-মা, এইসব কি শুনি। আপনারা নাকি চইল্যা যাইবেন?

সুরবালা বলে—যামু না, আর করুম কি। তোমাগো রাজ্য হইব, তোমরা কি আমাগো থাকতে দিবা। নোয়াখালির কাণ্ড শোন নাই বুড়া। তখন তো আইবা এই কর্তাগো গলায়ই আগে ছুরি বসাইতে।

—বুড়াকর্তার আমল থেইকা আমি এই আপনাগো বাড়ীতে দুধ দোওয়াইতেছি। কোনদিন দেখছেন, এতটুকু বেয়াদপি।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠে এ মিথ্যা অপবাদে।

তিন আনিতে আসিয়া আবার দুঃখ করে সে। দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে, তবু এতখানি বয়সের মধ্যে এ অপবাদ কেহ দিতে পারে নাই তাহাকে। মনটা ভারি হইয়া থাকে সারাদিন।

পূব পাড়ার মুসলমান মেয়েরা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে খামার বাড়ীতে। ব্যথিত চিত্তে দেখে তাহারা, সত্যি যাওয়ার জন্য গোছান শুরু করিয়াছে কর্ত্রীরা।

—কোনঠে যাইবেন। আর আইবেন না?—আসমানী দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে।

আর ফিরিয়া আসিবে না শিশু বয়স হইতে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় দেখা এই খামার বাড়ীর বৌ, ঝি, কর্ত্রীরা—ভাবিতেও ছায়া ঘনাইয়া আসে চোখের পাতায়।

সুরবালার ছোট ছেলের বৌ কমলা ঠাট্টার সুরে বলে—ফিরুম না ক্যান, নায়র যাইতেছি বাপের বাড়ীতে!

করিমের বৌ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়ায় গালে হাত দিয়া তিন আনির উঠানে।—কর্তা-মা কই, বৌ কই?

বুড়া কর্ত্রী ঘর হইতে বাহির হয়।—কি গো, কি কও?

—কই আপনাগোও নায়র যাওন হইবেন? পাঁচ আনিরা যাইছেন। চারি আনিও নায়র যাইছেন। আপনাগো বৌও যাইব?

বুড়া কর্ত্রী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—আর না গিয়া করবো কি! তোমরা কি আর আমাগো থাকতে দিবা?

—ক্যান কি দোষ করছি, মা আমরা। আপনারা চইলা গেলে কি ভাল ঠেকে। কেমন খালি খালি লাগে। আমরা ঘুইরা ফিইরা আহি বৌ-ঝি গো লগে কথা কই। সব চইলা গেলে ভাল লাগে না।

বুড়াকর্ত্রী কি আর বোঝে না তাহা। এ কি আর ভাল লাগিতে পারে? জাত আলাদা, ধর্ম আলাদা, আচার-পদ্ধতি আলাদা, তবু তাহাদের সঙ্গেই অন্তরের যে গাঁটছড়া পড়িয়াছে তাহা ছেঁড়া কি সহজ? উহারাই তো তাহার শ্বশুর, দাদাশ্বশুরের আমল হইতে প্রতিবেশী। অন্তরে অন্তরে যে বন্ধন জন্মিয়াছে বাপঠাকুরদার আমল হইতে সে বন্ধন আজ এই দেশের ভাগবাটোয়ারার দপ্তরে বসিয়া এক টানে ছিঁড়িয়া ফেলা সোজা নয়। এ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে টান পড়িয়াছে হৃৎপিণ্ডেরই শিরায় শিরায়।

করিমের বৌ তাহার প্রথম বধূজীবনে মস্ত ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ীর পিছনে পিছনে বৌ দেখিতে আসিত খামার বাড়ীতে, রূপার মল পায়ে দিয়া। তাহার বাউঠি পরা হাতে ঘোমটা ফাঁক করিয়া আয়ত চোখে দেখিয়া যাইত আঁতুড় ঘরের দুয়ারে বসা ধাইয়ের কোলে খামার বাড়ীর নবজাত শিশুদের। তারপর ধীরে ধীরে সেই নথনাড়া মসৃণ কপোল দুইটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে লোলচর্মের আড়ালে। বার্ধক্যের ছাপ আজ সর্বাঙ্গে। তবু এই প্রতিবেশী উঠানগুলির আকর্ষণ আজও টানিয়া আনে তাহাকে সময়ে অসময়ে।

রূপার আধুলি গলায় নীলশাড়িপরা ছোট ছোট মেয়েরা অবাক চোখে ঘিরিয়া দাঁড়ায় দালানের সিঁড়িতে। তাহাদের সুরমাপরা নির্বাক চোখে ধরা দেয় সেই একই কথা—ওনরা চইলা যাইবেন সব বাড়ী ছাইড়া?

গ্রামের মানুষের রূপকথার এ দীর্ঘ কাহিনী কলিকাতার মানুষেরা

জানে কি ? শিশু সন্তানকে মায়ের কোল হইতে টানিয়া উপমাতার কোলে সঁপিয়া দেওয়ার মতই নিদারুণ দুঃসহ এই ভিটা-ছাড়ার ব্যথা। এ ব্যথা কি শুধু মা-হারা সন্তানের বুকেই আছড়াইয়া কাঁদে বিনাইয়া বিনাইয়া ? মায়ের বুকেও জমিয়া থাকে কত অথৈ ব্যথার সমুদ্র। কথায় বুঝাইতে পারে না এ কি গভীর বেদনা। পাকিস্তান পাইয়াছে তাহারা। তাহাদের এত কালের স্বপ্নকথা—পাকিস্তানের অর্থ যে এই, ইহা তো জানিত না তাহারাও।

সুখে-দুঃখে, শোকে-তাপে, আমোদে-আহ্লাদের মাঝে তিল তিল করিয়া, যুগ যুগ ধরিয়া মনের আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল যাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মাঝে আজ এ কি বিরাট ব্যবধান হঠাৎ মাথা নাড়া দিয়া উঠিল ?

বাগ্দী, নমো, মুসলমান মেয়েরা একসঙ্গে পাট টানে—খালপাড় হইতে খাতাঘরে টানিয়া লইয়া যায় পাটের বোঝা।

পথ চলিতে চলিতে পরাণ বাগ্দীর মেয়ে দুঃখ করিয়া বলে হালিমার ফুপুকে—দেশ ছাইড়ে চইল্যে যাইতে হইব। তোরাতো আমাগো থাকতে দিবি না।

হালিমার চাচার কানে যায় সে কথা। উহাদের পেছনেই চলিতেছে সেও পাটের বোঝা লইয়া। উত্তর সেই দেয়—ক্যান দেশ ছাইড়া যাবি তোরা, যেখানে মনে যা খুশি হোক গিয়া। আমরা যেমন ছিলাম বরাবর তেমনই থাকুম।

তবু ভয় আর সন্দেহ উঁকি মারে হিন্দু গৃহস্থদের ঘরে ঘরে। পত্রিকার পাতায় পাতায় ছাপানো লোমহর্ষণ কাহিনীর কথা ভুলিতে পারে না। গোমাংস খাওয়াইয়া কলমা পড়াইয়া সব নাকি মুসলমান করিয়া ফেলিতেছে। বয়স্থা মেয়েদের ধরিয়া লইয়া নাকি নিকায় বসিয়াছে। চক্ষু স্থির হইয়া যায় সকলের। বৃদ্ধ মুসলমানরাও বলাবলি করে ঘরে বসিয়া। এই সব কাফেরের অপকর্মকে তাহারাও সমর্থন করিতে পারে না।

কিন্তু জোতদার, মণ্ডলেরা খুশিই হয়। কলিকাতায় তাহারা

8.0

পরাস্ত হইয়াছিল। উহার শোধ কিছু হইয়াছিল নোয়াখালিতে। মনে মনে ভাবে, হিন্দুরা চলিয়া গেলেই তো হয়। এতকাল হিন্দুরা রাজত্ব করছে, দোকান-পাট ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল হিন্দুদের হাতে। এইবার তাহাদের দিন আসিতেছে। বাবু হইয়া উঠিবার রঙিন স্বপ্ন কৃষক-প্রধানদের চোখে। আর দেরি সয় না। হিন্দুরা গেলেই তো হয়।

সুরবালারা চলিয়া যায়। কিন্তু অরুণাভের ঠাকুরমা ভিটার মায়া ছাড়িতে পারিল না এতকাণ্ডের পরও। আর পারিল না বৃদ্ধ সরকারমশাই। সমস্তটা জীবনের স্মৃতিজড়ান এ কাছারি ঘরের মায়া ত্যাগ করা সোজা নয় তাহার কাছে।

শোকে জর্জরিত দিদিশাশুড়ীকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য, তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে পদ্মা জনশূন্য বাড়ীঘর, গরুর বাথান, লেবু বাগান, আনারস ক্ষেত। সবই ফাঁকা, সবই যেন ছাড়াছাড়া লাগে আজ। অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি ঝরিয়া পড়ে জনহীন গোলাবাড়ীর উঠানে। থমথম করে ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলানো শূন্য নাটমন্দির, মণ্ডপঘর, আধা ভাঙা জীর্ণ পালকিগুলি।

কাছারি ঘরে বৃদ্ধ সরকারমশাই এখনও হিসাবের খাতাপত্র উল্টায়। কদাচিৎ দুই-একজন বৃদ্ধ প্রজা আসিয়া ঘুরিয়া যায়; দুই-এক ছিলিম তামাক টানে। বৃদ্ধ সরকার তাহার অভ্যাসমত বাকি খাজনার কথাটা স্মরণ করাইয়া দেয়। কথাটা নিজের কানেই এখন বেসুরা শুনায়।

দিদিশাশুড়ীর কথা আর শেষ হয় না পদ্মার কাছে। হয়তো জীবনের শেষ কথা বলিয়া লইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে চোখ ভিজিয়া ওঠে। আঙুল দিয়া দেখায়—ঐ যে দূরে আমগাছটা দেখা যায়, যার আড়ালে সারি সারি টিনের গুদাম, ঐ পর্যন্ত ছিল এ বাড়ীর আম বাগানের সীমানা।

পদ্মার দাদাশ্বশুরের লাগানো বড় বড় গাছ—আম, জাম, লিচুর বাগান। অলক্ষ্যে নিঃশ্বাস পড়ে বৃদ্ধার। দূরে দেখা যায়—পীতাভ, ধানক্ষেত। সুপারি গাছের দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে দীঘির জলে।

রাত্রিতে মেয়েকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে পদ্মা শোনে দিদিশাশুড়ীর মুখে তাহার বধূ জীবনের কাহিনী। স্মৃতির পর্দায় পর্দায় জড়ান এ রূপকথা শেষ হইতে চায় না।

পদ্মার চোখে বেদনাময় আবেশ নামিয়া আসে। বৃদ্ধার দন্ত-বিহীন অসম্পূর্ণ উচ্চারণেও ধরা দেয় কত বিলম্বিত রাগরাগিনী—জীবনের রোমাঞ্চময় গাথা।

পালকির ভিতর হইতে পুণ্যাহের মেলা দেখিতে যাইত এই বোসেদের বাড়ীর বৌয়েরা। কত চড়ক ঘুরিত মেলায়, কত ভাসান গাহিত দলে দলে।

ধূপছায়া ময়ূরকণ্ঠী আর আসমানী রংয়ের বেনারসী-পরা দিদি-শাশুড়ীর বধূ-মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করে পদ্মা। নিঝুম রাতে হারিকেনের পাশে বসিয়া তাকাইয়া দেখে পদ্মা বৃদ্ধার করুণ মুখচ্ছবি। সুদীর্ঘ বেদনার কাহিনী আঁকা সে-মুখে হারিকেনের, নিষ্প্রভ আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

দিদিশাশুড়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—আমার শাশুড়ীর আমলের বাজু, তাবিজ, গোপহার, নিমফল—কত কিছু ছিল সিন্দুক ভর্তি, কত আতর দান, গোলাপপাশ রূপার গড়গড়া। আর আউজকা আমার সোনার চাঁদের গলায় একখান ধুকধুকীও পড়লো না—

সুপ্রিয় কলেজের কাজ ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া আসিয়াছে আজ প্রায় ছয় মাস।

গ্রামের মোড়ল আসিয়া জানায় সুপ্রিয়কে তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে দারোগাবাবু। সুপ্রিয় গা ঢাকা দিয়া আছে। একটা জরুরি কাজে শহরে যায় সে। শহরের প্রান্তে খোলা ময়দানের

উপর মধ্যাহ্নের নমাজ পড়িতেছে তুই-একটি বৃদ্ধ মুসলমান। আরও দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের মাঠে সভা ডাকিয়াছে লীগ হইতে।

সুপ্রিয় দূর হইতে শুনিতে চেষ্টা করে। সভার কাজ শেষ হইয়া যায়। শ্রোতারা খুশি হইতে পারে না বক্তার কথায়।—পাকিস্তান তো দেখি শুধু বড়লোকের জন্যই।

ঈদের সময় নূতন কাপড় জুটাইতে পারে নাই ছেলেমেয়েদের জন্য। ক্ষোভ জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদের মনের আড়ালে।

শহর হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সুপ্রিয় নিঃশব্দে ঘুরিয়া যায় একটা পেঁয়াজ ক্ষেতের পাশ দিয়া। বাঁশের বেড়ায় ঘেরা অন্দর হইতে মোরগ আর মুরগি মুসলমান পল্লীরই পরিচয় ঘোষণা করে থাকিয়া থাকিয়া। ভিতবে কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছে—ঘরের বেড়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটিয়া বাহির হয় লাল কেরোসিনের নিষ্প্রভ আলো। সুপ্রিয় ঘরের পিছন দিয়া চলিয়া যায়।

ভিতরে নারীকণ্ঠের গ্রাম্য উচ্চারণে ঝরিয়া পড়ে জ্বালাময়ী অসন্তোষ—পাকিস্তান হওনে তো দেখি মান ইজ্জৎই রাখন দায়। পরনের কাপড়ের দশা দেখছো ?

ক্ষোভ দেখা দিয়াছে চতুর্দিকে।

সুপ্রিয় হাঁটিয়া চলে আরও উত্তরে। গ্রামের শেষ মাথায় কামার বাড়িতে বৈঠক বসিবে তাহাদের আজ গভীর রাতে।

দূরে মরা-নদীর ওপারে ইউনুস অপেক্ষা করিয়া আছে তাহার জন্য। ইউনুসের বৌও অপেক্ষা করিয়া আছে ভাত লইয়া। নীলডুরে-পরা চাষীর বৌ। সুপ্রিয় হাঁটে সন্তর্পণে সাঁকোর উপর দিয়া।

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে ইউনুস।—এত দেরি হইল আমি তো ভাবলাম ধরা পইরা গেলেন বুঝি।

ইউনুসের বৌ তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া আনে। লাল মোটা ভাত আর পেঁয়াজ-কলির তরকারি। ইউনুস আর সুপ্রিয় খাইতে বসে, ইউনুসের বৌ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া থাকে সামনে। কথা বলে না। তবু কত অফুরন্ত মমতা ঝরিয়া পড়ে অকুটিল কাল

চোখের মণিতে। সুপ্রিয় মুখ নিচু করিয়া ভাত খায়। কিন্তু মনে মনে অনুভব করে চাষীর বৌয়ের এ উদ্বেগময় অন্তরের কল্যাণ কামনাটুকু।

আবার পথচলা শুরু হয়। খালের ধারে মাছ পাহারা দিতেছে চাষীর ছেলেরা। মৎস-ভক্ষক উদ তাড়াইবার জন্য এ নৈশ প্রচেষ্টা। চতুষ্কোণ লণ্ঠনের রক্তিমাভ আলোতে স্পষ্ট হইয়া উঠে চাষীর ছেলের অসন্তোষচাপা বিরক্তি। উত্তেজিত সুরে কথা বলে দুইজনে। নিত্যকার জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী কাব্য হইয়া উঠে হিমঝরা বোবা মাঠের বুকে।

—শত্রু আমাগো হিন্দুরা না, শত্রু বড়লোকরা। না হইলে এখন তো হিন্দুগো খেদানো হইছে, তাও ক্যান এই দশা আমাগো। বড়-লোকগো বেলায় তো সবই জোটে দেখি। নূতন হইছে পাকিস্তান বইলা কিছু আটকায় না। শহরে দেইখ্যা আইলাম মটরে চইরা ফুর ফুর কইরা ঘুইরা বেড়াইতেছে বিবিরা। আর আমাগো বিবি গো বুঝি সরম, লজ্জা নাই!

উত্তর দেয় কর্কশ পুরুষকণ্ঠে—আরে মিঞা, আমাগো কি আর' মাইনষের মত দেখে বড়লোকেরা। এই কথাটাই তো আগে বুঝি নাই যে—শত্রু আমাগো হিন্দুরা না—শত্রু বড়লোকেরা।

সুপ্রিয় হাঁটিয়া যায় মৃদু পায়ে আখের ক্ষেতের পাশ দিয়া। সম্মুখে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত। এই ধানকাটা মাঠের বুকেই তো রক্ত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল একদিন। বীজ বোনা বৃদ্ধ চাষীদের বুকের উষ্ণ রক্তে ভেজা মাটিতে ফসল ফলিয়া উঠিয়াছে আবার।

কিন্তু এ পাকা ফসল ঘরে তুলিয়া যাইতে পারে নাই বৃদ্ধ মণ্ডল। তাহার আত্মার ক্রন্দন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যেন এ ধানের শীষের নিশীথ কম্পনে। পিছনে ফিরিয়া তাকায় সুপ্রিয়। দূর হইতে দেখা যায় উদ তাড়াইবার অভিযানে রত চাষীর ছেলেদের চতুষ্কোণ লণ্ঠনটি—গাঢ় অন্ধকারের ভিতর শুধু জ্বল জ্বল করিতেছে একটি লাল আলোক বিন্দু।

এত বড় নিস্তব্ধ শূন্যপুরীর ভিতরে তিনটি প্রাণী--পদ্মা, তাহার শিশুকন্যা আর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী। আর আছে কাছারি ঘরে বৃদ্ধ সরকারমশাই। পাঁচ আনি, চার আনির মস্ত মস্ত টিনের ঘরগুলি মরার মত পড়িয়া আছে। জনহীন উঠানগুলির বুকে উদাস করা শূন্যতা। বাড়ীর সামনের সড়ক দিয়া অনবরত গরুর গাড়ী চলিয়াছে, বিছানা, তোরঙ্গ, জিনিসপত্র বোঝাই, বাস্তুত্যাগী গৃহস্থদের লইয়া।

নমপাড়ার ছিদামের মা আসিয়া দুঃখ করে—রাইচরণ চইল্যা গেল, ক্ষেতভর্তি তরিতরকারী—কার ভোগে যাব। অদৃষ্টে ছিল না ভোগ। কেমন সুন্দর লতাইয়া উঠছে চালের উপর কুমড়া গাছটা। দেখনে মায়া লাগে।

—শ্বশুর-শাশুড়ীর ভিটা। একি যে সে মায়া!—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে পদ্মার দিদিশাশুড়ী।

পদ্মা শোনে, গ্রাম ভরিয়াই আর্তনাদ উঠিয়াছে। নিঃশব্দ বন, প্রান্তরও এ নীরব ক্রন্দনে মাখা। পদ্মা ঘাটলায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পুকুরের ওপারে সুদূর বিস্তৃত ধানক্ষেত। শেষ আর দেখা যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবে পুরানো দিনের কথা। এ বিষণ্ণ আবেষ্টনী বহুদিনের স্মৃতিগুলিকে জাগাইয়া দিয়া যায় মনে। সেই ছয় বছর আগের অরুণাভ! প্রিয় সান্নিধ্যের মধুর কামনা!

বিশ্বরূপকেও ভুলিতে পারে নাই পদ্মা। গভীব বেদনানুভূতি প্রতি অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় শিরায়। অরুণাভ ও বিশ্বরূপ একই সঙ্গে জুড়িয়া আছে তাহার প্রেমাচ্ছন্ন মনের ইন্দ্রজালে। দুইটি ব্যক্তিত্বের মাধুরী-ধারা বহিয়া চলিয়াছে অন্তঃশীলা ফল্গুর মত।

বিশ্বরূপও কি ভাবে তাহার কথা। এমন নীরব প্রেমের ফল্গু বহিতেছে কি তাহারও অন্তরে! অরুণাভের কর্মক্লান্ত মুখখানি স্থির হইয়া দাঁড়ায়। বিবেকের অনুরোধ উঠে মনের প্রকোষ্ঠে! বিশ্বরূপকে ভুলিতেই হইবে তাহাকে।

অরুণাভের সহিত প্রথম পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি ভাসে চোখের সুম্মুখে। হিন্দিতে বক্তৃতা দেওয়া—রংকল মজদুরদের সামনে,

গভীর রাত্রিতে পোস্টার লেখা, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের জনবিরল রাস্তা... পদ্মা মনে মনে উচ্চারণ করে—প্রিয়, প্রিয় আমাদের। আধো-প্রেম আধো-স্নেহের কি স্নিগ্ধ বেদনা!

অদূরে হাঁস আর কুকুরের সঙ্গে পরী খেলা করিতেছে। স্বর্গীয় সুন্দর জীব সব। মাটির বুকেই আছে, তবু মাটি হইতে বহু উর্ধ্বে। পরী একটা বাটিতে কতগুলি মুড়ি লইয়া আসিয়াছে হাঁসগুলিকে খাওয়াইতে। কুকুরটাই খাইয়া ফেলে সব, হাঁসগুলিকে বঞ্চিত করিয়া। পরীর মনমত হয় না উহা। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া আসিয়া দাঁড়ায় মার কাছে।

পুকুরের ওপারে সুপুরীগাছগুলির আড়াল দিয়া কে একজন দ্রুত সাইকেল চালাইয়া চলিয়াছে।

সুপ্রিয় না? পদ্মা লক্ষ্য করিয়া দেখে। সুপ্রিয়ই। সেও দেখিতে পাইয়াছে তাহাকে। এক নিমিষের জন্য সাইকেলের গতিটা একটু কমাইয়া কি যেন বলিয়া যায় হাতের ইশারায়। কথাগুলি ধরা যায় না, বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়। তবু খুশি হয় পদ্মা, সুপ্রিয় এখানেই আছে তবে। দূরে মিলাইয়া যায় সাইকেলটা। বাতাসের আগে আগে উড়িতেছে মাথার চুলগুলি। রোদে পুড়ে পুড়ে কি চেহারা হয়েছে। মনে মনে ভাবে পদ্মা। এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে সেই দিকে।

পরী একটুকরা কাগজ লইয়া আসে কোথা হইতে—নৌকো বানাও মা।

—নৌকো।—পদ্মা কাগজের নৌকা বানাইয়া পুকুরে ভাসাইয়া দেয়, পরী খুশিতে ঝলমল করিয়া উঠে। শিশুর পৃথিবী! এত সুন্দর এই ছোট্ট দুনিয়াটুকু। তবু কেন সর্বক্ষণের জন্য একটা ব্যথার চাপ অনুভব করে সে। সারাদিন কাজ-কর্ম করে পদ্মা। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর টানে ম্লান কণ্ঠে মৃদু গলায়।

দিদিশাশুড়ী পূজায় বসিয়াছে। একমনে ধ্যান করিতেছে চোখ

বুজিয়া। পরী সেই ফাঁকে লক্ষ্মীর আসন হইতে লক্ষ্মীর মূর্তি তুলিয়া লইয়া আসে।

পদ্মা ছুটিয়া যায়—সর্বনাশ। শীগ্‌গীর রেখে এসো।

পরী কিছুতেই ছাড়িবে না।—এটা আমার পুতুল।

পদ্মা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যায় তাহার হাত হইতে পিতলের লক্ষ্মীদেবীকে। পরী পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

পদ্মা বলে—এস আমার কাছে, গল্প বলি—সাত ভাই চম্পা জাগরে।

পরী আপত্তি জানায়—না, কাগারাণীর গল্প বল।

পদ্মা সুর করিয়া গল্প শুনায় মেয়েকে—কাক এসে কাগারাণীকে ডাকছে, কাগারাণী, কাগারাণী, ভাত খাও এসে ঘরে।

কাগারাণী গাল ফুলিয়ে বলে,

কাগা আমায় মেরেছে—
গা কনকন করেছে—
বাজারে বাজারে ঢোল—
ভাত খাব না হাঁড়ি তোল।

সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে—বাপরে, কাগারাণীর রাগ তো কম নয়।

পরী লাফাইয়া উঠে কাকাকে দেখিয়া। কাকার কাছে গিয়া বলে—জানো কাকা বানরে বালিগুলোকে নুন বলে খায়।

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে—আর কিছু খাবার জুটলো না, বালিগুলোকেই খায়—তাও আবার নুন ভেবে। তোমার গল্পের বানরের দেশেও দুর্ভিক্ষ লেগেছে পরী!

পদ্মা খুশি হয় সুপ্রিয়কে দেখে। সুপ্রিয় লক্ষ্য করে। তাহারও মনটা খারাপ হইয়া যায় পদ্মার জন্য। একেবারেই সঙ্গীহীন এখানে। অথচ গেল পত্রে জানাইয়াছে অরুণাভ, তাহার চাকরি গিয়াছে এডিটারের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায়। অরুণাভের মায়ের মৃত্যুদিবস

আজ। দূর অতীতের একটি বিশেষ দিনের স্মৃতি জড়াইয়া ধরে মনে, যেদিন প্রথম চিনিয়াছিল সে তাহার অরুণাভকে।

পদ্মা বলে—চলো সুপ্রিয়, মায়ের শ্মশান থেকে ঘুরে আসি।

ছোট্ট একটি স্মৃতিবেদী সাদা পাথরের—একটা কাঞ্চনগাছের তলায়। সুপ্রিয় বসে গাছতলায় ঘাসের ওপরে। পদ্মাও বসে মেয়ে কোলে বেদীর তলায়। পদ্মা মৃদু গলায় গান করে তাহারই প্রিয়তমের জীবনদাত্রীর মৃত্যুতিথির স্মরণে। সেই প্রথম গাওয়া গান—হে মহাজীবন, হে মহামরণ।

অরুণাভের বিষণ্ণ মুখখানাই ভাসিয়া উঠে মনের আড়াল হইতে—তাহারই স্বামী, তাহারই প্রিয়তমের মাতৃহারা শিশু-মুখখানা যেন আসিয়া দাঁড়ায় সম্মুখে। পদ্মার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। ভারী হইয়া আসে কণ্ঠ, গান থামিয়া যায় আবেগে। টানিয়া লয় অসমাপ্ত গানের সুরকে। মৌনী বনবনানীর নিস্তব্ধতায় মিলাইয়া যায় পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর সুরস্রোত।

একটা গরুর গাড়ী চলিয়াছে ধীর মন্থর গতিতে, ভিটাত্যাগী গৃহস্থদের লইয়া। খালের এপারে দাঁড়াইয়া মুসলমান শিশুরা করুণ-নেত্রে দেখিতেছে তাহাদের খেলার সাথীদের চলিয়া যাওয়া। ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে থাকে গরুর গাড়িটা পিছু ডাকা চোখগুলির আড়ালে।...

কয়দিন ধরিয়া অরুণাভের চিঠির অপেক্ষায় উতলা হইয়া আছে পদ্মা। সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে বাহির হইতে—রৌদ্রে লাল হইয়া উঠিয়াছে চোখ মুখ। পদ্মার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে পদ্মা। বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে।

—কলকাতার চিঠিপত্র আসছে না। তাই বড় খারাপ লাগছে মনটা। আর একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে উঠলাম।

সুপ্রিয় কথা না বলিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। পদ্মা ব্যস্ত হইয়া তাকাইয়া দেখে, সুপ্রিয় আবার সাইকেলে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ফিরিয়া আসে সুপ্রিয় পোস্টাফিস হইতে। দূর হইতেই দেখায় একখানা এনভেলাপ।

—নাও তোমার চিঠি। এবার আমি চলি।

—চলি মানে? দয়া করে স্নানটুকু সেরে এসো ভাত ঠাণ্ডা হবার আগে।

রান্নাঘরে আসিয়া চিঠিখানা খোলে। অরুণাভের চিঠি। লিখিয়াছে—প্রিয় পদ্মা, তুমি পত্র পেয়েই চলে এসো—বিপাশা পুলিশের লাঠিতে গুরুতর রূপে আহত। ছাত্রদের একটা মিটিংয়ে উপর অতর্কিত লাঠি চালায় পুলিশ, অসংখ্য কাঁদুনে বোমা ছোঁড়ে। তাতে প্রায় একশ জন ছাত্র-ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এদিকে দালালদের প্রচেষ্টা আর প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সমান ভাবেই চলছে। ভারতবর্ষের রাজনীতি এক নতুন পর্যায়ে শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক শক্তি।

তুমি আর পরী। তোমাদের কথা সব সময় মনের কাছে আছে।

পরীর কথাই ভাবি—সে তো কিছুই বোঝে না। তোমার উদ্বেগময় জীবন হয়তো আর কোনদিন শেষ হবে না। তবু এই জীবনই আমাদের সার্থক। —অরুণাভ।

পত্র পড়িয়া আর এক ঘণ্টাও দেরি করিতে পারে না যেন পদ্মা রওয়ানা হইতে। সরকারমশাই আপত্তি জানায়—আজ এই অমাবস্যায় কচি মেয়ে নিয়ে বাড়ী থেকে রওয়ানা হাওয়াটা কি ঠিক হবে।

সরকারমশাই পঞ্জিকা খুলিয়া দেখে, তিনদিনের মধ্যে আর ভাল দিনও নাই যাত্রার। মঘা, অশ্লেষা।

সুপ্রিয় প্রতিবাদ করে—বিপদ যদি হয়ই কিছু, তাহলে কি আর মঘা অশ্লেষায় ঠেকে থাকবে। অরুণদার এ পত্র পেয়ে আর দেরি করা ঠিক নয়।

অগত্যা পালকি ঠিক করিয়া আসে সরকারমশাই। অত রাত্রিতে গরুর গাড়ী পাওয়া যাইবে না। রাত্রিতেই রওয়ানা হয় পদ্মা, মেয়ে কোলে পালকিতে উঠে। সুপ্রিয় সাইকেলে যায় পিছনে

পিছনে। দিদিশাশুড়ী নিঃশব্দে চোখের জল মোছে। পদ্মারও মনটা এবার বড় ভিজিয়া উঠে—এই হয়তো শেষ দেখা। কেমন একটা পিছুডাকা আকর্ষণ অনুভব করে পদ্মা আজ। ঐ বৃদ্ধা একলা এই জনহীন পুরীতে কি ভাবে দিন কাটাইবে ?

অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। পালকির বেহারারা হুঁশিয়ারি শব্দ করিতে করিতে আগাইয়া চলে।

চতুর্দিকে গভীর অন্ধকার—দূরে নদীতে মাছধরা নৌকার বাতি, বেহারাদের অদ্ভুত হুঁশিয়ারি শব্দ, কোলের উপর ঘুমন্ত শিশুর উষ্ণ নিশ্বাস—সব মিলিয়া এক রোমাঞ্চময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হয় দোদুল্যমান পালকিটি। দুই পাশের ভূতের মত কাল কাল ঝোপঝাড়, গাছপালা, টিনের গুদামঘর ধীরে ধীরে পিছনে সরিয়া যায়। এদিকে অনিশ্চিত সম্মুখের গাঢ় দুশ্চিন্তা, আরেক দিকে পিছুডাক। গভীর আকুলতায় বিষণ্ণ স্তব্ধতায় আচ্ছাদিত তমসা ঘেরা শর্বরী।

সমীর টিফিনের সময় তাহাদের ছাত্রদের খুঁজিয়া জানাইয়া দেয় — মিটিং হবে আজ, ছুটির পরে। যেও সবাই।

থার্ড ইয়ারের মলয় ঠাট্টা করে—তোমাদের ঐ গাছতলার মিটিং তো। তাহলে আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না।

সমীর বলে—গাছতলায় হলেও জরুরি ব্যাপার, আসা চাই-ই।

ছুটির পর তাহাদের ছাত্ররা জড়ো হয় কলেজ প্রাঙ্গণে। কয়েক জনের চোখে মুখে উদ্বিগ্ন ব্যস্ততা। দায়িত্বপূর্ণ চিন্তার ছায়া চোখের তারায়। প্রসাদ আগাইয়া আসে তাহার কাঠের পা লইয়া ধীরে ধীরে। বক্তৃতা আরম্ভ হয়। প্রধান বক্তা সে-ই। আগামী দিনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে সে ছাত্রদের।

জ্যোতির্ময়ও ছুটির পরে আলাদা ভাবে একটা মিটিং ডাকে তাহাদের ছাত্রদের লইয়া। দোতলার কমনরুমে জড়ো হয় তাহারা। নিজেদের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ শুরু হয় দুয়ার বন্ধ ঘরের ভিতরে।

কমলেশের ছোট ভাই অমরেশ আপত্তি জানায়, কমুনিস্টদের সাথে একত্রে কাজ করা চলতে পারে না।

জ্যোতির্ময় উত্তেজিত হইয়া উঠে—আমাদের কাজটাই বড় করে দেখতে হবে। কার সঙ্গে করা সেটা বড় নয়।

নিচে বড় রাস্তা দিয়া এক লরী বোঝাই লোক শ্লোগান দিয়া জোরে চলিয়া যায়ঃ স্ট্রাইক বন্ধ কর। শিশু রাষ্ট্রকে বাঁচাও। কমুনিস্টদের উস্কানিতে বিভ্রান্ত হয়ো না। আরও একটা লরী আসে চোঙ লইয়া সমস্বরে শ্লোগান দেয় লরীর ভিতর হইতে ঃ স্ট্রাইক মৎ করো।

গুণ্ডার মত চেহারা—উদভ্রান্ত দৃষ্টি ঘোলাটে চোখ। ছাত্ররা তাকাইয়া দেখে। তাহাদেরও চোখে চোখে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হয়।

তাহারাও প্রত্যুত্তর দেয় সমস্বরে চিৎকার করিয়া—ষ্ট্রাইক জরুর করেঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে লরীর ভিতর হইতে ইট আসিয়া পড়ে জমায়েত ছাত্রদের উপরে। উহারাও পাল্টা নিক্ষেপ করে সেইট কুড়াইয়া লইয়া। একটা লোকের মাথা ফাটিয়া যায় লরীর ভিতরে। লরীটা তীরের বেগে ছুটিয়া যায়।

ছাত্রদের মধ্য হইতে কে যেন চেঁচাইয়া বলে—থানায় চললি তো ব্যাটারা। যত সব মাতাল আর গুণ্ডা দিয়ে ষ্ট্রাইক ভাঙাবে। অত সোজা নয়।

সমীরের চোখের নিচে ফুলিয়া উঠিয়াছে। একটি ছেলে জলের ট্যাঙ্ক হইতে জল লইয়া ঢালিয়া দেয়।

বেলা পড়িয়া আসে। বাড়ী ফেরে ছাত্ররা পরের দিনের অবস্থা সম্বন্ধে অনিশ্চিত উদ্বেগ লইয়া।

হোস্টেলের ছেলেরা জটলা করে তখনও।

রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় পোস্টার আটকান—এই ষ্ট্রাইকের পেছনে আছে কম্যুনিষ্টদের উস্কানি। এই কম্যুনিষ্টরা

কারা ? যারা বিয়াল্লিশ সনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আজও এই শিশুরাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতে চাহিতেছে তাহারাই।

জ্যোতির্ময় পড়ে দাঁড়াইয়া পোস্টারটা। মনে মনে বলে, তোমরাই হচ্ছ আজকের শ্রমিকের বড় বন্ধু !

সুকল্যাণের ঘরে যায় জ্যোতির্ময়। সুকল্যাণের ঘরে আরও কেহ কেহ আসিয়াছে পূর্বেই। জ্যোতির্ময়ের মুখে সব শুনিয়া সুকল্যাণ বলে গম্ভীর হইয়া—বিয়াল্লিশ সনের পর আজ ছয় বছর কেটে গেল। আটচল্লিশে পা দিলাম এখনও সেই বিয়াল্লিশ সনের একঘরেরা জাতে উঠতে পারলো না। কুলীনের বংশধর সব তোমরা।

এরই মধ্যে একজন খবর লইয়া আসে, তাহাদের অফিস আক্রান্ত হইয়াছিল সন্ধ্যাবেলা। একজন মহিলানেত্রীকে অপমানিত করিয়া গিয়াছে।

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যায়। মেয়েদেরও সম্মান করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এরা ?

সুকল্যাণ আপসোস করিয়া বলে—আমাদের ঘাড়ে দাঁড়িয়ে আজ তোমরা নেতা। আর এখনই এই মূর্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামের অত্যাচারিত দেশপ্রেমিকরা আজ তাহাদের এ আত্মত্যাগী এ লাঞ্ছনার যোগ্য মূল্যই পাচ্ছে বটে।

প্রসাদ ফেরার পথে রিকশা করে। সমীরই বলিয়া দেয়—রিকশা করে চলে যাও তাড়াতাড়ি। বলা যায় না ওদের ব্যাপার-ট্যাপার। হুঁশিয়ার থাকাই ভাল।

প্রসাদ তাকাইয়া দেখে, রিকশাওয়ালা সুন্দর একটি ছোট্ট তেরঙ্গা পতাকা লাগাইয়াছে তাহার রিকশার মাথায়। প্রসাদ ইচ্ছা করিয়াই প্রশ্ন করে—ওটা লাগিয়েছ কেন ?

—কেয়া আপ জানতে নেহি স্বরাজ মিলগিয়া।

—স্বরাজ তো মিলগিয়া। কিন্তু তোমাদের হাল কিছু বদলেছে ?

আধা বাংলায় জবাব দেয় রিকশাওয়ালা—নেহি বাবু। হাম

তো গরীব আদমি। হামকো তো ভগবান দেখেছেন না, আউর কোন দেখেগা।

প্রসাদ আর প্রশ্ন করে না। মনে মনে ভাবে, আজাদী মিল গিয়া, এতেই খুশি। কিন্তু এ স্বরাজের সাথে তার কি লাভ হল সে প্রশ্ন মনে আসে না।

স্বরাজ পাওয়ার সহিত এদেরও যে জীবনের মস্ত সম্পর্ক থাকতে পারে তাই এরা জানে না। কিন্তু একদিন জানিবে। এ হাল চিরকাল আর থাকিবে না। মোড় ঘুরিবেই।

রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর রোয়াকে স্পেশাল বিল লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

—এ বিল যে গণ-আন্দোলনকেই পিষে মারার জন্য সেটা বুঝছো না কেন?

—তা তো না। এতে তো এমন কথা বলা হয় নি।

—বলা না হলে কি হবে?

রিক্‌শাটা ঘুরিয়া যায়—আর কানে পৌঁছায় না তর্কটা। অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে প্রসাদ।

সূর্যদের বস্তির পাশ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে রিক্‌শা। মনটা খারাপ হইয়া যায়। সূর্য নাই। গ্লাস ফ্যাক্টরীর ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দাঙ্গাতেই আরও সর্বনাশ হইল। বেশির ভাগ ইউনিয়নেই আজ এই অবস্থা। এইজন্যই তো দাঙ্গা জিয়াইয়া রাখিতে এত আগ্রহ মালিকদের। তাহার দাদাও তো আজ একজন মস্ত বড় হিন্দু পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু স্বার্থের জিগির তুলিয়া মুসলমান মজুরদের সব ছাঁটাই করিয়াছে তার ফ্যাক্টরীতে। মজুরদের একতা ভাঙিয়া গিয়াছে, আত্মবিশ্বাস হারাইয়া গিয়াছে। কি নিয়া আর টিকিয়া থাকিবে ইউনিয়ন।

সূর্যের রক্তমাখা দেহটা ভাসে চোখের সামনে। আরও কত অগণিত সূর্যের রক্তমাখা পথের উপর দিয়া চলিবে কালের রথচক্র।

৫ই জানুয়ারী। জেনারেল স্ট্রাইকের কল দিয়াছে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। আগের দিন সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে ভোরের অপেক্ষায়। অবিস্মরণীয় ২৯শে জুলাইয়ের কলিকাতা বারে বারে ছুঁইয়া যায় মনে। অরুণাভ বাড়ী ফেরে অনেক রাতে। পদ্মা ও বিপাশা উৎসুক চোখে তাকায়—কি খবর?

—খবর বিশেষ সুবিধার নয়! ট্রামেতে জোর চেষ্টা চলছে স্ট্রাইক ভাঙার জন্য। মারপিট হওয়ারও আশঙ্কা আছে।

পদ্মা দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। দালালদের স্বরূপ সে ভালভাবেই চিনিয়াছে দাঙ্গার সময় হইতে।

অন্ধকার ভোরে ঘুম ভাঙিয়া যায় বিপাশার। এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই শরীর। বিছানায় শুইয়াই কান সজাগ করিয়া থাকে সে। বহুদূর হইতে একটা ট্রাম চলার শব্দ কানে আসে যেন। বুকটায় মোচড় দিয়া উঠে এ শব্দে। ধীরে ধীরে শব্দটা ক্রমেই কাছে আসে—ট্রামই চলিতেছে। মনে হয় যেন, তাহার বুকের উপর দিয়াই চলিতেছে ট্রামের চাকাগুলি।

—দাদা, একটু দেখে এসো তো রাস্তায়।—বিপাশা ম্লান কণ্ঠে বলে।

অরুণাভ রাস্তার মোড়ে গিয়া দাঁড়ায়। দুই-তিনটা রুটের ট্রাম চলিতেছে। ক্রমাগত আসে যায় ট্রাম বাস। মনটা গুমরাইয়া উঠে। বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া আসে ঘরে।

বিপাশা শুইয়া শুইয়া পত্রিকাটা উল্টায় নিরানন্দ অনিচ্ছুক হাতে। তাহাদের সবচাইতে স্ট্রং ইউনিয়নই ট্রামের। এমনকি দাঙ্গায় যে সবচাইতে বড় ক্ষতি করিয়াছে, তাহাতেও ট্রামের একতা ভাঙিতে পারে নাই—দালালদের সব চেষ্টাই বৃথা হইয়াছে।

আর আজ জেনারেল স্ট্রাইক ডাকা সত্ত্বেও এই অবস্থা! ১৫ই আগষ্টের পর এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট ডাকা। আর শুরুতেই এত ব্যর্থতা!

দু-চারজন কমরেড আসে, একটু ঘুরিয়া যায়। সাময়িক হতাশার

অবসাদ সর্বাঙ্গে। আলোচনা করে তাহারা, কোথায় গলদ। আলোচনার দ্বারা মনের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখিতে চায়।

পদ্মা লক্ষ্য করে কমরেডদের চোখের এ বিষণ্ণতা। তাহারও বুকের ভিতরে একটা সমব্যথার চাপ। কেন এমন হয়? কর্মীদের এত তীব্র কর্মনিষ্ঠা, এত দুঃখবরণ এত ঐকান্তিকতা, তাও সার্থক হইয়া উঠে না কেন তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা! ভাবিয়া পায় না কেন এমন হয়—কেন সাধারণ মানুষ বোঝে না তাহাদের হিতাহিত।

দুপুরের দিকে সংবাদ লইয়া বাড়ী ফেরে অরুণাভ—শহরতলীর বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলিতে পূর্ণ হরতাল হইয়াছে। আশার বিজলী জ্বলিয়া উঠে বিপাশার দীপ্ত চোখ দুইটিতে। পদ্মা তাকাইয়া দেখে—এসংবাদ যেন আশার প্রলেপ বুলায় উহাদের চোখেমুখে।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা এত দুঃখ পাচ্ছে লোকে, তাও নিজে থেকেই সংগ্রামমুখী হয়ে উঠে না কেন তাদের মন?

বিশ্বরূপ উত্তর দেয়—মানুষের দুঃখ থাকাটাই সব নয়। দুঃখবোধ থাকাটাও কম কথা নয়। দুঃখকষ্টের ব্যথাকে ক্লোরোফরম করে রেখেছে অদৃষ্টের লিখন বলে। না খেয়ে মানুষ মরছে ঠিকই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানছে, যে তারও বাঁচার পথ আছে, সুন্দর ভাবে বাঁচার অধিকার আছে পৃথিবীতে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিদ্রোহ করতে পারে না। নিজেদের একত্রিত শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রামমুখী হতে পারে না মন। আর এখনকার স্ট্রাইক ব্যর্থ হবার আরেকটা মস্ত কারণ—এতদিন স্ট্রাইক হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি। এখন স্ট্রাইক হচ্ছে দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটা এখনও তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠে নি দেশের মানুষের চোখে।

একখানা এনভেলাপ্ আনিয়া দেয় অরুণাভ পদ্মার হাতে। পদ্মা খুলিয়া দেখে, পিসীমার পত্র—কাশী হইতে লিখিয়াছেন। দীর্ঘ পত্র। পিসীমা লিখিয়াছেন তাহাদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। পরিশেষে জানাইয়াছেন তাহাদের আদর্শ দীর্ঘজীবী হউক।

পদ্মা অভিভূত হয়। পিসীমার শিল্পপ্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেওয়া কথাগুলি একটু ছুঁইয়া যায় মনের প্রান্ত দিয়া। সেই পিসীমা, কাশীবাসী আশী বছরের বৃদ্ধাও আজ সাম্যবাদীদের কল্যাণ কামনা করিতেছি একান্ত নিভৃতে।

বিকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে পদ্মা অরুণাভের জন্য। সে জানে এ সময়ে সে আসিবে না। তবু একটু ক্ষীণ আশার ছোঁওয়া লাগিয়া থাকে মনের এক জাগ্রত কোণায়।

চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে পদ্মা, সবই তো আছে তাহার, তবু বিরাট এক শূন্যতা যেন চাপিয়া থাকে সর্বক্ষণের জন্য মনের অতলে। অবুঝ ব্যথার ক্রন্দন আকাশে বাতাসে। চোখের পর্দার তলায় জল জমিয়ে উঠে থাকিয়া থাকিয়া। কিন্তু কাঁদিতে পারে না সে। শুধু ব্যথার চাপ অনুভব করে অনুক্ষণ। মাঝে মাঝে মনে হয় তাহার, এক দিগন্ত-না-পাওয়া প্রকাণ্ড শূন্যমাঠের বুকে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি এ চাপা ক্রন্দনগুলি হাল্কা হইত মন হইতে।

মনে হয় সবচাইতে বড় পাওয়া হইতেই ব্রঞ্চিত তাহার সমস্তটা জীবন। পৃথিবীর এই রূপলাবণ্যময়ী প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর আবরণ দিয়া স্নেহ-পিপাসু শিশুমনের চাহিদাকে কিছুটা ভুলাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল সে। কিন্তু আজ আরম্ভ হইয়াছে সেই বঞ্চিত প্রাণশিশুর কান্না। ফাঁকি দিয়া ভরা মনের আর্তনাদগুলিকে ঘুম-পাড়ানীর গান দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে আজ আর যেন পারিতেছে না সে।

এত অজস্র মানুষেরই সহ-পথচারী সেও তো। তবু কেন এত একা মনে হয় নিজেকে, একলা পথচলার শ্রান্তি আসে মনে। খুঁজিয়া বেড়াইতেছে তাহার মন সেই না-পাওয়া চিরবাঞ্ছিতকে—প্রাণের সহচরকে।

মাঝে মাঝে অনুভব করে পদ্মা, যেন পৃথিবীর কোন এক

নিবিড়তম শেষ সীমানায়. যেন এই অগণিত অর্বুদ মানুষের বহুদূরে —সীমাহীন আড়ালে, তাহারই প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে তাহার একান্ত ব্যথার জন। স্নেহ পিপাসার কি গভীর কামনা—কি গভীর বেদনা! শূন্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন মিশিয়া আছে এই স্নেহ-কাতরতা।

পদ্মা ডাকে বুকভাঙ্গা অস্ফুট স্বরে—উঃ মা মাগো কোথায় তুমি কতদূরে।

তাহার ভিতর হইতে কেহ যেন বলিয়া দেয় ক্ষীণ কণ্ঠে—আছে আছে সে।

বহু দূরে তাহার মনের দৃষ্টির দিগন্তে, এই পৃথিবীরই মাটিতে আলোতে বাতাসে মিশিয়া আছে তাহার সেই চিরবাঞ্ছিতা মমতাময়ী শেষ আশ্রয়।

পদ্মার নিস্পলক চোখের মণির অতল গভীরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে এক সুন্দর স্নিগ্ধ শিশুর ছায়া। পরী—তাহারই পরী! তাহার জীবনের শেষ সম্বল, শেষ আশ্রয়।

পদ্মা উঠিয়া যায়। খেলায় রত মেয়েকে কোলে তুলিয়া আদর করে। করুণ-কাতর আবেগে বলে সে—পরী মা, তুমিই তো আমার মা, আমার একমাত্র আশা। তোমার এই ছোট্ট বুকখানাই তো আমার শেষ আশ্রয়।

স্নেহ-ঝরা কোমল চুম্বন করে অজস্র। পরীও বুঝি একটু স্থির চোখে তাকাইয়া গ্রহণ করে মায়ের এ স্নেহার্দ্র আদর। বুঝিতে চেষ্টা করে বুঝি বা সে মায়ের আবেগে ভেজা কথাগুলি। মৃদু বিস্ময় ঝরে শিশু-চোখে। জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে সেও। শিশুর মা তাকায় অপলক মায়াময় চোখে। চারিটি চোখের এ মিলন-আবেশে ধরা দেয় আদিমতম পৃথিবীর প্রথম রহস্য। প্রাণের ধারা বহিয়া চলে ধরিত্রীর বুকে।

বিপাশা উঠিয়া বসিয়াছে। পদ্মা লক্ষ্য করে, বিশ্বরূপের চোখে

স্বস্তির নিশ্বাস ঝরিতেছে। এ কয়দিন নিদারুণ উদ্বেগের কাল ছায়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে।

গভীর স্নেহ আর দুশ্চিন্তার চাপ ভিতরে, তবু বাহিরে ধীর স্থির প্রশান্ত, কোমল।

বিপাশার পাশে বসিয়া পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতেছে বিশ্বরূপ। পদ্মা চা লইয়া আসে। বেতের ছোট একটা টেবিলের উপর রাখে চায়ের সরঞ্জাম। পরীও হাজির হয় যথাসময়ে।

—কম, লাল ছেলাম।

বিপাশা হাসিয়া বলে—লাল সেলামের ঘুষ দেওয়া হচ্ছে মেয়ে। লাল সেলামের বদলে শুধু রুটিই পাচ্ছ না আর, এরকম লাঠির বাড়িও পেতে হবে। যে যুগে জন্মেছ !

বিশ্বরূপকে কমরেড ডাকিতে শিখাইয়াছে পদ্মা। পরী সম্পূর্ণ টা বলিতে পারে না। তবু 'কম' বলিয়া ডাকে তাহাকে। বিশ্বরূপ আদর করিয়া হাত বুলায় মাথার নরম ঝাঁকড়া চুলগুলিতে।

অরুণাভ ঘরে ঢুকিয়া বলে—খুব তো আদরকুড়ানি মেয়ে। বিপাশার দিকে তাকাইয়া বলে—বাঃ বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে আজ বিপাশাকে। আর এ কদিন যা হিমসিম খাইয়ে তুলেছিল শ্রীমতী আমাদের।

পদ্মা মেয়েকে বলে—যাও তো পরী, কাকাকে তুলে আন।

পরী ছুটিয়া যায়।

অরুণাভ বলে—কাকার এখন মাঝরাত্রি দেখে এলাম। তিনি এখন উঠলেই হয়।

সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে—না উঠে উপায় আছে ? যা একটি কন্যা সৃষ্টি করেছ। নাকের ভিতর পেনসিল ঢুকিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ছাড়লো তোমার মেয়ে।

বিপাশা হাসিয়া বলে—বোধহয় নাক ডাকছিলে। ও তাই একটু পরীক্ষা করে দেখে এল ব্যাপারটা কি।

সুপ্রিয় সস্নেহে তাকায় পরীর দিকে। মেয়েটাও কাছে টানার যাদু জানে।

প্রসাদ উপস্থিত হয় আসরে।

—কি খবর। এ অসময়ে যে ঠাট্টা করে অরুণাভ।

—অসময়ে মানে? এর চাইতে যোগ্য সময় আর কি হত? রুটি মাখন জেলী। দস্তুরমত ফিস্ট। রোগীর নাম করে বুঝি শুশ্রূষাকারীদের দিব্যি চলছে।—একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লয়। পদ্মা তাহার হাতের একটা বাণ্ডিলের দিকে তাকাইয়া বলে—কি লিফলেট উড়বে নাকি আকাশ থেকে।

—মাঝে মাঝে একটু-আধটু না উড়লে ভরসা আসে কি করে—আমরা যে বেঁচেই আছি তার প্রমাণটা তো চাই। বিপাশার দিকে তাকাইয়া দেখে একটু খুশির চোখে।—হাতটা ঠিক হয়ে গেছে তো?

বহুদিনের দুশ্চিন্তার পর সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে সকালটুকু।

বিপাশা বলে—পদ্মা, গান শোনার মতই কিন্তু আজকের সকালটা।

বিশ্বরূপ সায় দেয়—ঠিকই বলেছে বিপাশা।

সুপ্রিয়, পদ্মা ও প্রসাদ গান ধরে একসঙ্গেঃ আব্‌ কোমরবান্ধ তৈয়ার হো লাখো কোটী ভাইয়োঁ।…

ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ আহ্বান।

সুরের উদ্দীপনায় ভরাট হইয়া উঠে ঘরখানা। গান শেষ হয়, তবু গানের ধুয়া জড়াইয়া থাকে রৌদ্রস্নিগ্ধ ঘরের প্রতিটি আসবাবে।

সন্ধ্যাবেলা পদ্মা উনানে আগুন দিয়া রাতের রান্নার আয়োজন করে। কলতলা হইতে জল তুলিয়া রাখিয়া মসলা পিষিতে বসে। পরীও আছে সঙ্গে সঙ্গেই। প্রতি কাজে মাকে সাহায্য করা চাই।

ডাল ফুটিতেছে কড়াইয়ে। পরী আসিয়া কতকগুলি নুন দিয়া দেয় ফুটন্ত ডালে। পদ্মা চেঁচাইয়া উঠে—এই যা, কি করলি, আজ

আর কারও ডাল খেতে হবে না। এসো, আগে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে নিই নইলে কোন কাজ তুমি করতে দেবে না।

মেয়েকে কোলে শোওয়াইয়া ঘুমপাড়ানীর ছড়া বলে পদ্মা। মায়ের কোলের একান্ত নির্ভরতায় অশান্ত, ডাগর চোখে ধীরে ধীরে ঘুম জড়াইয়া আসে।

চাঁদ দেখা দেয় আকাশে। আবেশময় ফিকা জ্যোৎস্না। পদ্মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে ঘুমন্ত মেয়েকে। ছোট্ট চোখের পাতা দুইটিতে যেন কোমল ঘুমের তুলি বুলাইয়া গিয়াছে কে। চাঁদের আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়ে সে দুটি ঘুমন্ত পাপড়িতে।

উনানের উপর ডাল সিদ্ধ হইয়া যায়। পদ্মা উঠিয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া আসে। অরুণাভ আসিয়াছে। কতগুলি কাগজ পোড়াইতে আসে সে উনানের ধারে। জ্বলন্ত উনানের লাল আভা আসিয়া পড়িয়াছে পদ্মার মুখে--অরুণাভ দাঁড়াইয়া একটু দেখে। বড় ম্লান বড় বিষণ্ণ, দেখাইতেছে তাহাকে। চোখে মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া। অরুণাভ চিন্তিত সুরে বলে—বড় দুর্দিন এসে গেল আমাদের। আমাদের পার্টি বেআইনী হয়ে গেল।

পদ্মা স্তম্ভিত হইয়া যায়। ইহা যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জানিত সে, তবু সংবাদটা বড় বেশী আকস্মিক মনে হয়।

অরুণাভ ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় একটু হাত রাখে। চোখ ভরা পিতার আশীর্বাদ। পদ্মাও পাশে আসিয়া বসে। নিবিড় মমতায় তাহার বহু কাজের দায়িত্ব আঁকা বলিষ্ঠ হাতখানা হাতের মুঠোয় তুলিয়া লয়। আর বেশীদিন নয় এ ঐকান্তিক কাছে পাওয়া। নিঃশব্দ রাত্রির স্তব্ধতায় কত ব্যথা, কত বেদনা ঘন হইয়া উঠে। লক্ষকোটি আর্তনাদে ডুকরাইয়া কাঁদে পদ্মার অন্তরাত্মা। এই সুন্দর গৃহপরিবেশকে নিষ্ঠুর পায়ের তলায় পিষিয়া মারিতে চায় উহারা। নারীহৃদয়ের অন্তঃসত্তা কল্যাণী কামনাগুলি অভিশাপ ছড়ায় রাবণের বংশবীজের গায়ে।

নিচে রাস্তা দিয়া ভারী বুটপরা একদল সঙ্গিনধারী পুলিশ মার্চ

করিয়া যায়। গৃহ আঙ্গিনার প্রাণদেবতাকেই ছিনাইয়া লইতে আসিতেছে যেন উহারা। তাই এত আর্তনাদ উঠিয়াছে মানুষের ব্যথায়, বুদ্ধিতে আর কামনায়।

ছাত্রদের উপর আবার গুলি চলিয়াছে। একটি ছেলে মারা গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। বাতাসের আগে আগে এ চঞ্চল সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। অরুণাভ সারাদিন সাইকেলে ঘোরে রাস্তায় রাস্তায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম অভিনন্দনগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছে লোকে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে। ক্ষুব্ধ ছাত্রদের সায়েস্তা করিতে ছুটিতেছে সঙ্গিনধারী দেশী-বিদেশী পুলিশ বোঝাই ট্রাকগুলি।

পিচের রাস্তার উপর স্পষ্ট রৌদ্রের তলায় তরুণ দেহের কাঁচা রক্তগুলি জমিয়া উঠিয়াছে। থান থান জমাট-বাঁধা রক্ত।

—এই স্কুলেপড়া কচি ছেলের বুকে অহিংস-গুলি ছুঁড়ে দেশ শান্ত করছেন বীরপুরুষরা।—অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে দেখে এক পরিচিত শিক্ষক। মোড়ে দাঁড়ানো বন্দুকধারী সার্জেন্ট। ঘৃণায় ফাটিয়া পড়িতেছে ক্রুদ্ধ জনতার চোখমুখ।

অরুণাভ লক্ষ্য করে নিঃশব্দে। কোন একজন নেতার মোটর গাড়ী দ্রুত চলিয়া যায়। ভিড়ের ভিতর হইতে ঘৃণামাখা বিদ্রূপ শোনা যায়—শালা, উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করতে বেরিয়েছে। এ দেখি ব্রিটিশ আমলকেও ছাড়িয়েছে।

সুদৃশ্য একটা বাড়ীর সামনে অরেকটি ভিড় জমিয়াছে। রেডিওর সংবাদ শোনার জন্য।

রেডিওতে সংবাদ দেয়—ছাত্ররা দেশের শান্তিভঙ্গ করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় পুলিশ গুলি ও কাঁদুনে বোমা ছুঁড়িতে বাধ্য হয়। হতাহতের সংখ্যা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

আবার বিদ্বেষমাখানো মন্তব্য আরম্ভ হয়—ব্যাটারা সংবাদটা চেপে গেল।

পথে পথে ভদ্রমানুষের উত্তেজনা লক্ষ্য করে অরুণাভ। মনে মনে বলে—ভাঙুক, দ্রুত ভুল ভাঙুক মানুষের।

গভীর রাত্রিতে চমকিয়া উঠে অরুণাভ—প্রসাদ এল নাকি এত রাতে। পদ্মা বসিয়া আছে তখনও।

—এ কি দিদি, এখনও ঘুমাও নি।

—ঘুম আসছে না—বড় অস্থির লাগছে!

সমস্ত দিনের সংবাদে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে সে! স্কুলেপড়া ছেলের প্রতীক্ষা-রত মায়ের কথাটা ভাবিতে পারিতেছে না পদ্মা। শ্লেট, পেনসিল, বইয়ের ব্যাগ লইয়া সে আর ঘরে ফিরিবে না। প্রসাদের মুখে রাত ভরিয়া শোনে পদ্মা স্বদেশী পুলিশের অত্যাচার কাহিনী।

অরুণাভ প্রসাদের মশারীটা গুঁজিয়া দিয়া যায়।

—একটু ঘুমিয়ে নাও প্রসাদ। মনে মনে ভাবে—আজ তো দিদির সাথে কথা বলছে, কালই হয়তো কি ঘটে যেতে পারে।—মনে মনেই চমকিয়া উঠে অরুণাভ।

পদ্মা সযত্নে কাঠের পা-খানি রাখিয়া দেয় ঘরের কোণায়।

প্রসাদ শুইয়া পড়ে—শুয়ে পড়লাম দিদি। তুমিও যাও ঘুমাও গিয়ে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া আবার বলে প্রসাদ—আমাদের বহু ছেলেমেয়েই গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা এখন হাজত ঘরে দিব্যি ছারপোকার কামড় খাচ্ছে। আসলে ঘুম আসে না তাহারও চোখে। সমস্ত দিনের উত্তেজনায় অস্থির, চঞ্চল স্নায়ু।

ভোরে উঠিয়াই প্রসাদ বাহির হইয়া যায়।

সমীরের সঙ্গে প্রসাদ ও বিজয় আসিয়া দাঁড়ায় শহরতলীর একটা স্কুলের দুয়ারে। রুক্ষ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা তিনজনেরই—উস্কো-খুস্কো চুল, দৃষ্টিতে অগ্নিকণিকা।

স্কুলে স্ট্রাইক করাইতে আসিয়াছে তাহারা।

এই স্কুলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছে প্রসাদের। ইট বাহির করা স্কুলের এই দালানটার পাশেই ছোট্ট মাঠ। মাঠের কোণার বকুলগাছটার তলায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়া গিয়াছে বহুবার। ছাত্ররা ভালবাসে এই প্রসাদদাকে, ভালবাসে এই সমীরদাকে।

স্কুল ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসে ছাত্ররা। প্রথমেই পিল পিল করিয়া বাহির হয় ছোট ছেলেরা শ্লেট বই টিফিনের বাক্স হাতে।

স্কুলের সামনের রৌদ্রে-ভেজা ছোট্ট মাঠটুকুতে জমা হয় সবাই। রোদে চিক্‌চিক্ করে শীতে-ফাটা গালগুলি। সমীর আসিয়া দুই ভাগ করিয়া দেয় ছেলেদের। বড়দের একদিকে আর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আরেক দিকে। তারপর ছোটদের দিকে তাকাইয়া বলে—তোমরা এবার বাড়ী চলে যাও।

—কেন, আমরা প্রসেশনে যাব না?—কচি কণ্ঠে আপত্তি জানায়।

—আর একটু বড় হবে যখন, তখন তোমাদেরও নিয়ে যাব। আজ বাড়ী যাও, কেমন। গুলি-টুলি যদি চলে, কি করবে?

—আমরা মরতে ভয় পাই না।—স্পষ্ট উত্তর আসে ছোটদের ভীড় হইতে।

—তোমাদের নিয়ে যাব আরেক দিন।—সমর্থনের সুরে বলে প্রসাদ। মনে মনে ভাবে—তোমাদেরও দিন আসছে শীগ্‌গীরই।

একটি ছোট ছেলে কিন্তু কিছুতেই বাড়ি যাইবে না। ছিটের হাফসার্ট গায়ে পাতলা চেহারা। ড্যাবডেবে চোখে কাকুতি জানায়।

সমীর আসিয়া মাথায় মৃদু অনুরোধ-মাখা হাত রাখে—লক্ষ্মী ছেলে কথা শোন আজ।—অগত্যা বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকে সে বইয়ের ব্যাগ হাতে। প্রসেশন করিয়া চলিয়া যায় স্কুলের বড় ছেলেরা।

সমীর দূর হইতে দেখে, হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেলেটি তখনও সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া আছে রাস্তার ধারে। দূর হইতে আরেকটা মিছিলের ধ্বনি কানে আসে—নারীকণ্ঠে অর্বুদ প্রতিবাদ গর্জিয়া উঠিয়াছে,

"শিশু হন্তার ক্ষমা নাই।" দূর হইতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পোস্টারের পর পোস্টার আগাইয়া আসে। বড় বড় লাল অক্ষরে প্রতিহিংসার তরঙ্গ। লক্ষ্য তাহাদের মেডিকেল কলেজের মর্গ।

মেয়েদের প্রসেশনের সাথে চলিয়াছে বিপাশা। উত্তেজিত, রুক্ষ মূর্তি।

একটা পানবিড়ির দোকানের সামনে একজন ভদ্রবেশী লোক মন্তব্য করে—যত সব কমুনিষ্টদের গুণ্ডামী। ধিঙ্গিগুলিও বেরিয়েছে আবার।

—কি, কি বললেন! মেয়েদের সম্বন্ধে কথা বলতে শেখেন নি। —দোকানের ধারে দাঁড়ান বছর বার বয়সের একটি ছেলে গর্জিয়া উঠে। একটা ইটের খণ্ড তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারে তাহার কপালে।

অদূরে টহল দিতেছে এক ট্রাক বোম্বাই সশস্ত্র পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে স্থির-লক্ষ্য অব্যর্থ গুলি আসিয়া লাগে বালকের দেহে। মারাত্মক বিস্ফোরকগুলি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ঢলিয়া পড়ে ছেলেটি। তীরের বেগে রক্ত ছোটে। তবু শেষ ঘৃণা জানাইয়া যায় বালক —বাঁচবো তো? বেঁচে উঠে এর জবাব দিতে পারবো তো?

আর কথা বলিতে পারে না, জিহ্বা জড়াইয়া আসে। বিপাশা তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল ছিঁড়িয়া দেয় ক্ষতের মুখে।

ছোট্ট মানুষটির দেহ হইতে রক্তগঙ্গা ছোটে। ভীষণ দৃশ্য। ছাত্ররা সবাই তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া যায় রাস্তার ধারের একটা বাড়ীর অন্দরে। তাহাদের চোখে ভাঙিয়া পড়ে, নির্ভীক বালককে বাঁচাইবার ঐকান্তিক কামনা। ছোট্ট একটি ফ্রকপরা মেয়ে ছুটিয়া পাখা লইয়া আসে; ছোট্ট ভীরু চোখ দুটি আতঙ্কে স্থির হইয়া যায়। গৃহস্বামী দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় ট্যাক্সি ডাকিতে।

কিন্তু গাড়ী আসিয়া পৌঁছিবার আগেই সব শেষ হইয়া যায়।

একটি ছেলের পেছনে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে সমীর।

—প্রাণ আছে ত?—ক্ষীণ আশায় অবরুদ্ধ জিজ্ঞাসা। মাথা নত করে সকলে। সমীর চমকাইয়া উঠে,—সকালের প্রত্যাখ্যাত সেই

ছেলেটি, সেই ছিটের জামা গায়ে—রক্তে ভেজা, বিবর্ণ। নিশ্চুপ গৃহপরিজনদের পেছনে আসিয়া দাঁড়ায় সমীর। প্রতিজ্ঞা কঠিন নিশ্চল মূর্তি। চোখে প্রতিহিংসার অমর ক্ষুধা। নিঃশব্দে বসে মৃত বালকের মাথার কাছে। স্নেহসিক্ত হাতে স্পর্শ করে কিশোর শহীদের হিমশীতল দেহ। মনে মনে শপথ লয়—প্রাণ থাকিতে এ অন্যায়কে ক্ষমা করিবে না সে।

বিপাশা চোখ তুলিয়া তাকায়—অশ্রুভরা, কঠিন দৃষ্টি।—সমীর ছেলেটি তোমার—

—ভাই।—উত্তর দেয় সমীর। অগ্নিগর্ভ সম্মুখের ইঙ্গিতময় সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মাথা নত করে আশ্রয়দাতা গৃহপরিজনেরা। ভদ্রলোকের বৃদ্ধা মা বিলাপ করিয়া কাঁদে—হায়রে পোড়ারমুখোরা, তোরা যে তোদের নিজের ছেলেকেই মারতেছিস। এ পাপ তোরা রাখবি কই ?

নিচে রাস্তায় অজস্রকণ্ঠে গর্জিয়া আসে আরেকটা মিছিল "কংগ্রেস সরকারের ধাপ্পাবাজিতে—ভুলবো না ভুলবো না।"

পদ্মা একটা ঠিকানার সন্ধানে চলিয়াছে। মনে মনে ঠিক রাখে বাড়ির ঠিকানাটা। বিপাশা আত্মগোপন করিয়া আছে এই বাড়িতে। বহুদিন, বহুবার হাঁটিয়া গিয়াছে সে এই পথে। কিন্তু আজ যেন কোন বিরাট শুভ যাত্রার পদধ্বনি-গোণা এ পথচলা। এক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার লইয়া চলিয়াছে সে। তৃপ্তির ছোঁওয়া ছুঁইয়া যায় চিন্তানিবিষ্ট মনে। মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা লয় সেও। অরুণাভ, বিপাশা, বিশ্বরূপ, প্রসাদ, সুপ্রিয় তোমাদের পদচিহ্ন ধরিয়াই যাত্রার আরম্ভ হোক আজ এ মাহেন্দ্র ক্ষণে। ছোট একটা ফ্যাক্টরীর দিকে চলিয়াছে একদল মজুর-মেয়ে ভোরের হাজিরা দিতে।

পদ্মা মনে মনে বলে—আগামী কালের জন্মদাত্রী তোমরা,

সুন্দর পৃথিবীকে গড়িয়া তুলিবে তোমাদের অকৃপণ সৃষ্টির প্রাণরস দিয়া।

আবার যুদ্ধের পদধ্বনি ভাসিয়া আসে শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া তুরন্ত সাগরের ওপার হইতে—রেডিওতে ভোরের সংবাদ দেয়ঃ...মার্কিন সৈন্যের বিপুলবাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে তুর্জয় রণ-সম্ভার লইয়া আলাস্কার দিকে।—

পদ্মা দূর হইতে দেখে ফ্যাক্টরীর মজুরানীদের। ভিতরের মন র্তনাদ করিয়া উঠে—জননী, জন্মদাত্রী, তোমাদের অন্তসত্বা প্রাণশিশুকে হত্যা করিতে আসিতেছে আবার—

পদ্মা একটা গো-বাথানের পাশ দিয়া জীর্ণ বাড়ির আড়ালে কয়া পড়ে।

কাজ শেষ হইয়া যায়। পদ্মা শ্রদ্ধাবিগলিত চোখে তাকাইয়া দেখে এ মহাযাত্রার সারথাকে—তাহার অগ্নিগর্ভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়াল হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে কল্যাণপ্রসূ সৃজন-স্নিগ্ধতা।

পদ্মা ফেরার পথে হাঁটে। আরও এক জায়গা ঘুরিয়া যাইতে হইবে। ট্রাম বাস, আর পথচারীর পথচলায় ঘন হইয়া উঠিয়াছে প্রশস্ত রাজপথ। কল্যাণীদের বাড়ির পাশ দিয়াই হাঁটে। কিন্তু আজ আর সেখানে যাওয়ার কোনও তাগিদ নাই মনে। পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছে আজ ভিন্ন আদর্শ-ধরা বান্ধবীদের মধুর সম্পর্কে। গভীর ব্যথার সাথেই বোঝে পদ্মা, বন্ধুত্বের পুরান জীর্ণ গ্রন্থিগুলিকে আর জোড়া দিবার উপায় নাই!

বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ায় পদ্মা। আর এক জায়গা ঘুরিয়া যাইতে হইবে। আরও তুইটি ভদ্রলোক বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া। তর্ক করিতেছে তাহারা কলম ধর্মঘটীদের লইয়া।

—এত স্ট্রাইক করলে এ শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে দেশের উন্নতি করা সম্ভব হয় কি করে।

—ছাত্রদের উপর গুলি চালনার সময় ত শিশুরাষ্ট্রের শিশুরূপ

দেখা যায় নি।—আগুন ঠিকরাইয়া পড়ে যেন প্রতিবাদকারীর চোখে মুখে।

বাস আসিয়া পড়ে। পদ্মা উঠিয়া যায় বাসে। ভদ্রলোক দুইটির তর্ক থামে নাই তখনও।

পদ্মা বাসের জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখে যেন যুদ্ধরত বিপক্ষ শিবির হইতে দুইটি সৈন্য মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে।

বাস ছুটিয়া চলিয়াছে। খোলা ময়দান, সুসজ্জিত দোকানপাট, হরেকরকমের বিজ্ঞাপনের বাহার, প্রাসাদ, গীর্জা সব ছাড়াইয়া বাস্ ছুটিয়াছে।

মাঝে মাঝে চমক ভাঙ্গে পদ্মার। যাত্রীদের ওঠানামায়, কনডাক্টারের চিৎকারে—একদম রোক্কে জেনানা আদমী।

আবার চেঁচায়, লেইক—লেইক—গড়িয়া হাটা। লেইক গড়িয়া হাট্টা। ফুলস্পীডে চলে বাস। মাঝে মাঝে থামে আবার সময়ের হিসাব লেখাইতে। ভিখারীরা ঘিরিয়া দাঁড়ায়, হকারেরা টেলিগ্রাম লইয়া ছুটাছুটি করে।—জোর খবর, জোর খবর। তেলেঙ্গানায় কমুনিষ্টদের জোর আক্রমণ।—আবার মোড় ঘুরিয়া চলে বাস।

কপাল-জোড়া সিন্দূর পরিয়া হাত গণনা করিতে বসিয়াছে সারি সারি পৈতাধারীরা। পয়সার ছড়াছড়ি পিতলের থালার উপর। ভাগ্যপরীক্ষার্থীর ভীড় সম্মুখে। মনে মনে তিক্তস্বরে আওড়ায় পদ্মা—এই ত ভারতের নিজস্বরূপ। হলুদ রংয়ের একটা ঘুরান প্রাচীরের গায়ে কাল অক্ষরে লেখা জ্বল জ্বল করিতেছে—"কমুনিষ্টপার্টি জিন্দাবাদ।"

আশার দীপ্তি খেলিয়া যায় চোখে। বাস ষ্টপে আসিয়া পড়ে। পদ্মা নামিয়া যায় ভীড়ের আড়ালে।

কয়দিন একটানা রাত্রিজাগা ও দুশ্চিন্তায় বিশ্বরূপের শরীর আবার খারাপ হয়। তবু লেখার বিরাম নাই। যে কোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হইতে পারে। তাহার আগেই, আরব্ধ বইখানা শেষ করা চাই।

পদ্মা সারা দুপুর বিশ্বরূপের ঘরে বসিয়া টুকিয়া দেয় পাতার পর পাতা। পড়িয়া শুনায়, বিশ্বরূপের নির্দেশমত অদল বদল করে। বিশ্বরূপ মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু পদ্মার ক্লান্তি নাই। বিশ্বরূপ সস্নেহে দেখে লিখনরতা পদ্মাকে। মনে মনে ভাবে, বিপাশা আত্মগোপন করিয়া আছে। অরুণাভ, সুপ্রিয়, প্রসাদের উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে। একা পদ্মা সংসারের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। একটা অসহায় ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া স্পর্শ করে মনে। পদ্মার লেখা শেষ হইয়া যায়।

পাশের বাড়িতে মধ্যাহ্নের রেডিওতে গাহিতেছে কোন এক ইংরাজ গায়ক—সুরের আড়ালে পিয়ানোর উঁচুনিচু ঢেউ খেলিয়া যায়। দূরে এক বড়লোকের বাড়ীর ছাদে প্রকাণ্ড তেরঙ্গা পতাকা উড়িতেছে বাতাসে। পদ্মা অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে। মনের ভিতরে আর্দ্র স্বরে কে যেন বলিয়া উঠে, জাতীয় জাগরণের ঐতিহ্যবাহী পতাকা তুমি! কিন্তু আজ একি নিদারুণ পরিণতি তোমার ?

পুতুল খেলার বয়স হইতে কত বিস্ময়, কত রোমাঞ্চভরা চোখে দেখিয়াছে সে এই পতাকাকে। কত ব্যথা, কত শ্রদ্ধা জমা রহিয়াছে তাহারই ভাইবোনদের বুকের রক্তে রাঙ্গা ঐ তিনটি রঙের আড়ালে।

কোন এক শ্রমিকদের সভায় দেখিয়া আসা লাল ঝাণ্ডার ছবিটা ভাসে তাহার চোখের সামনে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবনানুভূতিকে অভিনন্দন জানায় সেই সুদীপ্ত পতাকা।

পদ্মা মনে মনে উচ্চারণ করে—ইতিহাস সৃষ্টিকরা এ ঝাণ্ডা উঁচাই থাকিবে পৃথিবীর বুকে। অন্যায়ের পদলেহিত মানুষের এই অকল্যাণী গর্বগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে একদিন।

একটি ভদ্রলোক আসিয়াছে বিশ্বরূপের কাছে। পদ্মা উঠিয়া আসিয়া চেয়ার টানিয়া দেয় বসিতে।

পদ্মার দিকে একটু তাকাইয়া বলে ভদ্রলোকটি, কেমন আছেন? শরীর যেন বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না।

উত্তর দের বিশ্বরূপ, ভাল আর দেখাবে কি করে। ভাল থাকতে দিতে রাজী কি আর তোমরা?

বিশ্বরূপের কথার ইঙ্গিতে বন্ধুটি একটু অপ্রস্তুত হইয়া সামলাইয়া লয়!

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের অবস্থায় পড়লে আপনারাও ঠিক এই বিধানই দিতেন। আমরাও তখন রেহাই পেতাম না। আপনাদের হাতেও লাঠি গুলি সবই চলতো।

বিশ্বরূপ জবাব দেয়, গুলি চালান বা লাঠি চালান সেটাই বড় কথা নয়। সে কি আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছে, সেটাই বড় কথা

যুক্তির পিঠে যুক্তি, উদাহরণের পিঠে উদাহরণ। পদ্মা তন্ময় চিত্তে ভাবে, মানুষের মনের অন্তর্নিহিত কামনা—শান্তিপূর্ণ জীবনের ছবিগুলি কি স্বপ্ন হইয়াই থাকিবে চিরদিন?

চতুর্দিকে রব উঠিয়াছে—শৃঙ্খলা আর আইন; আইন আর শৃঙ্খলা। কিন্তু কিসের জন্য এ আইন! বাঁচিবার জন্যই ত। এ সুন্দর পৃথিবীতে, সুন্দর ভাবে বাঁচিবার জন্যই ত মানুষের প্রথম আইনের সৃষ্টি।

অরুণাভ বাহির হইবার জন্য জামা গায়ে দেয়।

পরী ছুটিয়া গিয়া সার্টটা ধরে শক্ত করিয়া—বাবা তুমি যাবে না। আমার কাছে থাকবে। করুণ মিনতি কণ্ঠস্বরে।

শিশু কণ্ঠের এ মিনতি সমস্ত মনটাকে নাড়া দিয়া যায়।

এ পিছুটানকে ছিঁড়িয়াই একদিন চলিয়া যাইতে হইবে তাহাকে। সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

বিশ্বরূপ আবার শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। রাত-ভরিয়া মৃত্যুর সহিত যেন সংগ্রাম করিতেছে বিশ্বরূপ। পদ্মা প্রাণ ঢালিয়া সেবা করে। তাহার ঐকান্তিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠে রোগাক্রান্ত বিশ্বরূপের

চোখে। নারীহৃদয়মথিত আন্তরিকতায় আরও একটি নারী-হৃদয়কে কাছে আনিয়া দেয়, সে বিপাশা।

বিপাশা ও পদ্মা। জীবনের সন্নিকটে তুইটি নারীমনের পরিচয় পাইয়াছে সে। তুইজনেই একটা উপায়হীন প্রশ্নজালেই শুধু ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাকে। এ জটিল সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল জীবনে।

নিঝুম হইয়া বালিশে কাৎ হইয়া বসিয়া আছে বিশ্বরূপ—প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতেছে সে রোগযন্ত্রণাকে নিজের ভিতর গুটাইয়া লইতে। চোখ মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় নীল হইয়া আসে। তবু বাহিরে এতটুকু অস্থিরতা নাই।

অরুণাভ গিয়াছে ডাক্তার ডাকিতে। বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকায় পদ্মা। সময় যেন আর নড়িতে চায় না। প্রতীক্ষায় অস্থির পদ্মা বার বার ঘর বাহির করে। একটা সামুদ্রিক হাওয়া ঘূর্ণিপাক খাইয়া চলিয়া যায় ঘরের ভিতর দিয়া। বিশ্বরূপ পাশ ফিরিয়া বসে বালিশে হেলান দিয়া। পদ্মা তাকায়—করুণ ব্যাকুল দৃষ্টি।

—কিছু চাই, বিশ্বদা?

ডাঃ সেন ইনজেক্শন দিয়া অরুণাভকে ডাকিয়া বলে, ক্রাইসিস কেটে গেলেও, খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। এখনও ভয়ের কারণ আছে।

বিশ্বরূপ একবারের জন্য চোখ মেলিয়া তাকায়। বিপাশার সঙ্গে চোখে চোখ মেলে। শুভদৃষ্টির মতোই স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি শান্ত সুন্দর! বিপাশার তপস্যাক্লিষ্ট মুখখানা যেন প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া অনুচ্চস্বরে বলে—প্রস্তুত হও বিপাশা।

বিপাশা নিঃশব্দে একবার হাতখানা রাখে রোগীর শীর্ণ তপ্ত ললাটে। কিন্তু কথা বলিতে পারে না। এক সর্বগ্রাসী কান্না যেন তাহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

ডাক্তারের গাড়িতে চলিয়া যায় বিপাশা। তুয়ার পর্যন্ত নামিয়া আসে অরুণাভ। বিপাশা অরুণাভের হাতটা শক্ত করিয়া চাপিয়া

ধরে গাঢ় অন্ধকারের ঘোমটায় অব্যক্ত কি এক তুর্নিবার ব্যথাকে প্রিয়চক্ষুর আড়ালে রাখিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসে।

অরুণাভের ঘুমন্ত মুখখানায় কত চিন্তার ছায়া। মনে মনে সে ভাবে কত প্রেম, কত অনন্ত প্রেম এই পৃথিবীতে, তবু এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে সুখে বাস করিতে দিল না মানুষ, যাহারা আছে হাজতে, তাহাদের কথা ভাবে। না জানি আরও কত অত্যাচার অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের জন্য। ভিতর হইতে এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন হইয়া উঠে সমস্ত সত্বা—এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেষবিন্দু শক্তিকে কাজে লাগাইয়া সেও আমরণ অরুণাভের পাশে থাকিবে।

মনে মনে উচ্চারিত সেই প্রতিজ্ঞা যেন সারা ঘরখানায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে: ঘরের কোণায় প্রদীপের শিখাটি কাঁপিতেছে। দমকা হাওয়ায় নিবু নিবু হইয়াও নেবে না। আরও-উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে।

নিচে তুয়ারে আচমকা জোরে কড়ানাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায় সকলের। এক মুহূর্তে বুঝিয়া ফেলে অরুণাভ পুলিশ আসিয়াছে। তাহারই নাম ডাকিতেছে ঘন ঘন।

পলকের জন্য একটু চোখটা বুলাইয়া যায় সে ঘুমন্ত শিশুকন্যার দিকে, তারপর পদ্মার কাঁধে প্রগাঢ় অনুরোধের মৃতু নাড়া দিয়া বলে, চললাম।

নিমেষের ভিতর একটা সরু গলি দিয়া বাহির হইয়া যায় অরুণাভ। পদ্মার মৃতুস্পর্শে বিশ্বরূপের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বুকের ভিতরে ঝড় বহিতেছে পদ্মার। চোখে মুখে তাহারই চিহ্ন। পদ্মা অরুণাভের পলায়নের সংবাদ ইশারায় জানায়। বিশ্বরূপ আশ্বস্ত হইয়া তুয়ার খুলিতে বলে।

তুয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক মদের গন্ধ বাহির হইয়া আসে। উপরে উঠিয়া আসে পুলিশ সার্জেন্ট ও আই বি ইন্সপেকটার।